পাশাপাশি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য জগৎ • কলিকাতা

পরিবেশক :
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২।

প্রথম প্রকাশ—মহালয়া, ১৩৫৯
প্রকাশক—শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্য জগৎ
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬।
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬।
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
সাড়ে তিন টাকা।

১

লোকে বলে, রসকস নেই, ভোঁতা মানুষ।

বাড়ীর লোক আরও বাড়িয়ে বলে, দয়ামায়া নেই, [illegible] নিষ্ঠুর মানুষ।

কেনই বা বলবে না লোকে, ঘরের এবং বাইরের ?

বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে, স্বাস্থ্য ভাল, চেহারা ভাল, চাকরী করে ছাকা তিনশ' টাকা মোটা বেতনের। ঘরে ঘরে যখন বেকার, তখন তার এমন চাকরী! এরকম একটা চাকরী বাগিয়ে কত কিছু করার প্ল্যান আঁটে যোয়ান ছেলেরা, স্বপ্ন আর কল্পনা দিয়ে! চাকরী বাগিয়েও সে কিছুই চায় না। অথচ একটা অদ্ভুত নিরুত্তেজ যান্ত্রিক জীবন যাপন করে চলেছে। তার যেন কোন সখ নেই আবেগ নেই উত্তাপ নেই।

বৌ চায় না, নেশা করে না, সিনেমা ছাখে না, জুয়া খেলে না। মেয়েদের সাথে মেলামেশা, বন্ধুর সাথে মজার কথা রসের কথা কেচ্ছার কথা, কোন কিছুতে রুচি নেই। কাউকে স্নেহমায়া দেয়ও না, নিজের জন্য চায়ও না।

অথচ গোমড়া মুখেও দিন কাটায় না, ব্যথা বেদনা বিষণ্ণতার আমেজ মেলে না [illegible]র কাছে। তাহলেও অন্ততঃ অনুমান করা যেত সকলের অজ্ঞাতে হয়তো জীবনে [illegible]র কিছু একটা ঘটেছে, মনটা কোন কারণে বিগড়ে গেছে অথবা হয়তো [illegible]ঙ্গেই গেছে।

ওরকম মানুষ কি আর সংসারে নেই ?

জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গেছে, বিধিয়ে তেতো হয়ে গেছে কামনা বাসনা, গভীর তাশা নিয়ে জীবনের হৈহল্লোর এড়িয়ে হাঙ্গামা থেকে গা বাঁচিয়ে কোন রকমে

দিন গুজরান করা, দাঁড়িয়ে গেছে তার কাছে জীবনের মানে—এরকম বৈরাগ্যের একটা মানে বোঝা যায়।

এ মানুষটা একেবারেই ওরকম নয়।

বৈরাগ্যের ধার ধারে না।

সাধারণ ভাবে লোকের সঙ্গে মেলামেশা। হাসিগল্প বজায় আছে ঠিকই রোয়াকের বৈঠকে নগদ নগদ উত্তেজক সংবাদ ও সমস্যা নিয়ে গলাবাজির সময় হাজির থাকলে তার গলা না চড়লেও সে চুপ করে থাকে না।

রাত্রে দিব্যি ঘুমায়। পেট ভরে খায়। সংসারের খুঁটিনাটি সব বিষয়ে নজর রাখে।

কঠোর নিয়মে সংসার চালায়।

বাপ-মা ভাইবোনের সংসার।

নিয়মমত আপিস করে, সন্ধ্যার পর বাড়তি খেটে বাড়তি রোজগার করে, বই পড়ে, কাগজ পড়ে।

কিন্তু জীবনটা রসালো করার জন্য, জীবনের রং ও বৈচিত্র্য আনার জন্য কিছুই করে না।

নির্দোষ তাসপাশা খেলায় পর্যন্ত তার মন বসে না।

বিয়ের কথা বললে হেসে উড়িয়ে দেয়।

হাসে সত্যই কিন্তু এমন এক কঠোর দৃঢ়তার সঙ্গে কথাটা উড়িয়ে দেয় যে পীড়াপীড়ি করার সাহস হয় না বাড়ীর লোকের।

কল্পনা মুখ বাঁকিয়ে বলে, বিয়ে করবে কি! বৌ তো আর পুতুলটির মত উঠবে বসবে না, আমরা যেমন করি। বৌয়ের চেয়ে কর্তালি ভাল লাগে দাদার।

আল্পনা বলে, ভাল লাগে না ছাই! দাদার ভাল লাগালাগিই নেই। কর্তালি করতে হবে তাই কলের মত করে। দাদার বুকটা পাথর দিয়ে গড়া।

পিঠাপিঠি দুটি বোন। বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে দুজনেরি। আজকালকার বিয়ের বয়স। দাদার সম্পর্কে তাদের সমালোচনার মূল কথাটি সম্পর্কে সকলেই

একমত। সুনীল যে বিয়ে করে না তার অন্য কোন কারণ নেই, তার ধাতটাই একমাত্র কারণ।

মানুষটাই সে ওই রকম!

স্নেহমায়া প্রেমভালবাসা তিতো নয় তার কাছে, সে কোন স্বাদই পায় না ওসব ঘরোয়া হৃদয়গত ভাবের কারবারে, আদান প্রদান দেনা-পাওনায়। ঘরসংসারে তার বিতৃষ্ণা নেই, রোগশোক দুঃখযাতনা ভরা জীবনের উপর মনটাও তার বিষিয়ে যায়নি—তাহলে তো বৈরাগ্য আসত!

ওর হৃদয়টাই ভোঁতা, অনুভূতির বালাই নেই। অনুরাগের তাপেও গলে না, বিরাগের হিমেও জমে না।

সংসার চলে সুনীলের আয়ে।

ভূপেশ পেনসন পায় মোটে পঞ্চান্ন টাকা।

সংসারে তাই সুনীলের কথার ওপরে আর কথা নেই। কিন্তু সে হম্বিতম্বি করে না বা কড়া শাসনে সকলকে দাবিয়েও রাখে না। ভূপেশ বরং দিনে দশ বার রাগে আর চেঁচামেচি করে।

তবু সকলে নিষ্ঠুর ভাবে সুনীলকেই!

তার সংসার চালাবার হৃদয়-বর্জিত নীতিটার জন্য। এ নীতিতে প্রয়োজনের আপেক্ষিক ওজন ছাড়া কোন হিসাব নেই, কারো এতটুকু আলগা সখ বা আব্দার প্রশ্রয় পায় না।

প্রাণপণে লাগাম টেনে খরচ করার প্রয়োজনটা সবাই বোঝে বৈ কি। দুটি বোন একটি ভাই কলেজে, আর দুটি ভাই একটি বোন স্কুলে পড়ে—কঠোর হিসাব ছাড়া এত বড় সংসার কি এই আয়ে চলে? কিন্তু এ কেমন হিসাব সুনীলের! সব রকম বিলাসিতা নয় বাদ গেল, একদিন পরে এক বেলা এক টুকরো মাছ খাওয়া থেকে রোজের এক সের দুধ মেপে মেপে কে কতটুকু খাবে, আর কে এক ফোঁটাও খাবে না সে নিয়ম পর্য্যন্ত সব কিছু মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু সামান্য পয়সায় মেটানো

যায়, এমন দুটো-একটা তুচ্ছ সাধও কেন বাতিল হয়ে যাবে ? সুনীল কেন ভুলেও একদিন অল্প দামের একটি উপহার এনে কারো মুখে হাসি ফোটাবে না ? ছোট বোনটিকে দুটো পুতুল কিনে দিলেই কি অচল হয়ে যাবে সংসার ? ভূপেশ তো সামান্য হাত-খরচের টাকা থেকে মেয়েকে পুতুল কিনে না দিয়ে পারে না !

এবং তাতে সংসারের অনটন বেড়েও যায় না।

তবু হয়তো একটু কম হৃদয়হীন ভাবা যেত তাকে, বুড়ো মা-বাবা আর ভাই-বোনদের তুচ্ছতম সাধ-আহ্লাদও মেটাতে পারে না বলে একটু যদি ম্লান দেখাত তার মুখ, একটু যদি সে আপশোষ করত। সে যেন গ্রাহ্যও করে না !

বাধ্য হয়ে কঠোর হওয়ার জন্য এতটুকু মন খারাপ করার বালাই তার নেই !

কল্পনার একটি শাড়ী না হলেই নয়।

কলেজে পরে যাবার কাপড় নেই। ওবাড়ীর মায়ার পরনের শাড়ীখানা দেখে হঠাৎ কি অদম্য সাধই যে জাগল কল্পনার—যে, সেও ওই রকম শাড়ী পরবে।

না পেলে বুক ফেটে মরে যাবে।

ওখানার দাম ষোল টাকা। সুনীল তাকে তের টাকার একখানা কাপড় কিনে দেবে।

মা বলে, তিনটে টাকার মামলা তো, দে কিনে !

সুনীল মাথা নাড়ে।

এ মাথা নাড়ার মানে জানে কল্পনা। অনেক দিন পরে দাদার কাছে সে কেঁদে ফেলে বলে, তের টাকা ষোল টাকা এত তফাৎ তোমার কাছে ?

অনেক তফাৎ।

তবে আরও কম দামের কিনে দাও।

ঘরে পরবার হলে তাই দিতাম। কলেজ যাবি না এ কাপড় পরে ? এর চেয়ে কম দামের কাপড় পরিয়ে তোমায় কলেজে পাঠিয়ে লাভ নেই, অন্য মেয়েদের দিকে তাকাবে আর পড়াশুনা মাটি করবে।

তাই যদি বলো তবে আর তিনটে টাকা দিয়ে ওটা কিনে দাও—খুসী মনে ভাল করে পড়াশুনা করব।

না। তোমার এ দুর্বলতাকেও প্রশ্রয় দিতে পারব না।

আল্পনা বোনের পক্ষ নিয়ে বলে, কি বলছ তুমি? তের টাকারটা পরলে দুর্বলতা হবে না, ষোল টাকারটা পরলেই হবে?

সুনীল বলে, হবে না? তের টাকারটা কিনে দিচ্ছি বাধ্য হয়ে, কলেজে পড়াতে হলে না দিয়ে উপায় নেই। অন্য মেয়েরা ভাল শাড়ী পরে আসবে, সেজন্য ওকে দায়ী করা যাবে না। সস্তা শাড়ী পরে যাবার মত মনের জোর ওর নেই—কিন্তু সেটা দুর্বলতা নয়। তের টাকায় যেখানে চলে সেখানে সখের জন্য ষোল টাকা লাগানোটা দুর্বলতা।

বাবা তোমার কি হিসেব!

হিসেব করি বলেই কলেজে পড়তে পারছ। মিছে আব্দার করিস নে কল্পনা—ষোল টাকা কেন সাড়ে তের টাকা হলেও আমি ও কাপড়টা তোমায় কিনে দিতাম না।

কিন্তু এবার ছাড়ে না কল্পনা। সেও তো সুনীলেরই বোন। না খেয়ে শুয়ে থেকে ভূপেশের কাছে তিনটি টাকা আদায় করে সুনীলের কেনা কাপড় বদলে সাধের কাপড়টি কিনে আনে।

সুনীল রাগে না, কিছু বলে না। ফিরেও তাকায় না।

মা তবু মিনতি করে বলে, যেতে দে, কিছু বলিস না ওকে। ছেলেমানুষ তো!

সুনীল গম্ভীর হয়ে বলে, আমার কি বলার আছে? নিজে চেষ্টা করে টাকা যোগাড় করেছে, আমি তো বাড়তি টাকা দিইনি।

সামান্য ব্যাপারে বাপের উপরেও চটতে নেই কিন্তু।

চটব কেন? মেয়েকে তিনটে টাকা দেবার স্বাধীনতা বাবার নেই?

কল্পনা কান পেতে শোনে।

সখের শাড়ীটা বাগানোর আনন্দ যেন বড় তাড়াতাড়ি উপে যাচ্ছিল। উদাসীন

নির্ব্বিকার হয়ে না থেকে একটু যদি রাগ করত দাদা, একটু যদি দেখাত যে ছোট বোন কথা না শোনায় তার মনে আঘাত লেগেছে।

শাড়ীটা কিনে অপরাধ করেছে এই অনুভূতিটাই জোরালো হচ্ছিল কল্পনার।

মা আর দাদার আলাপ শুনে তখনও যেটুকু আনন্দ অবশিষ্ট ছিল তাও উপে যায় কল্পনার।

সুনীল আপিস থেকে ফিরলে ম্লান মুখে কাছে গিয়ে বলে, দাদা, রাগ কোরো না, এবারের মত মাপ কর।

সুনীল বলে, রাগ করব কেন? নিজের চেষ্টায় নিজের সাধ মিটিয়েছিস, আমার রাগ করার কি আছে? আমাকে জ্বালাতন করলে রাগ করতাম।

কল্পনা তার মুখের দিকে চেয়ে ভাবে, দাদার বুকটা কি পাথর দিয়ে গড়া?

সন্ধ্যার পর মায়াদের বাড়ীর স্কুলে সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং শেখাতে গেলে মায়া বলে, কল্পনার কাছে শাড়ীর বাপার শুনলাম। সত্যি, কি করে পারেন আপনি?

না পেরে উপায় নেই তাই পারি।

মায়া একটু সংশয়ভরে তাকায়। বলে, তিনটে টাকায় কি আসত-যেত? আপনি নাকি খুকুকে পুতুল পর্য্যন্ত কিনে দেন না! ছোট্ট বোনটিকে পুতুল দিলে ফতুর হবেন?

মায়া কখনো এ ভাবে তার সঙ্গে কথা বলে না, তার কাজের মানে বোঝার চেষ্টা করার বদলে এ যেন একেবারে সমালোচনা করে বসা!

সুনীল তাই একটু আশ্চর্য্য হয়ে যায়। মায়া সাধারণতঃ মোটামুটি বুঝতে পারে তার কাজের মানে।

সুনীল বলে, অনেক দিন ধরে কল্পনা অনেক রকম আব্দার করেছিল। চাকরী পাওয়ার গোড়ার দিকে প্রত্যেক দিন অন্ততঃ দশটা আব্দার করত। আজকাল আর বড় একটা কেউ চায় না আমার কাছে। খুকুকে পুতুল দিলে কি হত জানেন? কল্পনাকে তের'র বদলে ষোল টাকার কাপড় দিলে? আবার সবাই

এটা দাও ওটা দাও সুরু করে দিত। একটা মেটালে দশটা মেটাতে পারব না, সে আশা জাগিয়ে লাভ কি।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু পারেন কি করে তাই ভাবি!

আপনি পারছেন কি করে? আপনার মা তো আজও কাঁদাকাটা করেন!

এটা অন্য জিনিষ। বিয়ে করব না নিয়ে একটা বড় লড়াই হয়ে গেছে, মা-বাবা মেনে নিয়েছে, চুকে গেছে। মা মঝে মঝে একটু সখের কান্না কাঁদে। কিন্তু এসব টুকিটাকি ব্যাপারে শক্ত থাকা—আচ্ছা, আদুরে বোনটি পুতুল চাইলে না দিয়ে আপনার কষ্ট হয় না?

সুনীল ধীরভাবে বলে, কি জানি, টের পাই না। বোনটি সবার আদুরে কিন্তু আমার আদুরে নয় বলে বোধ হয়। আদর করতে ইচ্ছা হয় না।

মায়া চেয়ে থাকে।

সুনীল একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে, কি ভাবছেন? আমি কি ভীষণ মানুষ?

মায়া সায় দিয়ে বলে, সত্যি তাই ভাবছি। আপনি সত্যি ভীষণ মানুষ, না আপনার মনের জোরটা ভীষণ?

মনের জোরে নিজেকে কন্ট্রোল করতে হয় না। বাড়ীর লোকের ন্যাকামি ভাল লাগে না, করব কি!

তবে ওদের জন্য এত খাটছেন কেন? সারাদিন আপিস করে ফের এখানে খাটতে আসেন, সে তো ওদেরি জন্য?

সুনীল একটু হাসে।

একথা আমিও ভেবেছি। নিজেই জানি না আপনাকে কি জবাব দেব বলুন? তবে আমার মনে হয়, একটা কিছু তো করতে হবে মানুষকে, তাই ওদের জন্য খাটছি। আপনি যেমন বিয়ে না করে পাঁচটা কাজ নিয়ে আছেন।

মায়া বলে, ঠিক হল না। আমি স্বাধীন জীবন ভালবাসি তাই বিয়ে করতে চাই না—এটা আমার নিজের রুচি, নিজের সুখ শান্তির হিসাব। আপনার সব হিসাব তো শুধু বাড়ীর লোকের সুখের জন্য!

সুনীল বলে, তাহলে আপনি যেমন স্বাধীন জীবন ভালবাসেন, আমিও তেমনি বাড়ীতে কর্তালি করতে ভালবাসি। ওরাও তাই বলে। বৌ কর্তালি মানবে না বলেই নাকি আমি বিয়ে করি না।

তারা দুজনেই ভাবে, সত্যই কি তাই? না আর কোন মানে আছে তাদের এরকম জীবন যাপনের?

•

মায়া ভাবে, বিয়ের নামে না হয় তার বিতৃষ্ণা কিন্তু এমন একটা পুরুষ কি জগতে নেই যার জন্য প্রাণটা তার একটু উতলা হয়? চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হল, আজও হৃদয়টা যেন ঠাণ্ডা বরফ হয়ে আছে! অন্য দিকে না হোক, বাড়ীর মানুষ বাইরের মানুষের হাসি কান্নায় তার হাসি পাক কান্না আসুক, শাড়ী পড়তে সিনেমা দেখতে বেড়াতে ভালবাসুক, আরামবিলাস পছন্দ করুক—ওই দিক দিয়ে তার হৃদয়টাও কি সুনীলের মত ভোঁতা।

সুনীলের সঙ্গেই তো কতকালের পরিচয়, সকলের চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা। এমন সহজভাবে প্রাণ খুলে কথা তো আর কারো সঙ্গে বলতে পারে না। অথচ এই সুনীলকে পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বেশী আর কিছু ভাববার চেষ্টা করলে মোটেই জমে না ভাবনাটা, একটু রোমাঞ্চও হয় না!

একটা আতঙ্ক বোধ করে মায়া। একটা দুর্ব্বোধ্য কষ্ট অনুভব করে।

সুনীল নিজের ঘরে বসে ভাবে। রাত্রের খাওয়া শেষ হয়নি, সংসারের কলরব কানে ভেসে আসে। সত্যি, এটা কার সংসার? কেন সে এই সংসার নিয়ে মেতে আছে, আয় বাড়াবার জন্য সকালে আরেকটা টুইসনি খুঁজছে?

অথচ ভালবাসা তো টের পায় না বাড়ীর মানুষগুলির জন্য। সে কি সত্যই সৃষ্টিছাড়া মানুষ, রক্তমাংসের তৈরী নিছক একটা যন্ত্র?

এমনি একটা বাঁকা যন্ত্র যে তার দেহটার নিয়মমত শুধু ভাতের খিদে পায় অন্য কোন খিদে পায় না?

একমাত্র মায়া ছাড়া কোন মেয়ের সঙ্গে মিলতে মিশতে পর্য্যন্ত ভাল লাগে

না। কল্পনা আল্পনার বন্ধুরা আসে, চেনা পরিবারের মেয়েরা আসে, কেউ কেউ ভাব করার চেষ্টাও করে তার সঙ্গে। ভাব কিন্তু হয়না কারও সঙ্গেই বিবাহিতা বয়স্কা মেয়েদের সঙ্গ তবু দুদণ্ড সহ্য হয়, কমবয়সী মেয়েদের সম্পর্কে কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা বোধ করে।

মায়ার সঙ্গে পর্য্যন্ত তার শুষ্ক নিরস বন্ধুত্বের সম্পর্ক—বোধ হয় ওই জন্যই সম্পর্ক। মায়ার মেয়েলি ভাব এত কম না হলে, ন্যাকামি আর আবেগ রহিত না হলে, মেলামেশায় ভাবুলতা আমদানি করতে চাইলে, ওকেও হয়তো সে সইতে পারত না!

এ কি বিকার? কোন মানসিক রোগ?

প্রশ্ন জাগে।

মায়ার মত অজানা আতঙ্ক কিন্তু বোধ করে না সুনীল।

দরজায় দাঁড়িয়ে রেবা বলে, আসব?

পাড়ায় মাস তিনেক হয় বসাকদের বাড়ীর একতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছে সুধীরবাবু, রেবা তার মেয়ে। তিন মাসেই কল্পনাদের সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে ফেলেছে, সুনীলের সঙ্গেও ভাব করার তার প্রবল ইচ্ছা। অন্য সকলের চেয়ে এ বিষয়ে তার অনেক বেশী অধ্যবসায় দেখা যায়। সুনীল আমল না দিলেও সে দমতে রাজী নয়।

সে যেন গায়েই মাখে না সুনীলের অবহেলা।

বোধ হয় খেলা করছে তাকে নিয়ে। ইয়ার্কি জুড়েছে! কতবার তাকে যেতে বলেছে তাদের বাড়ী, সুধীর চার-পাঁচ বার যেচে এসে তার সঙ্গে আলাপ করে গেছে, সে একবারও যায়নি।

তবু রাত ন'টার সময় আবার একলা এসে ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে রেবা হাসিমুখে বলছে, আসব?

দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে সুনীল গম্ভীর মুখে বলে, কি খবর?

রেবা তার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে সানন্দে বলে, ভারি আনন্দের খবর। বাবাকে রাজী করিয়েছি। কাল টাইপরাইটিং শিখতে আপনার স্কুলে ভর্তি হয়ে যাব।

সুনীল উদাস ভাবে বলে, বেশ তো!

গলা চড়িয়ে বলে, কল্পনা, আমি এখন খাব, যায়গা কর।

রেবার সুন্দর চোখ দুটি প্রথমে রাগে ঝলসে উঠে পরক্ষণে আবার সজল হয়ে আসে।

আজ সত্যি অপমান হলাম। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো? ঠিক যেন শত্রু এসেছি এ রকম করেন কেন আমার সঙ্গে? আমি তো কিছুই করিনি আপনার?

কি জানেন—

কিন্তু কে তখন তার কথা শোনে। রেবা উঠে দাঁড়িয়েছে, জল শুকিয়ে আবার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে তার চোখে।

তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে সে বলে, কতবার বলেছি, আপনি আমার দাদার মত, আমায় আপনি বলবেন না। তুমি আর মুখে এল না আপনার! বেশ তো, সেটা বুঝলাম। আপনি ঘনিষ্ঠ হতে চান না, আমায় পছন্দ করেন না। সেটা একশো বার হতে পারে। কিন্তু কি অপরাধটা আমি করেছি যে সাধারণ ভদ্রতাটুকুও বজায় রাখতে পারেন না? ভদ্রলোকে তাই করে থাকে। যাকে ভাল লাগে না তার সঙ্গে ওই ভদ্রতার সম্পর্কটুকুই বজায় রাখা হয়।

কল্পনা এসে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু তার সঙ্গে রেবা কথা বলে না। চলে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে রেবা আরেকটু ঝাল ঝেড়ে যায়। বলে, আগেও এরকম অভদ্রতা করেছেন, আমি গায়ে মাখিনি। ভেবেছি, অন্য কারণ আছে, আপনার হয়তো মন খারাপ, বিনা কারণে কেউ এরকম অসভ্যতা করে! আপনি কি পাগল?

মা জিজ্ঞাসা করে, রেবা অত চটল কেন রে?

সুনীল বলে, খালি ঘরে বসতে বলিনি, তাই অপমান হয়েছে। মেয়েটার কি বুদ্ধি! এত রাতে ফাঁকা ঘরে গল্প করতে গিয়েছে।

মা বলে, তাতে কি হয়েছে? সন্ধ্যে রাত, আশপাশে আমরা এতগুলি লোক রয়েছি, দুদণ্ড কথা বলতে গেলে কি হয়? ও সে রকম মেয়ে নয়, ওটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। ভদ্রলোকের মেয়ে কথা কইতে ঘরে গেছে বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিলি!

মার ভৎর্সনাতেও বড় ঝাঁঝ ফোটে আজ!

অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেদিন ঘুম আসে না। মেয়েদের সম্পর্কে সত্যিই কি তার বিকারের আতঙ্ক আছে? এই দুর্বোধ্য আতঙ্কের চাপটা বেড়ে গিয়ে তাকে সাধারণ ভদ্রতা পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দেয়?

কোন সঙ্গত যুক্তি সত্যিই খাড়া করা যায় না রেবাকে অপমান করার স্বপক্ষে। স্বেচ্ছায় বিচার-বিবেচনা করে যদি সে এটা করত, নারীকে নরকের দ্বার ভেবে করত, তাহলেও একটা মানে থাকত তার কাজের। এমন কিছু রেবা সত্যিই করেনি যাতে তার রাগ বা বিতৃষ্ণা জাগা উচিত ছিল। তার গায়ে ঢলেও পড়েনি, তার সঙ্গে ছ্যাবলামিও জুড়ে দেয়নি। আর পাঁচজনের সঙ্গে যে ভাবে মেলামেশা করে, তার সেকেলে মা পর্য্যন্ত আজকাল যে রকম মেলামেশায় কোন দোষ খুঁজে পান না, তার সঙ্গেও সেই ভাবেই মিলতে মিশতে চেয়েছে রেবা, ভদ্রভাবে স্বাভাবিক ভাবে।

এতই খারাপ লাগল সেটা তার যে ওকে অভদ্রের মত, অসভ্যের মত অপমান না করে পারল না? এ তো তারই অসংযম!

পাগল না হোক, সে নিশ্চয় ভয়ানক ভাবে বিকারগ্রস্ত। সে নিশ্চয় কঠিন মানসিক রোগে ভুগছে।

জীবন সম্পর্কে তার সব ধারণা ভুল। হিসাবনিকাশ ভুল। লোকে ঠিক কথাই বলে, সকলের হৃদয় আছে, শুধু তার হৃদয় নেই, সে অস্বাভাবিক।

অত্যন্ত ভীরু ক্ষীণ একটা আওয়াজ যেন কানে আসে। প্রথমটা ধরতেই

পারে না সুনীল। তারপর সচেতন হয়ে টের পায় খোলা জানালায় বাইরে দাঁড়িয়ে কল্পনা মৃদুস্বরে ডাকছে, দাদা!

সুনীল দরজা খোলে। বলে, কি হল?

কল্পনা বলে, কেন মিছে ভাবছ? অপমান করেছ বেশ করেছ। তুমি তো ডেকে আনোনি, ও যেচে-যেচে আসে কেন তোমার কাছে?

তার ইচ্ছা অগ্রাহ্য করে কেঁদে-কেটে ভূপেশের কাছে বাড়তি টাকা নিয়ে কল্পনা নিজের পছন্দসই কাপড়খানা কিনেছিল। রোজ যে দাদা রাত দশটা না বাজতে আলো নিবিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, সেই দাদা আজ আলো নিবিয়ে শুতে পারছে না দেখে সেই কল্পনাই মরিয়া হয়ে উঠে এসেছে দাদাকে একটু স্নেহ জানাতে। হয়তো বা স্নেহ জানিয়ে ঘুম পাড়াবার আশা নিয়েও!

সুনীল তাকে স্নেহ জানাবার সুযোগ দেয় না, সে জানিয়ে দেয় তার অনিদ্রার কারণ রেবা সংক্রান্ত ঘটনা নয়, সংসারের চিন্তা।

—আমি খরচের হিসেব করছিলাম। খরচ বেড়ে যাচ্ছে। সামনের অঘ্রাণে তোর যে বিয়ে দেব, টাকার ব্যবস্থা কি হবে?

কল্পনা স্তব্ধ হয়ে থাকে। মুখ কালো করে থাকে।

—খরচ তোরা কমাতে দিবি না। আর বোধ হয় কমানোও যায় না খরচ। তাহলে অন্যভাবে বস্তিতে গিয়ে বাঁচার ব্যবস্থা করতে হয়। তার চেয়ে আমি ভাবছি কাল থেকে সকালে একটা টিউসনি করব। দুটো অফার পেয়েছি, কোনটা নেব ভাবছিলাম।

কল্পনার মুখ একটু হাঁ হয়ে গেছে দেখা যায়।

সুনীল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, আমার শরীরটা খারাপ হয়েছে নাকি রে? ঠিক মত খাচ্ছি তো?

কল্পনা হঠাৎ যেন তার কথার জবাবেই কেঁদে ফেলে। কিন্তু এ তো তারও জানা কথাই যে সুনীলের কাছে এসব কান্নার মানে আছে, কিন্তু বিশেষ কোন দাম নেই।

তাই প্রাণপণে কান্না চেপে, দু-একবার গলা ঝেড়ে সে স্পষ্ট ভাষায় বলে, দাদা, কাল থেকে তুমি যদি আমায় জুতো মারো লাথি মারো, আমি জানব আমার কোন রোগ সারাতে জুতো মেরেছ লাথি মেরেছ। তুমি আমার ভার বইছ, আমি তোমার ঘাড়ে চেপে রয়েছি, এটুকুও খেয়াল হয়নি এ্যাদ্দিন !

কল্পনা চলে গেলে রেবার চিন্তাকে সে আর প্রশ্রয় দেয় না।

ক'দিন আগে আপিসের চেনা লোকের কাছ থেকে যৌন বিষয়ে সাধারণের জন্য লেখা একখানা বই এনেছিল—বড় একজন বৈজ্ঞানিকের লেখা বই। ক'দিন পড়বার সময় হয়নি। বিজ্ঞানের কথা, পড়তে ভালই লাগে। অনেক অজানা কথা, আশ্চর্য্য অদ্ভুত কথা জানতে পারে, কিন্তু তার নিজের সমস্যার কোন হদিস পায় না।

তবে পড়তে পড়তে এক সময় ঘুম এসে যায়।

সকালে সুনীল টিউসনির সন্ধানে যায়।

দু'যাগায় যাবে। প্রথম বাড়ীটি বেশী দূরে নয়, মিনিট পাঁচেকের পথ। চেনা লোকের মুখে জেনেছিল ওদের মাষ্টার চাই। দ্বিতীয় বাড়ীটি কিছু দূরে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত ঝেড়েছিল।

তারা দেখা করতে লিখেছে।

উচ্চ না হলেও যাদব পদস্থ চাকুরে। পরিচয় না থাকলেও পথে বাজারে বাসে অনেক বার দেখা হয়েছে, মুখ-চেনা দুজনেরি।

সুনীল বলে, বিপিনবাবুর কাছে শুনছিলাম আপনাদের একজন মাষ্টার দরকার।

প্রৌঢ় যাদব অমায়িকভাবে বলে, হ্যাঁ, বিপিনবাবু তোমার কথা বলেছেন। এসো বোস। উমা, এক কাপ চা এনো তো।

—আমি চা খাই না।

বার-তের বছরের একটি ছেলে পড়ছিল, পড়ার টেবিলের অন্য পাশে বসেছিল

রেবার বয়সী উমা। রেবার চেয়েও সুশ্রী আর একটু ঢ্যাঙা। সুনীলের সঙ্গে চমৎকার মানায়!

উমা খুসী হয়ে বলে, চা খান না তো? বেশ করেন। দেখলে তো বাবা, ওঁর কাছে শেখো, ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খাওয়া কমাও, পেট ভাল থাকবে।

যাদব হাসে।—বেশ তো, শেখা যাবে। এখন কাজের কথা বলি। আমার মেয়েই ওকে অ্যাদ্দিন পড়াচ্ছিল, নিজে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়েছে। এখন আর পেরে উঠছে না, তাই একজন লোক রাখব। এই বাজারে আরেকটা খরচ বাড়ল—কি আর করা যায়! সকালে এক ঘণ্টা পড়াবে, আমি—সুনীলের মুখের দিকে চেয়ে খানিক ইতস্ততঃ করে হঠাৎ যেন মরিয়া হয়েই বলে ফেলে,—আমি ত্রিশ টাকাই দেব।

উমা সাগ্রহে বলে, কাল-পরশুই আরম্ভ করুন। বেচারার বড় অসুবিধা হচ্ছে।

দ্বিতীয়টি বাগানওলা বাড়ী। দেখেই বোঝা যায় মালিক পয়সাওলা লোক। গেটে দারোয়ান ছিল, খবর পাঠিয়ে হুকুম আনিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়।

মোটা-সোটা ফর্সা সুন্দরী এবং সুসজ্জিতা একটি মেয়ে বলে, বসুন। এত সকালেই আপনারা আসতে আরম্ভ করলেন!

আপিস যেতে হবে।

সুনীলের নাম শুনে এক বাণ্ডিল দরখাস্ত থেকে তারটি বেছে নিয়ে সে বলে, আমিই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, আমার নাম নন্দা দেবী। এই যে আপনি লিখেছেন, আপনি আনম্যারেড কিন্তু বড় একটা ফ্যামিলি চালান, এটা আরেকটু খুলে বলুন তো?

সব শুনে নন্দা বলে, এক ঘণ্টা পড়াবেন, আমরা পঁচিশ টাকা দেব। এক কাপ চা আর বিস্কুট বা টোষ্ট—

আমি চা খাই না।

নন্দা আশ্চর্য্য হয়ে বলে, সে কি? সবাই চা খায়, আপনি খান না কি রকম?

এক কাপ দুধ পাই না, চা খাব কেন? একটু দুধ যে পায় না তার চা খাওয়া উচিত নয়। বড় খারাপ নেশা দাঁড়ায়। ভাতের খিদে চা খেয়ে মেটানো যায়, তাই না এত আদর।

নন্দা একটু ভেবে প্রশ্ন করে, আপনি কি তাহলে আসবেন কাল থেকে?

অর্থাৎ তাকে পছন্দ হয়েছে। স্থনীলকে একটু ভাবতে হয়।

যাদবের বাড়ী কাছে, বেতন পাঁচ টাকা বেশী। এখানে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হবে, নয় বাসের পয়সা যাবে। তবু ভেতর থেকে জোরালো তাগিদ আসে, এই কাজটাই ভাল, এটা নিয়ে নাও!

স্থনীল বলে, তাই আসব। মাইনেটা ত্রিশ করতে পারেন না?

এখন পারছি না। পড়ান, পরে বিবেচনা করব।

স্থনীল ভাবে, পরে মানে তো আট-ন' মাস পরে তার ছাত্র পরীক্ষায় কেমন ফল করে তাই দেখে!

স্থনীল জিজ্ঞাসা করে, বিজ্ঞাপনে ছিল ম্যাট্রিক ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ইংরেজী পড়াতে হবে, ছেলেটি অ্যাকচুয়েলি কোন ক্লাশে পড়ে?

ছেলে নয়, মেয়ে। স্কুলে পড়ে না।

তা হলে ছাত্রীটিকে একটু দেখতে হবে। আপনাকে খোলাখুলি বলি, পড়ানোর খাটুনি অনেকটা ছাত্রছাত্রীর উপর নির্ভর করে। একজনকে সহজে পড়ানো যায়, আরেকজনের পিছনে গাধার মত খাটতে হয়। সেটা না জেনে পঁচিশ টাকায়—কথাটা বুঝেছেন আমার?

বুঝেছি বৈকি। ছাত্রী আপনার সামনেই বসে আছে।

স্থনীল কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হয় না দেখেই যেন নন্দা একটু আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

স্থনীল বলে, আপনি পড়বেন? প্রাইভেট পরীক্ষা কোন বছর দিতে চান?

নন্দা বলে, পরীক্ষা আমি দিতে চাই না—আমি শুধু ইংরাজী শিখতে চাই। আপনাকে খুলেই বলি, আমার বাবার একটি ইংরাজী কাগজ আছে—দি পিপলস্ ভয়েস।

স্থনীল বলে, আপনি শচীনবাবুর মেয়ে ?

বাবাকে আপনি চেনেন ?

চিনি না, নাম শুনেছি।

নন্দা বলে, আমি ক্লাস টেন পর্য্যন্ত পড়েছিলাম, তারপর নানা কারণে পড়া বন্ধ হয়ে যায়। আমি এখন ভাল করে ইংরাজী শিখে আমাদের কাগজে নিজে কাজ করতে চাই। আমি নিজে প্রাণপণে খাটব, আপনি আমাকে যত তাড়াতাড়ি পারেন এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

নন্দা একটু থেমে বলে, আমি যেমন এগিয়ে যাব আপনার মাইনেও তেমনি বেড়ে যাবে। পঁচিশ টাকায় অবশ্য আমি বি-এ ষ্ট্যাণ্ডার্ডের বই পড়াতে বলব না।

স্থনীল খানিক চুপ করে থেকে বলে, পড়াতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে রাখা উচিত। শুধু ইংরেজী সাহিত্য শিখলে ভাল শেখা হবে না।

কেন ?

কারণটা হল এই যে প্রত্যেক ভাষায শব্দ পদ এসবের নিহিত মানে থাকে, বিশেষ প্রয়োগ থাকে, শুধু ইংরেজী গ্রামার আর সাহিত্য পড়ে আপনি সেগুলি ধরতে পারবেন না। কলেজে ইংরাজীতে আরও কয়েকটা বিষয়ে পড়ানো হয় বলে এদিক দিয়ে অনেক সাহায্য হয়। এখনো সাধারণ বি-এ পাশ ছেলে যতটা ইংরাজী জানছে, অন্য সাবজেক্টগুলি বাংলায় শেখানো স্থরু হলে সেটুকুও জানবে না। কোন ভাষা ভাল করে শিখতে হলে শুধু সাহিত্য পড়াই যথেষ্ট নয়। ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন বিজ্ঞান এসব বইও পড়তে হয়।

বেশ বোঝা যায় তার কথা শুনে দমে যাবার বদলে নন্দা খুসীই হয়েছে। কারণটা স্থনীল সহজেই অনুমান করতে পারে। বিদেশী ভাষা শেখার কাজটা সে খুব কঠিন প্রতিপন্ন করে দিয়েছে বটে কিন্তু নন্দা বুঝতে পেরেছে যে, সে গৃহশিক্ষকটি পেয়েছে ভালই। লোকটা বোঝে শোনে, এবং শেখাবার কাজে ফাঁকি দেবে না।

নন্দা বলে, যেসব বই পড়া দরকার আমিও তা পড়ব। এক বিষয়ে আপনাকে নিশ্চিন্ত করছি—ইচ্ছা করলে আমি দিনরাত পড়াশোনা নিয়েই থাকতে পারব। আমার অন্য কোন দায়িত্ব বা বিশেষ কাজ নেই। স্কুলে কলেজে পড়তে চাই না এইজন্য যে বড় বেশী সময় লেগে যাবে। বি-এ পাশ করতেই পাঁচ বছর! আমি দু'বছরে সব শিখে ফেলতে চাই।

সুনীল হাসি মুখে বলে, সব?

নন্দাও হাসে, সব মানে কাগজে কাজ করার জন্য যতটা শেখা দরকার। পারব না?

কেন পারবেন না? তার আগেও কিছু কিছু সহজ কাজ আরম্ভ করে দিয়ে শিখে যাবেন। শেখার তো শেষ নেই।

নন্দা আচমকা একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বসে, আচ্ছা আপনি বিশেষভাবে ইংরেজীর দিকে ঝুঁকলেন কেন? আপনি অবশ্য যে ইয়ারে পাশ করেছেন দেশটা তখনও স্বাধীন হয় নি, তবু—

সুনীল বলে, দেশটা এখনও সত্যি স্বাধীন হয় নি। আমি বিশেষভাবে বিদেশী সাহিত্য পড়বার জন্য ইংরেজী নিয়েছিলাম।

চাকরী করে টুইসানি করে পড়ার সময় পান?

বেশী সময় আর কোথায় পাই?

সুনীল বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ালে নন্দা আবার জিজ্ঞাসা করে, কাল থেকে আসছেন তো?

আসব।

কিন্তু কেন?

কেন যাদবের বদলে নন্দাদের বাড়ীর কম মাইনের বেশী অসুবিধার কাজটা নেওয়া?

নিজেকে এই প্রশ্ন করে সুনীল। প্রশ্ন করতেই হবে, সোজা বাস্তব একটা হিসাব নাকচ করে দিলে তার মানে খুঁজতেই হবে।

মায়াও প্রশ্ন করে, কেন? ওরা বড়লোক, হয়তো কোন সুবিধা করে দেবে, এই প্রত্যাশা করছেন?

সুনীল বলে, বড়লোক বলেই প্রত্যাশা কম করছি। কৃপণ মেয়ের বাবাকে চোখেও দেখলাম না, মেয়েই সব। হিসেবী পাকা মেয়ে।

মায়া একটু হাসে।—মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে বলে?

সুনীলও হাসে।—ওরে বাবা! ওই মেয়ে আমায় পাত্তা দেবে? আপিসের বড়বাবুর মত পঁচিশ টাকার মেহনৎ আদায় করে ছাড়বে।

মায়া খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে।

তাহলে ওই জন্যই এ কাজটা নিয়েছেন। ওদিক দিয়ে কোন ভয় নেই, আপনাকে পাত্তাও দেবে না!

সুনীল নির্বাক্ হয়ে চেয়ে থাকে।

মায়া আবার বলে, যাদববাবুর মেয়ের বেলা ভয় আছে, তার ওপর আবার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে, বয়সে চেহারায় আপনার সঙ্গে খাসা মানায়!

সুনীল নির্বোধের মত চেয়েই থাকে।

মায়া হাসে না। তাকেও খুব বিচলিত মনে হয়। মৃদুস্বরে সে যেন নিজের মনেই বলে, এবার বুঝেছি আপনার ব্যাপারটা। আপনার হল ফাঁদের ভয়, আপনি ফাঁদ এড়িয়ে চলেন।

সুনীল এবার বলে, কিন্তু কেন? এটা কি রোগ না বিকার?

মায়া বলে, রোগবিকার কেন হবে? আপনার ধাতটাই এরকম।

তখনকার মত মায়ার কথাটা খুব মনে লাগে। তার ধাতটাই এ রকম, সে অস্বাভাবিক নয়, বিকারগ্রস্ত নয়।

কিন্তু জিজ্ঞাসার জের কি এত সহজে মেটে এ জগতে! ধীরে ধীরে আবার প্রশ্ন জাগে। কেন তার ধাত এ রকম কেন?

ছেলে খোঁজা হচ্ছিল কল্পনার জন্য, লাগসই ছেলে জুটে গেলে তাকে সুনীল পার করে দেবে।

ভূপেশ বলে, টাকা?

যোগাড় করব।

যোগাড় মানে ধার?

টাকার ভরসা দিয়েছে মায়া। বলেছে, আমার বিয়ের জন্য জমা ছিল। আপনার বোনের বিয়েতেই লাগুক। ব্যাঙ্কে পড়ে থাকাও যা, আপনার কাছে থাকাও তাই। আপনি ব্যাঙ্কের রেটেই সুদ দেবেন।

একটি বয়স্কা বোন বিদায় হবে, কলেজগামিনী বোন, কিন্তু ঘাড়ের বোঝা হাল্কা হবে না সুনীলের। শুধু আশা এই যে পরে একদিন বোঝা হাল্কা হবে, ধারটা যেদিন শোধ হয়ে যাবে। যতদূর সম্ভব চুলচেরা হিসেব কষে সুনীল বার করে কল্পনার জন্য সব মিলিয়ে মাসে কত খরচ হয় এবং সেই পরিমাণ টাকা ঋণ শোধের জন্য কেটে নিলে কি দাঁড়ায়। যেমন চলছিল, তেমনি কি চলবে সংসার?

মায়া হিসাব শুনে বলে, এত ব্যস্ত কেন? আরও কম করে দিলেও চলবে। আমার তো তাগিদ নেই।

সুনীল বলে, না, ঢিলে দিয়ে লাভ নেই। বোন যেটুকু রেহাই দেবে অন্যেরা শুষে নেবে। তার চেয়ে ধার শোধ হোক। এতেও কম দিন লাগবে না।

কল্পনা খুসী না অখুসী বোঝা যায় না। মুখ দেখলে মনে হয় সে মস্ত ধাঁধাঁয় পড়ে গেছে।

সম্বন্ধ পাকা হবার দু'দিন আগে সে বলে, জুতো মারলেও সইব বলেছিলাম—তার বদলে পড়াশোনা ছাড়িয়ে খেদিয়ে দিচ্ছ আমাকে?

সুনীল বলে, এরকম বাঁকাভাবে বিচার করিস কেন? পড়া বন্ধ করে কত মেয়ের বিয়ে হচ্ছে,—তাদের কি খেদিয়ে দেওয়া হয়? কোন মেয়ে একেবারে পড়া ছেড়ে দেয়, কোন মেয়ে বিয়ের পরেও পড়ে। লেখাপড়ার দিকে তোর খুব বেশী

ঝোঁক নেই—তুই ঘর সংসার করা ভালবাসিস। তোর প্রকৃতি ওই রকম। ভাল বিয়ে হবে, এইজন্যই বাবা তোকে পড়াচ্ছিলেন। তোকে বেশী পড়িয়ে আমাদের কি লাভ, তোরই বা কি লাভ? শেষ পর্য্যন্ত তুই ওই ঘরসংসার নিয়েই সুখী হতে চাইবি। আল্পনার বরং ঝোঁক আছে লেখাপড়া করে নিজে একদিন বড় হবে, কিছু করবে। নিজের মন হাতড়ে ত্যাখ—ওরকম সাধ কি তোর কাছে?

কিন্তু সুখী হতে পারব কি?

সেটা কেউ বলতে পারে? আমি সেইজন্যই এমন ঘর এমন ছেলে খুঁজছিলাম বিয়ের পরেও পড়া চালিয়ে যেতে ইচ্ছে হলে তুই যাতে সে সুযোগ পাস।

ও!

বিয়ে হচ্ছে বলে তোকে কলেজ ছাড়ানো হবে না। কিছুদিন পরে তুই নিজেই পড়া ছাড়বি—তোর ভাল লাগবে না।

২

যথারীতি কল্পনার বিয়ে হল। বাড়ীতে একজন অস্থায়ী লোক বাড়ল—জামাই অঞ্জন।

মোটামুটি ভালই চাকরী করে, শান্ত লাজুক প্রকৃতি। কিছুক্ষণ আলাপ করার পরেই টের পাওয়া যায় সে একটু কল্পনা বিলাসী এবং ভাবপ্রবনও বটে।

সুনীলের মত নীরস কাঠখোট্টা মোটেই নয়।

সকলে তাই আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে বোনের জন্য সুনীল এমন ছেলে পছন্দ করেছে যার মধ্যে আছে এরকম গুণ, সে যা অত্যন্ত অপছন্দ করে।

মায়া জিজ্ঞাসা করে, এটা কিরকম ব্যাপার হল? আপনি যেটা ন্যাকামি বলেন ওর মধ্যে সেটা তো বেশ খানিকটা আছে। তবু ওকে পছন্দ করলেন?

সুনীল বলে, আমার বোনের মধ্যে ওই ন্যাকামি নেই ?

ও ! তাই বলুন !

অনেকে এটা হিসাব পর্যন্ত করে না। দু'জনের প্রকৃতিতে খাপ খাবে কিনা এটা না দেখেই অন্য বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিবেচনা করে বিয়ে দিয়ে দেয়। ছেলেটি মেয়েটি দুজনেই সব দিক দিয়ে ভাল—কিন্তু দু'জনের ধাত হয় দু'রকম, মিশ খায় না, একজন অন্যজনকে সইতে পারে না।

তা ঠিক ! এটা দেখা উচিত।

এটাও সুনীল হিসাবে ধরতে ভোলে নি যে বিয়ে দিলেই বোন একেবারে ঘাড় থেকে নামে না এবং জামাই-এর পিছনেও খরচপত্র করতে হয়।

কিন্তু অভিজ্ঞতা না থাকায় সঠিক হিসাবটা ধরা যায় নি—আন্দাজে করতে হয়েছিল।

দেখা যায় বাড়ীর মানুষ সত্যই বেশ কিছুটা আরাম আশা করছিল। ছোট ভাই অনিলের বিদ্রোহে সেটার চরম প্রমাণ মেলে। ভূপেশের সঙ্গে একদিন অনিলের লড়াই বেধে যায় হাত-খরচের টাকার জন্য। সকালবেলা সুনীল তখন সবে নন্দাকে পড়িয়ে বাড়ী ফিরেছে।

ভূপেশের তিরস্কারের জবাবে অনিল গলা ফাটিয়ে চেঁচায়, বেশ করি সিগারেট খাই, সিনেমা দেখি। সবাই করে, আমি কেন করব না ? দাদা সেকেলে একটা মেসিন বলে আমিও মেসিন হব ! বড় হয়েছি আমার হাত-খরচ দেবে না তোমরা, এ কি আব্দার নাকি !

ভূপেশ তর্জন গর্জন করে।

সুনীল শুধু বলে, তোমায় তো হাতখরচ দেওয়া হয়।

ওতে হয় না।

তোমায় সঙ্গে নিয়ে বসে, তোমাকে জিজ্ঞেস করে খরচের হিসেব করেছিলাম।

অনিল গোমড়া মুখে বলে, তখন ছোট ছিলাম।

সুনীল উদাস ভাবে বলে, এক বছর আগে ছোট ছিলে, এক বছরে বড় হয়ে গেছ? বেশ, হাতখরচ বাড়াতে না বলেই চেঁচামেচি জুড়েছ কেন?

চাইলে তো পাই না।

মিছে কথা বোলো না। আমার কাছে চাওনি। যা সত্যি দরকার, যা তোমার পাওয়া উচিত, খরচে কুলোলে পাবে না কেন?

অনিল মরিয়া হয়ে বলে, আমার আজকেই তিনটে টাকা চাই।

সুনীল শান্তভাবে বলে, চাই বললেই হয় না জানো। কেন চাই বলতে হবে। সত্যি দরকার থাকলে দেব।

একজন বন্ধুকে সিনেমা দেখাব, নেমন্তন্ন করেছি।

সুনীল মাথা নাড়ে, তাতে তিন টাকা লাগে না।

আমার একজন মেয়ে-বন্ধু।

মেয়েটির বাড়ীতে জানে?

জানে।

সুনীল তাকে তিনটি টাকা দেয়। ভূপেশ ক্ষুব্ধ চোখে চেয়ে থাকে। সুনীলের কাছে কোন্ খরচটা জরুরী, কোনটা নয়, মাথামুণ্ডু বোঝা দায়।

অনিল চলে যেতেই ভূপেশ বলে, এটা তোমার উচিত হল না। সংসারে কত কি হচ্ছে না, ওকে তুমি মেয়ে-বন্ধু নিয়ে সিনেমা দেখার জন্য টাকা দিলে!

সুনীল বলে, উপায় কি? সে শিক্ষা তো আননি, আমাকেও দিতে দেবেন না। নিয়ে যাবে বলেছে, এখন না নিয়ে গেলে বিশ্রী রকম লজ্জা পাবে। মনটা বিগড়ে যাবে। বাধ্য হয়েই দিতে হল।

মুখে যাই বলুক, মনে কিন্তু দ্বিধা থেকে যায়। হিসেব কি ঠিক হয়েছে? ধমকে দেওয়াই কি উচিত ছিল? কিন্তু তার ওসব বালাই নেই বলেই সে তো মেয়ে-বন্ধু থাকার আনন্দ, তাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়ার আনন্দের প্রয়োজন, বাতিল গণ্য করতে পারে না অন্যের জীবনে!

বাঁচা তো যায় জীবন থেকে অনেক কিছুই ছাঁটাই করে। বেকারদের কথা বাদ যাক, আশেপাশে কত চাকুরেরই সব রকম বাহুল্যবর্জিত রুক্ষ সাদা-মাঠা জীবন, কষ্টকর জীবন। অলিতে-গলিতে বস্তি কলোনিতে কত অসংখ্য মানুষ প্রাণপণে কোন রকমে শুধু বেঁচেই আছে।

কিন্তু তার তো সে অজুহাত নেই। সামান্য হলেও মানুষের মত বাঁচার জন্য দরকারী কিছু কিছু বাহুল্য বজায় রাখতেই তো সে সকাল বেলা টুইসনি নিয়েছে। অনিলের একটু আনন্দ পাওয়ার দাবী সে অগ্রাহ্য করবে কোন যুক্তিতে?

মায়া সব শুনে বলে, সত্যি। আমি অবশ্য অন্য দিক দিয়ে ভাবছিলাম। মোটামুটি আমাদের হিসাবটা দাঁড়াচ্ছে এক। অনিলের মেয়ে-বন্ধুটি কে জানেন? আমাদের ছায়া।

তাই নাকি!

মা আজ আগে থেকেই মেজাজ কড়া করে এসে আমায় বললে, শোন, অনিল ছায়াকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চায়, আমরা অনুমতি দিয়েছি। তুই যেন আবার বারণ করিসনে। তোর তো সব বিষয়েই কড়াকড়ি আর বাড়াবাড়ি।

সুনীলের মনে পড়ে, রাত নটায় খালি ঘরে তার সঙ্গে রেবার গল্প করতে যাওয়া মা সমর্থন করেছিল।

মায়া চিন্তিত ভাবে তাকায়।—অথচ সত্যি আমি কড়াকড়ি করি না। বাড়াবাড়ি করলে কে শুনছে আমার কথা? আপনার তবু জোর আছে, আপনার রোজগারে সংসার চলে। আমি তো সত্যি স্বাধীন নই, বাবার ছেলে নেই বলেই যেটুকু স্বাধীনতা ভোগ করছি।

আমার স্বাধীনতা মানেই শেষ পর্য্যন্ত বাবার ইচ্ছা আর অনিচ্ছা। আমি আজ ভাবছিলাম, এ স্বাধীনতা হারাতে আমার তবে এত ভয় কেন? বাপের চেয়ে বরং স্বামীর ওপরেই বেশী জোর খাটানো চলে।

জোর থাকলে চলে বৈ কি।

আমিও ঠিক তাই ভেবেছি। জোর খাটবে না এটাই আমার আসল ভয় নয়।

আমার স্নেহ-মমতা আছে কি নেই, বাবা তা দেখতে আসবে না। কিন্তু স্বামী তো আর ছেড়ে কথা কইবে না। তার পাওনা দিতেই হবে। আমি জানি আমার সে সাধ্য নেই। বাবার সঙ্গে মানিয়ে চলছি কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনবে না। আমার ভয়ের কারণ হল এই। কেমন, ঠিক না?

এত'দিনে নিজের হৃদয়-মনের গভীর রহস্য ভেদ করতে পেরেছে বলে মায়াকে বেশ খুসী মনে হয়।

কিন্তু সে একেবারে ভড়কে যায় সুনীলের প্রশ্নে!

বনবে না ধরে নিচ্ছেন কেন? বাবার যা কিছু আছে অর্দ্ধেক পাবেন, বাবাকে যেটুকু মানেন সেটুকু মেনে চললেই অনেক স্বামী কৃতার্থ হয়ে যাবে।

মায়া মাথা নাড়ে।—সে তো অন্য ভাবে মানিয়ে চলা। আমি জানি আমি কিছুতেই পারব না। ভাবলেও বিশ্রী লাগে। গা ঘিন ঘিন করে। আমার মধ্যে রসকস নেই।

কেন নেই?

মায়া বিব্রতভাবে হেসে বলে, যাঃ, আপনি সব গুলিয়ে দিলেন। ভাবছিলাম আসল ব্যাপারটা বুঝি স্পষ্ট বুঝে গিয়েছি। তা তো নয়, রসকস নেই কেন এটাই আসল প্রশ্ন। সবার আছে আমার নেই কেন?

আমারও কিন্তু নেই।

সেদিন ছিল ছুটি।

এক রকম কিছু না ভেবেই সুনীল প্রস্তাব করে, বহুদিন সিনেমা দেখি না। যাবেন?

বেশ তো। চলুন না।

ওরা কোনটাতে গেছে জানেন? সেখানে গেলে জানা যেত ওদের কি রকম ছবি পছন্দ। ছবিগুলি শুনছি নাকি যাচ্ছেতাই হচ্ছে আজকাল,—দু'একটা ছাড়া।

মায়া বলে, ছায়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওর কোন চেনা মেয়ে দেখেছে, সে নাকি বলেছে, ছবি ভাল নয় কিন্তু বেশ মজার ছবি।

তাহলে হাসির ছবি হবে। হাল্কা ভাঁড়ামির ছবি। তবু চলুন দেখে আসি।

অনিল আর ছায়া দেখতে গিয়েছিল বিকালের শো'তে। চৈত্রের মাঝামাঝি, বেলা খানিকটা বড় হয়েছে। ভিড়ের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে অনিল ক্রুদ্ধস্বরে বলে, এখুনি বাড়ী ফিরতে হবে। কবে পাশ করব, চাকরী করব, তবে দুটো টাকা পাব। এমন রাগ হয় ভাবলে!

ছায়া হাতের একগাছি চুড়ি খুলে তার হাতে তুলে দেয়, কথা বলতে গিয়ে চাপা উত্তেজনা আর আবেগে গলা তার কেঁপে যায়।

মরে গেলেও বাড়ী যাব না এখন। এটা বিক্রী কর।

বাড়ীতে কি বলবে?

বলব হারিয়ে গেছে।

অনিলের বিবেক নয়, পৌরুষে একটু বাধে। ইতস্ততঃ করে বলে, তোমার চুড়ি বিক্রী করে—

ছায়া ফুঁসে বলে, তোমার টাকা আমার চুড়িতে তফাৎ আছে নাকি? ছবিতে দেখলে না মেয়েটা কি ভাবে—

এ যুক্তির পরে আর কথা কি!

সন্ধ্যাবেলা সেই ছবি দেখতে যায় সুনীল আর মায়া। শো ভাঙবার পর ভিড়ের সঙ্গে রাস্তায় নেমে এসে তারা দুজনেই যেন হাঁফ ছাড়বার জন্য খানিকক্ষণ বাক্যহারা হয়ে থাকে।

শেষে মায়া বলে, গা ঘিন-ঘিন করছে। বাড়ী গিয়ে হাজার নাইলেও তো কাটবে না। ঠিক যেন দেশের বাড়ীর খাটা পায়খানার তলায় গিয়ে দু'ঘণ্টা সময় কাটিয়ে এলাম।

সুনীল বলে, সে গা ঘিন-ঘিন দু'একবার সাবান ঘসে নাইলেই কেটে যায়! এরা যে চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, মনে প্রাণে ইনজেকসন করে দিয়েছে, ঘেন্নার জিনিষ। বাড়ী যেতে পারব না। চলুন একটু ফাঁকা যায়গায় বেড়িয়ে আসি।

লেকে যাবেন ?

নাঃ।

নদীর ধারে যাই চলুন।

চলুন।

সুনীল বলে, ট্রামে বাসে যেতে হবে কিন্তু, ট্যাক্সির টাকা নেই।

মায়া বলে, ট্রামে বাসে যাওয়াই ভাল। দশটা ভালমানুষের ভিড়ে গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে একটু স্বস্তি পাব। সত্যি বলছি আপনাকে সিনেমায় ভিড় যদি না হত, রাগের মাথায় জ্ঞান হারিয়ে আমি একটা কেলেঙ্কারি করে বসতাম।

সুনীল বাসের ডাণ্ডা ধরে ঝুলছিল। সহরতলীতে বাস একটু হাল্কা হলে সে লেডিজ সিটেই মায়ার পাশে বসবার সুযোগ পায়।

সুনীল খেয়াল করিয়ে দেয়ার জন্য বলে, ফিরতে কিন্তু অনেক রাত হয়ে যাবে।

মায়া বলে, ছেলেমানুষি করবেন না। রাত হলে হবে।

ছেলেমানুষি! সুনীল করবে ছেলেমানুষি!

মায়া সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে, দেখলেন তো? নোংরা সিনেমা দেখবার ফল? আপনি শুধু আমায় মনে করিয়ে দিলেন রাত হয়ে যাবে, আমি বিদ্রোহিনীর মত ঝেঁঝে উঠলাম।

সুনীল বলে, আমি কিন্তু এতটা বিচলিত হইনি। কিছু কিছু নমুনা দেখা আছে। কিছুকাল আগে মাসখানেকের মধ্যে দশ বারটা সিনেমা দেখেছি বল্লে বিশ্বাস করবেন ?

করব।

নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে কয়েকটা শনি রবিবার আপনার কাছে ছুটি নিয়েছিলাম, মনে আছে ?

এবার আমি রাগ করব। আমার কাছে নয়, বাবার কাছে ছুটি নিয়েছিলেন। বাবা বিছানায় পড়ে আছেন বলে আমি বাবার হয়ে স্কুলটা চালাই ভুলবেন না।

বেশ তো তাই হল। ছুটি নিতাম সিনেমা দেখার জন্য। একদিনে দুটো ছবি দেখতাম—একটা হলিউডের ছবি একটা দেশী ছবি। আর ছবি দেখার আগের মাঝের পরের সময়টা কি করতাম জানেন? মার্কিন থেকে আমদানী নোংরা বই পড়তাম। বাজার ছেয়ে গেছে।

পরীক্ষার ফলটা কি হয়েছিল? কি বুঝেছিলেন?

বুঝেছিলাম এও একটা মস্ত বিপদ দাঁড়িয়েছে ছেলে মেয়ে ভাইবোন নিয়ে ঘরসংসার করার। আজ প্রমাণ দেখলেন তো? আপনার বোন আমার ভাই এই ছবি দেখার জন্য পাগল। আমাকে তর্কে হারিয়ে আমার কাছে পয়সা নিয়ে অনিল আজ ছায়ার সঙ্গে এই ছবিটা দেখেছে। আমি না বলতে পারিনি। এরকম ছবি দেখানো বন্ধ করতে পারি না। আর দশটা ছেলে, মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে এসব ছবি দেখছে তাও ঠেকাতে পারি না—আমার ভাই বলেই কি করে জবরদস্তি করব যে তুমি সন্ন্যাসী হও?

•

সহরতলী দিয়ে বাস চলেছে। গঙ্গার কাছাকাছি পাশাপাশি রাস্তায়! গঙ্গার ধারে শুধু কারখানা আর কারখানা। বাংলার এটা সেরা শিল্প অঞ্চল। তাই মনে হয় কলকাতা সহরটাই বুঝি নিজেকে এদিকে এগিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনেক দূর অবধি।

মায়া বলে, আমিও ঠিক এইজন্যই ছায়াকে যেতে দিলাম। না যেতে দেওয়াও বিপদ। সবাই যাচ্ছে আমি কেন যেতে পাব না ভেবে মুষড়ে যাবে। এই হয়েছে মুস্কিল। ছেলেমানুষ তো, বুঝবে না।

গঙ্গার তীরবর্তী দুটি প্রধান স্থান ও স্টেশন পার হয়ে বাস চলেছে, ঠিক ঠিক যায়গায় বসানো সিনেমা চোখে পড়েছে। এতক্ষণে হাল্কা হয়ে এসেছে বাস, বাদুড় ঝোলারা নেমে গিয়ে বাসে এখন কেবলমাত্র ঠেসাঠেসি গাদাগাদি করে সিটে বসা যাত্রীরা আছে।

মায়া একটা কঠিন প্রশ্ন করে সুনীলকে।

দশ বারটা ছবি দেখে ওই সব বই পড়ে আপনার একটুও মজা লাগে নি? আমি খুব সিরিয়াসলি জিজ্ঞাসা করছি কিন্তু। আজকের ছবিটা বড় বেশী নোংরা—একেবারে বীভৎস। দু'একটা কম নোংরা ছবি দেখে আমি কিন্তু কিছুটা মজা পেয়েছি। আপনি একটুও পান নি? কিছুক্ষণের জন্য?

সুনীল বলে, মজা? আমার কেবলি মনে হয়েছে এত সস্তা মজা দিয়ে এরা লোক ভুলায় কি করে! ব্যাপারটা কি তা অবশ্য জানি, খেতে না পেলে মানুষ ডাষ্টবিন ঘেঁটেও খিদে মেটায়—তবু অবাক লেগেছে। এখানে নামা যাক। সুন্দর একটি বাঁধানো ঘাট আছে।

চেনা যায়গা?

ছেলেবেলা বছর দুই এখানে ছিলাম।

তারা ঘাটে গিয়ে বসে। সুনীল জিজ্ঞাসা করে, গা ঘিনঘিন করা কমেছে?

মায়া হেসে বলে, হ্যাঁ, ও আর কতক্ষণ থাকে?

শীতের শেষের স্নিগ্ধ হাওয়া বইছে। এপারে ওপারে কলকারখানার ঘন বস্তির আলোকমালা। কথা তাদের আপনা থেকেই কমে আসে। কথা বলার অবকাশ পাবে অনেক, নদীর ধারে এভাবে বসে বিশ্রামের অবকাশ পেয়েছে অনেকদিন পরে।

বড় বেশী খাটতে হয় দুজনকেই।

৩

আপিসে তাকে এদিক থেকে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর মানুষ মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু ভোঁতা হৃদয় কি গোপন থাকে ?

শীত শেষ হয়ে এসেছে।

একটানা উত্তুরে হাওয়া আর বয় না। মাঝে মাঝে এলোমেলো ভাবে দিক পরিবর্তন করে। আমেজ পাওয়া যায় আগামী বসন্তকালের।

সহরের বুকেও টের পাওয়া যায়। আপিসে কাজ করতে করতে।

টিফিনের সময় সুনীল বলে, গরমকাল আসছে। শীতকালটা যেন দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়।

দীনেশ বলে, তুমি যে বসন্তকালটাকে একেবারে পাত্তাই দিলে না হে! ঋতুর রাজা—শীত কেটে এলে আগে বসন্তের জয়গান করতে হয়।

করবে। রোজ শ'-এ শ-এ করবে। এখন থেকেই সুরু করেছে।

দীনেশ একটু হাসে।

তুমি বড় বেশী বস্তুবাদী হয়ে উঠছ সুনীল।

বস্তুবাদী ? মোটেই না। বরং সত্যবাদী বলতে পার। এদেশে আবার বসন্তকাল !

ভূপেন বলে, কথাটা কিসের হিসাবে বললে ? দেশের এমন দুরবস্থা, বসন্তকাল দিয়ে লোক কি করবে ?

সুনীল মাথা নাড়ে। পেপার ওয়েটটা দু'বার টেবিলে ঠুকে সহজভাবেই বলে, মোটেই নয়। দেশের লোকের দুরবস্থা বলে ঋতুপরিবর্তন হবে না ? বসন্তকাল আসবার হলে লোকে না খেয়ে মরলেও ঠিক এসে হাজির হবে। আমি বলছি

এদেশে বসন্ত বলে কোন ঋতুই নেই। শীতের পরেই গরমকাল। মাঝখানে দু'চারটে দিন একটু একটু গা জুড়ানো হাওয়া বয়—বাস্।

নবীন বলে, বেশ তো বললেন? নিজেই বাতিল করে দিলেন নিজের কথা!

কি রকম?

দু'চারদিনের জন্য বলেই তো বসন্তকালের এত মান! সারা বছর বসন্তকাল চললে কে কেয়ার করত? বসন্ত নিয়ে দখিণা নিয়ে এত যে কাব্য হয়েছে, আপনি সেটার মানেই বোঝেন নি সুনীলবাবু।

নবীনের বয়স কম। বছরখানেক আপিসে ঢুকেছে। ঢুকেছে খিড়কির দরজা দিয়ে। পরীক্ষা পাশের গুণ বা কোয়ালিফিকেশনের জোরে তাব চাকরী নয়। অঘোরের মেয়ে তাকে স্নেহ করে।

শরৎ তাড়াতাড়ি বলে, কি বাজে বকছ নবীন? রবীন্দ্র কাব্যের ওপর ওনার একটা ইংরাজী প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে খবর রাখ?

নবীন বলে, আমি কি সুনীলবাবুকে মুর্খ বলেছি? ওনার কাছে আমি গোমুখ্যু তা জানি না? আমি বলছিলাম—

হরেন বলে, তোমার আর বলে কাজ নেই।

রমেশ বলে, আহা, বলতে দিন না ওকে।

সুতরাং সকলে চুপ করে যায়। একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই চুপ করে।

এই ঘরেই তাদের কজনের সঙ্গে প্রায় সমান আসনে বসেই কাল পর্য্যন্ত চাকরী করেছে রমেশ, পদটা ঠিক তাদের সমান না হলেও এমন কিছু উঁচু ছিল না সম্মান বা মাইনের দিক দিয়ে, যে তাকে সম্মান করে কথা বলার দরকার হবে।

আজকেই প্রথম সে তাদের মধ্য থেকে একটু তফাতে সরে গিয়ে আপিসের এই ঘরটার একমাত্র বিচ্ছিন্ন বড় এবং বিশিষ্ট টেবিলটাতে গিয়ে বসেছে।

ও টেবিলে বসত বুড়ো রতনবাবু। দিন তিনেক আগে বুড়ো মানুষটা হঠাৎ বিনা নোটিশে আপিসের চাকরীতে ইস্তফা দিয়েছে, একেবারে চিরদিনের জন্য। ইহলোক ছেড়ে যাওয়ার প্রয়োজনে।

অঘোর নিজে রমেশকে রতনবাবুর কাজটা সাময়িকভাবে কিছুদিন চালিয়ে দেবার দায়িত্ব দিয়েছে। যতদিন না ওই পদে নতুন একজন বাহাল হয়।

তাকে ওই টেবিলে গিয়ে বসবার কথাও অঘোর বলে গিয়েছে নিজে থেকে।

রমেশ ওই শূণ্য চেয়ারে স্থায়ীভাবে বসতেও পারে এরকম একটা কাণাঘুষা চলছে। অঘোরবাবুর একটি মেয়ে আছে। মেয়েটির বয়স কম করে ধরলেও পঁচিশের নীচে নয়।

গতবার বি, এ, পাশ করেছে। তিনবারের চেষ্টায়। রং একটু কালো, পা খোঁড়া। লাবণ্যে ঢল ঢল মুখ। কিন্তু মুখে ঘন রোমের বাড়াবাড়ি।

সামনের রবিবার দুপুরে খাওয়ার জন্য অঘোর রমেশকে তার বাড়ীতে নেমন্তন্ন করেছে!

আপিসের সকলেই জানে যে অঘোরের পিসী রেঁধে দিলেও রমেশকে সব কিছু তার মেয়ে বিভার একার রান্না বলে খাওয়াবে।

বিভার গান শোনাবে।

এমন মেয়ে আর হয় না। এদিকে বি, এ পাশ ওদিকে রান্নায়, ঘরকন্নায়, গানে, অদ্ভুত প্রতিভাবতী।

এসব খবর সকলের জানা হয়ে গেছে এইজন্য যে রমেশ অঘোরের প্রথম চয়েস নয়। কিছুকাল আগে ভূপেনকেও সে কয়েকবার বাড়ীতে কারণে অকারণে নেমতন্ন খাইয়েছিল। গান শুনিয়েছিল।

বিভার রান্না, বিভার গান!

আচমকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ভূপেনকে নেমন্তন্ন খাওয়ানো। ভূপেন বন্ধুদের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়েছিল, অঘোরবাবু টের পেয়ে গেছে আমার কাছে আশা নেই। হলাম বা দ্বিতীয় পক্ষ? ছেলেপিলে নেই, কি আর এমন বয়স হয়েছে আমার? কালো খোঁড়া বুড়ী মাগীকে বিয়ে করতে গরজ পড়েছে আমার!

বন্ধুরা বলেছিল, কদিন তো বেশ মজা লুটে নিলে।

তারপর ভূপেনের বিয়ে হয়েছে অন্য মেয়ের সঙ্গে। পাশ করা গান জানা না হোক বৌ সে পেয়েছে সুন্দরী।

ভূপেনের মামা এই কারবারের অংশীদার।

বোধ হয় সেইজন্যই অঘোর প্রতিশোধ নিতে, তার কোন ক্ষতি করতে পারে নি।

মৃত রতনবাবুর চেয়ার টেবিলে অস্থায়ী অনিশ্চিত দখলিসত্ব পেয়েই রাতারাতি সহকর্মীদের উপর হুকমের সুরে কথা বলার কেরামতি রপ্ত করতে দেখে নবীনও বোধ হয় দমে গিয়েছিল।

রমেশের সায় পেয়েও সে আর এদেশের অস্থায়ী বসন্ত দখিনা কাব্য ইত্যাদির পক্ষ নিয়ে মুখ খুলতে পারে না।

সুনীলের সঙ্গে তর্ক করা এক কথা।

রমেশের হুকুমে সুনীলের বিরোধিতা করা অন্য ব্যাপার।

টিফিনের সংক্ষিপ্ত সময়টা শেষ হতে সে যেন হাঁফ ছেড়ে কাজে মনোযোগ দেয়।

গরম জলে ভেজাল দেওয়া একরকম গাছের শুকনো পাতা ভেজানো খানিকটা নির্য্যাস এক চামচ দুধ দিয়ে খেয়ে টিফিন করা।

টিফিনটা জমে গল্পগুজব তর্ক বিতর্কেই।

এতদিন রমেশও টিফিনের টাইমটুকু ওইভাবেই তাদের সঙ্গে জমিয়েছে।

আজ সদ্য মৃত রতনবাবুর চেয়ারে বসে তারই তিরিশ বছরের অধিকার করা টেবিলে সে টোষ্ট আর ডিমের কারি নিয়ে তাদের সামনেই টিফিন সুরু করেছে টাইম পেরিয়ে যাবার পর।

নির্ভয় নিশ্চিন্তভাবে!

রমেশ টোষ্ট আর ডিম চিবোতে চিবোতে বলে, কি হল নবীন? থেমে গেলে যে?

নবীন ভারি চালাক ছেলে।

টাইপ করার যন্ত্রে হাত দুটিকে ব্রেক কষিয়ে থামিয়ে সে বলে, অঘোরবাবু তিনটের মধ্যে এ রিপোর্টটা চেয়েছেন।

নিজেই তাই টাইপ করছ?

কি করি বলুন?

এ ঘরে সুনীলেরও টেবিল চেয়ার, সেও ঠিক ডেস্কে বসা কেরাণী নয়। কিন্তু রমেশের দখল করা কেবিনেট টেবিল আর কুশন দেওয়া চেয়ারের সঙ্গে তার সাদামাটা কাঠের চেয়ার টেবিলের তুলনাই হয় না।

ঠিক ইংরাজী সাহিত্যের বিদ্যা নিয়ে সুনীলের কাজটা করা যায় না। ভাগ্যে শুধু ইংরাজী সাহিত্যে পাশ করাটাই সে ছাত্রজীবনের একমাত্র ব্রত করেনি, টেকনিক্যাল বিদ্যায় পাশ করার জন্যও নিজেকে প্রস্তুত করছিল।

নইলে অঘোরবাবুর দেওয়া এই চাকরী করা অসাধ্য হত তার পক্ষে।

আজ রতনবাবুর আসনে রমেশকে বসতে দেখে তার মনে হয়, সত্যই অসাধ্য হত কি?

বিদ্যাও কাজে লাগবে না রমেশের, রতনবাবুর অভিজ্ঞতাও তার নেই। তবু সে যদি ও কাজ চালাতে পারে টেকনিক্যাল বিদ্যা ছাড়াই সেও বা পারত না কেন তার এই কাজ চালিয়ে নিতে!

এরকম কত অনাড়িই তো কত রকম দায়িত্বপূর্ণ পদ জুড়ে বসে আছে—বিদ্যা আর অভিজ্ঞতায় পাকা পোক্ত না হলে সে কাজ করা মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার!

মনে মনে সুনীলকে সকলেই কম বেশী সমীহ করে। নবীনও করে—যতই সে সতেজে তর্ক করুক তার সঙ্গে। নবীনের কাছে সমীহ করা আর ভয় করা অবশ্য এক জিনিষ নয়।

একালের ঘা-সহা শক্ত লড়ায়ে ছেলে। শ্রদ্ধার সঙ্গে ভয়ের ভেজাল থাকতেই হবে এ নিয়ম সে মানে না।

সুনীল হিসাবী ধীর শান্ত মানুষ—নবীনের ধারণা সুনীলের চরিত্রের এদিকটা সে বিশেষ পছন্দ করে না। ধীর শান্ত হিসেবী হওয়ার মধ্যেই কেমন একটা সেকেলে হওয়ার ইঙ্গিত আছে।

সে শ্রদ্ধা করে সুনীলের দৃঢ়তাকে—হিসাব করে হলেও কোন বিষয়ে দ্বিধা সংশয় না করেই স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাকে।

সুনীলকে সকলের এই সমীহ করার মনোভাব রমেশকে বরাবর খানিকটা ঈর্ষাতুর করে রেখেছে।

রতনবাবু তোষামোদ ভালবাসত। তাকে সব চেয়ে বেশী তোষামোদ করত শরত। সুনীলকে কেউ তোষামোদ করে না—শরতও নয়। সহজ স্বাভাবিক ভাবেই তার সঙ্গে সকলে কথাবার্তা বলে।

নবীনের তার ভুল ধরা আর সতেজ তর্ক করা দেখে তো প্রায় মনেই হয় না যে সে তাকে এতটুকু কেয়ার করে!

তবু টের পাওয়া যায় সকলের মনের শ্রদ্ধার ভাবটা।

আজ যেমন টের পাওয়া গেল স্পষ্ট ভাবেই।

ওরাই নবীনকে থামিয়ে দিচ্ছিল, একটু করতালি করে সে যে নবীনকে তর্ক চালিয়ে যেতে বলেছে, এটা কেউ পছন্দ করেনি।

নবীন পর্য্যন্ত নয়!

এভাবে তার সমর্থন পেয়ে তর্ক করে গেলে সুনীলকে তাতে অপমান করা হবে।

সুনীল নিজের মনে কাজ করে চলেছে। পিয়ন নিতাই তার টেবিলে দুটো ফাইল রেখে যায়। শরত একটা মোটা খাতা তুলে নিয়ে এসে খুব খুসীর সঙ্গে তাকে কি যেন দেখায়—একটা বড়রকম ভুলের গোড়াটা সে খুঁজে পেয়েছে।

হাতগুটিয়ে বসে রমেশ চেয়ে চেয়ে ছাখে!

তার দিকে ফিরে না তাকিয়ে সুনীলকে এমন আনন্দের সঙ্গে ভুল খুঁজে পাবার খবরটা জানানো। এই শরত কী তোষামোদটাই করত রতনবাবুকে যার চেয়ার টেবিলে সে আজ বসেছে! ওর কি খেয়াল নেই যে এখানে যে বসে তার মধ্যে রতনবাবুর ক্ষমতা বর্তায়?

রতনবাবুর ফাইলপত্র সে নাড়াচাড়া করে দেখতে পারে। চাবি লাগানো ড্রয়ার খুলে দেখতে পারে কি কি মূল্যবান দলিল আর চিঠিপত্র সেখানে আছে।

কিন্তু রমেশের কেমন যেন বিতৃষ্ণা বোধ হয়।

মোটে তিনদিন আগে মানুষটা মরেছে।

সে পর্য্যন্ত তার দখল করা চেয়ারে বসতেই কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে এখন। পদোন্নতির উল্লাস আর গর্ব্ববোধে এতক্ষণ এটা যেন চাপা ছিল—তার অতি মৃদু প্রথম হুকুমটি অগ্রাহ্য করে সকলে কাজ নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে পড়ার পর এখন কেবলি তার সরু সরু পা-ওলা প্যান্ট আর গলা পর্য্যন্ত বোতাম আঁটা কোট পরা টাক, পাকা চুল, বাঁধানো দাঁত সমেত ফর্সা মোটা বুড়ো মানুষটাকে কেবলি মনে পড়ছে।

এখনও শ্রাদ্ধ শান্তি হয় নি মানুষটার।

ফাইল খুললেই তো চোখে পড়বে তার পরিচিত সই! ড্রয়ার খুলে তার নস্তের শিশি কিম্বা পানের ডিবাটা চোখে পড়বে না তাই বা কে বলতে পারে।

কেমন একটা জ্বালা বোধ করে রমেশ।

অঘোরবাবুই চাকরী করে দিয়েছে সুনীলকে। অঘোরবাবুই তাকে বসিয়েছে রতনবাবুর আসনে।

ওরা কিন্তু সমীহ করে সুনীলকে। ঘরে যেন সে উপস্থিত নেই এমনিভাবে তার দিকে একবার না তাকিয়েই নিজের মনে অথবা পরস্পরে জিজ্ঞাসা ও পরামর্শ করে কাজ চলেছে।

রমেশ যেন মরিয়া হয়ে হঠাৎ একটা সিগারেট ধরিয়া বসে।

এই আপিসে এই ঘরে চাকরী করতে করতে তার এই প্রথম সিগারেট ধরানো।

আজ এই স্বাধীনতা সে পেয়েছে—আপিস টাইমে আপিসের মধ্যে সিগারেট ধরিয়ে টানা।

কারো কিছু বলার নেই করার নেই।

তার সিগারেট ধরানো সিগারেট টানার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে আপিসের মধ্যে সিগারেট টানার প্রথম স্বাধীনতা ভোগকে কেউ গ্রাহ্যও করছে না!

রাগ চড়তে থাকে রমেশের মগজে।

সিগারেটটা শেষ করে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে প্রায় রতনবাবুর স্বর নকল করেই সে বলে, ষ্টেটমেণ্টটা আমায় দেখিয়ে নেবেন সুনীলবাবু।

সুনীল ধীর গলায় বলে, অঘোরবাবু একটা এষ্টিমেট চেয়েছেন, আমি সেটা তৈরী করছি। অঘোরবাবু এটা নিজে দেখবেন।

রমেশ ধৈর্য্য হারিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, আহা, অঘোরবাবুই তো দেখবেন। ওঁকে দেখাবার আগে আমায় একবার দেখিয়ে নেবেন।

সকলে এবার মুখ ফিরিয়ে তাকায় তার দিকে।

কোম্পানী তিরিশ বছরের কিন্তু মাত্র গত যুদ্ধের টাইমে কোম্পানীটা বড় হওয়ায় এবং বড় আপিস সৃষ্টি করতে বাধ্য হওয়ায় এই ঘরটায় আপিসের ঐতিহ্য মোটে পাঁচ ছ' বছরের।

তবু, গত পাঁচ বছরের মধ্যে আজই যেন নাটক সুরু হল এমনি নাটকীয় ভাবে থম থম করে ঘরটা।

মিনিট দুই চুপচাপ।

রমেশের হুকুম শুনেও সুনীল যেন কিছুই বলবে না। তাকে কেয়ার করবে না।

এই দুমিনিটেই রমেশ ভয়ে ঝিমিয়ে যায়। অঘোরবাবুর বিশেষ কাজের, হয় তো বা গোপনীয় কাজের কাগজপত্রে নাক গলাতে চেয়ে সে বোকামি করে ফেলেছে। শুনে যদি অঘোরবাবুর রাগ হয়!

রমেশ বলে, যাক গে। ভাল করে তৈরী করুন এষ্টিমেটটা। ভুল টুল না করে বসেন এইজন্য দেখতে চেয়েছি।

এবার স্নীল পেন রেখে একটা সিগারেট ধরায়!

এই আপিস ঘরে আপিস টাইমে তারও এই প্রথম সিগারেট ধরানো।

বলে, এষ্টিমেটটা অঘোরবাবু সোজা ওঁকেই দিতে বলেছেন। স্পষ্ট বলেছেন, আর কাউকে যেন না দেখাই। আপনি দেখতে চাইলে দেখাতে পারি। তবে আমাকে বলতে হবে যে আপনি নিজে দেখে ভুল টুল ঠিক করে দিয়েছেন।

যাকগে।

দেখবেন না এষ্টিমেটটা?

অঘোরবাবুকেই দেখাবেন।

কাগজপত্র নাড়াচাড়া ছাড়া ঘরে অনেকক্ষণ ধরে আর টুঁ শব্দটি শোনা যায় না।

কেবল নবীন নয়, সকলেই মাঝে মাঝে কর্মরত স্নীলের দিকে তাকায় এবং নবীনের মত অতটা স্পষ্টভাবে না হলেও সকলেরই মনে হয় মানুষটা স্নীল শুধু শক্ত নয়, মানুষটা সে বেশ একটু নিষ্ঠুর।

রমেশের জন্য তাদের কোন সহানুভূতি নেই, তাকে অপদস্থ করে উচিত কাজই স্নীল করেছে। কিন্তু মানুষটা নিষ্ঠুর না হলে কি এমনভাবে অপদস্থ করতে পারত, অঘোরবাবুই হুকুম দিয়েছেন এষ্টিমেটটা অন্য কাউকে দেখানো বারণ—একথাটা গোড়ার দিকে চেপে রেখে?

গোড়ায় বললেও রমেশ অপদস্থ হত। কিন্তু এতটা হত না।

সন্ধ্যার পর মায়াদের বাইরের ঘরটি মুখর হয়ে ওঠে কয়েকটি টাইপ রাইটিং মেশিনের শব্দে। তিন মাসের মধ্যে শর্টহ্যাণ্ড টাইপ রাইটিং আরও কমিয়ে দেবার সর্ত—তবে অনেক ছাত্রছাত্রীই আরও দু'একমাস স্বেচ্ছায় টেনে যায়।

এখন ছাত্রী আছে দু'টি। মায়ার বাবা দীনেশ যখন চালাত তখন ছাত্রী হত না। সে স্থায়ীভাবে বিছানা নিলে মায়া স্কুলটা চালাবার দায়িত্ব নেবার পর দু'তিনটি ছাত্রী শিখতে আসে।

সাতটা থেকে ন'টা পর্য্যন্ত ক্লাস। সুনীল আটটা পর্য্যন্ত মায়ার সঙ্গে এক ঘণ্টা শেখায়। বাকী একঘণ্টা ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই প্র্যাকটিস করে। মায়া একাই তখন ক্লাসটা সামলাতে পারে।

দুপুরে নবীনের সঙ্গে একচোট তর্ক হয়েছে, ক্লাস নিয়ে বাড়ী ফিরে নবীনকে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে দেখে সুনীল ভাবে, ছেলেটা আবার তর্কের জের টানতে হাজির হল নাকি ?

বাড়ীতে ঘরের টানাটানি। বৈঠকখানা নিয়ে তিনখানা ঘরে এতগুলি লোকের কুলোতে চায় না। বিয়ে না করলেও ছোট ঘরখানা দখল করেছে সুনীল একা।

সুনীল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে সারাদিন তার খাটুনি, বাড়ীতেও তাকে পড়াশোনা করতে হয়, নিজস্ব একখানা ঘর না হলে তার চলবে না।

হেসে বলেছে, ধরে নাও বিয়ে করেছি ! তখন তো একটা ঘর ছেড়ে দিতেই হত আমাকে !

কিছু না বলে সে ঘরটা দখল করে থাকলে কেউ কিছু ভাবত না। সাংসারিক নিয়মেই একটা ঘর দখল করার পূরো অধিকার তার আছে—অন্যদের যতই অসুবিধা হোক।

কিন্তু অধিকার খাটাবার বদলে এভাবে যুক্তি দিয়ে নিজের স্বার্থপরতাকে সমর্থন করতে চাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়েছে সকলেই।

কিন্তু সেই সঙ্গে সুনীল একথাও বলে দিয়েছে যে সে যতক্ষণ বাড়ী থাকবে না, তার ঘরটা সকলে ব্যবহার করতে পারবে।

আগে সকালে নিজের ঘরে লেখাপড়া করত সুনীল, তাই তার নির্দ্দেশ ছিল যে সন্ধ্যার পর অনিল আর আল্পনা তার ঘরে পড়বে, পুলিন আর কল্পনা পড়বে বৈঠকখানায়।

কল্পনা আর আল্পনা এক ঘরে পড়তে বসলে শুধু বকবক আর ঝগড়া করে পরস্পরের সঙ্গে—লেখাপড়া হয় না।

অনিল আর কল্পনা এক ঘরে পড়তে বসলে কল্পনা বার বার তাকে পড়ার মানে জিজ্ঞাসা করে, অনিল চটে গিয়ে তাকে ধমকায়। দু'জনের মধ্যে প্রায় কথা বলাবলি বন্ধ হয়ে যায় দু'একদিনের জন্য !

পুলিন একটু হাঁবাগোবা। সে দাদা দিদিদের যেমন রকম সকম, তেমনিভাবে চলে। চারটে দাদাদিদি হোক আর একটাই হোক—পড়তে বসে তারা মন দিয়ে পড়লে সেও পড়ে, তারা হাসাহাসি গল্পগুজব করলে সে চুপচাপ শোনে, ঝগড়াঝাঁটি করলে সেও আবোলতাবোল চেঁচামেচি করে।

জটিল সমস্যা !

এ সমস্যা সমাধানের জন্যই সন্ধ্যায় লেখাপড়া কে তার ঘরে কে বৈঠকখানায় আর কে ভূপেশের ঘরে করবে সুনীল নিয়ম বেঁধে দিয়েছিল।

সকালে এতদিন সবাই পড়ত বৈঠকখানায়।

সুনীল নিজের ঘরে বসে তার নতুন প্রবন্ধটা লিখতে লিখতে শুনতে পেত বৈঠকখানা থেকে কলেজ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যেন পাঠশালার স্বরে অ স্বরে আ পড়ার আওয়াজ তুলে পাঠাভ্যাস করছে।

সকালে টিউসনি নেবার পর সে পড়ুয়া ভাইবোনদের হিসাব করে বৈঠকখানা আর নিজের ঘরে লেখাপড়া করার জন্য ভাগ করে দিয়েছে।

বাজে শিক্ষা। অর্থহীন ফাঁকিবাজী। শিক্ষা। তবু শিক্ষা দিতেই হবে !

পাশ ফেলের দাগুায় মাপতেই হবে ওদের বেশীর ভাগকে ফেলের ডাণ্ডার ঘায়ে কাত করে।

পুলিন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ছেলেটা অস্বাভাবিকরকম দুরন্ত।

চেষ্টা করেও তাকে জাগিয়ে খাওয়ানো যায় নি রাত্রের রুটি তরকারী।

দুধ খাবি ?—বললে হয়তো তাকে একেবারে জাগানো যেত না, কিন্তু ঘুম জড়িতস্বরে সে নিশ্চয় বলত, দাও।

ছিঁটেফোঁটা দুধ দিলেও চুমুক দিয়ে খেয়ে নেতিয়ে পড়ত।

রুটি সে খেতে পারে না। এই জল কাদার দেশের বাচ্চা। চোদ্দশ পুরুষ ধরে যারা ভেতো তাদের বাচ্চা।

তার মা ঝংকার দিতে ভুলে গেছে যে, মাছ ভাত মানায় বলে কি মাছরুটি মানায়! এস্কিমোরা সিল মাছ পচিয়ে খায়, তাদের দেশে গেলে বরং ভাল করতাম। একরকম খাবার জুটত—চোদ্দশ' পুরুষ যা খেয়েছে।

অনিলের মাথা ধরেছে।

সে শুয়ে পড়েছে সকাল সকাল।

আল্পনা একা বৈঠকখানায় ভদ্রতা রক্ষা করছে নবীনের সঙ্গে।

: কি ব্যাপার নবীন?

: বলছি।

: এতক্ষণ বসে না থেকে আমাকে একটা খবর পাঠালেই হত?

: দরকার হলেই বলে পাঠাতাম। অনেকদিন পরে এসেছি, এদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলছিলাম—ভাবলাম যে আপনি এলেই আপনাকে বলা যাবে আসল কথা। মুখ হাত ধুয়ে আসুন?

নবীনের কথাবার্তা একটু রহস্যময় মনে হয় সুনীলের।

: ব্যাপার কি বল না?

: বিভাদি আপনাকে একবার যেতে বলেছেন—জরুরী দরকার।

: আজ এখন? এখন আমি কোথাও যেতে পারব না।

: বিভাদি বলতে বলেছে যে ওর খুব বিপদ—আপনাকে যেতেই হবে।

সুনীল এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, এবার বসে। বলে, কি বিপদ নবীন? কি হয়েছে?

নবীন বলে, আমি তো জানি না।

: তুমি ওর কাছ থেকে আসছ, তুমি জান না কি হয়েছে? সে আবার কিরকম বিপদ?

: আমি কি করে বলব ? আমায় কিছুই বলে নি।

: জিজ্ঞাসা করেছিলে ?

: নিশ্চয়। আমি জানতে চাইলাম কি বিপদ, কিছু বললে না। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম আপনি যদি জানতে চান কি বিপদ তাহলে কি বলব, তখনও কিছু বললে না।

আল্পনা চুপ করে শুনছিল। এবার সে থাকতে না পেরে বলে ওঠে, দাদা তুমি একবার যাও। কিছু নিশ্চয় হয়েছে। বেচারী খোঁড়া নইলে নিজেই হয় তো আসত !

সুনীল বলে, তুই চুপ কর। বিভা কি করছিল নবীন ?

নবীন বলে, চুপচাপ শুয়েছিল, আবার কি করবে ? আমায় অঘোরবাবু ডেকে ছিলেন একটা জরুরী চিঠি টাইপ করার জন্য—শ্যামলদের নাকি কি কাজে পাঠিয়েছেন। বিভাদি আমায় ডেকে একটা দুটো কথা বলেই হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, সুনীলবাবুকে একবার ডেকে আনবে ভাই ? বোলো যে আমার বড় বিপদ।

আল্পনা বলে, ইস্ ! নিজের বাপমাকে না বলে তোমায় ডেকেছে, নিশ্চয় ভীষণ কিছু হয়েছে। তুমি এক্ষুনি একবার যাও দাদা।

সুনীল তার দিকে শুধু একবার তাকায়। আল্পনার সমস্ত উত্তেজনা নেতিয়ে যায়।

: বলো গে আমি এখন যেতে পারব না। কালপরশু সময় পেলে যাব।

নবীন আর আল্পনা দুজনেই যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়। একটা খোঁড়া দুঃখিনী মেয়ে, আপিসের খোদ কর্তার মেয়ে, সে বিষম বিপদের কথা জানিয়ে একবার যেতে বলেছে—ছুটে যাবার বদলে সুনীল কিনা বলছে কাল পরশু সময় পেলে যাবে !

দয়ামায়া না থাক, তার কি কৃতজ্ঞতা বলেও কিছু নেই ? চাকরী তো তার করে দিয়েছে একরকম বিভাই।

ইচ্ছা করলে বিভা কি তার চাকরীর দফা শেষ করতে পারে না ?

সুনীল হাই তুলে নবীনকে বলে, তুমি দেখছি বড়ই আশ্চর্য্য হয়ে গেলে? তুমিও তো বিভার বিপদটাকে সিরিয়াস ভাবতে পারনি!

নবীন বলে, কি রকম? বিপদটা কি জানি না, কিন্তু ছুটে এসেছি তো আপনাকে ডাকতে?

: ছুটে এসে এখানে গল্পে মেতে গেছ। দু'পা গিয়ে মায়াদের বাড়ীতে আমায় খবর দেওয়া দরকার মনে করনি।

নবীন অপ্রতিভ হয়, তর্কে কখনো হার মানে না। বলে, আল্পনা বললে, বসুন না, দাদা এক্ষুনি আসবে। আমিও ভাবলাম আপনি ক্লাশ নিচ্ছেন—

: সেইজন্য তো বলছি তুমিও বিভার বিপদটা সিরিয়াস ভাবতে পারনি।

: বিপদটা কি তা তো আমায় বলেনি।

: আমি তো তাই বলছি। সত্যি সত্যি গুরুতর ব্যাপার কিছু হলে তোমার হাতে দু'লাইন চিঠি লিখে দিতে পারত না? তোমায় না জানাতে চায়, খামে ভরে দিলেই হত!

কল্পনার আজ বড় খিদে পেয়ে গিয়েছিল। আশ্চয্য অসহ্য খিদে।

বিয়ের পর বাপের বাড়ী এলেই তার এরকম খিদে পায়!

সকলের আগে খেতে বসে এদের কথার আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে—শুকনো রুটিগুলি তাড়াতাড়ি চিবিয়ে খাওয়া যে কি কষ্ট, ভাত হলে কোঁত কোঁত করে গেরাসে গেরাসে পেটে চলে যায়—এঁটো হাতেই সে এসে দাঁড়িয়েছিল।

এঁটো হাতটা উঁচু করে রেখে সে বলে, মুখ খুললেই তো ধমক খাব।

সুনীল বলে, কেন মিছে কথা বলছিস? ন্যাকামি না করলে আমি কাউকে ধমকাই না।

: তাহলে মনের কথাটা খুলেই বলি! তুমি কিছু বোঝ না মেয়েদের ব্যাপার, কাণাকড়িও নয়। মেয়েদের কত রকমের বিপদ হতে পারে তোমার কোন ধারণাই নেই। এমন বিপদও হয় যা বাপমাকে জানানো যায় না, কাউকে লিখেও জানানো

যায় না। বিভাদি নিশ্চয় ভীষণ বিপদে পড়েছে। নইলে এমনভাবে অসময়ে তোমায় ডাকতে পারত না। তোমায় ভালবাসে বলেই—

: এই তো ন্যাকামি স্বরু করলি।

: বেশ। তোমায় ভক্তি করে বিশ্বাস করে বলেই তোমায় ডেকেছে। তোমাকে ছাড়া কাউকে বলতে পারবে না বিপদের কথা।

স্বনীল নির্ব্বিকার ভাবে বলে, কোন মেয়ের ওরকম বিপদের কথা আমি শুনতে চাই না। কেন জানিস? শুনেও তার বিপদ নিবারণ করার জন্য আধ মিনিট সময়ও আমি নষ্ট করতে পারব না।

এক মুহূর্ত থেমে বলে, আমার অনেক কাজ।

নবীন একটু কাঁচুমাচু করে বলে, কিন্তু—মানে স্বনীলদা, বিভাদি কিন্তু ভীষণ ঝোঁকের মাথায় চলে। রেগে গেলে যা খুসী করতে পারে। কোনদিন তো ডাকে না, আজ এমনিভাবে ডাকলো, না গেলে ভীষণ রেগে যাবে। বিভাদি পণ ধরলে অঘোরবাবু হয়তো ইয়ে না করে পারবেন না, মানে—

স্বনীল শান্তভাবে হেসে বলে, বাঁপকে বলে বিভা আমায় চাকরী দিয়েছে, বাপকে বলে সে আমার চাকরীটা খসিয়ে দেবে। তুমি আসল কথাটাই ভুল করছ নবীন। অঘোরবাবু বিভার খাতিরে আমাকে চাকরী দেননি—বিভাকে অবশ্য বুঝিয়েছেন তাই, স্বাভাবিক মেয়ের চেয়ে খোঁড়া মেয়ে হাজারগুণ বেশী আদর চায়। চাকরী আমি নিজের গুণেই পেয়েছি। বিভা যদি আবদার ধরে যে আমাকে ছাঁটাই করতেই হবে—অঘোরবাবু বলবেন, বেশ বেশ তাই হবে। কাজে কিছুই করবেন না।

: আপনি বুঝি অঘোরবাবুর পেয়ারের লোক?

কল্পনা আল্পনা দুজনেই কমবেশী শিউরে ওঠে। নবীনের কি মাথা খারাপ?

স্বনীল কিন্তু রাগ করে না।

বলে, না, পেয়ারের লোক নই। দরকারী লোক। পেয়ার চাই না, কখনো

চাইব না বলেই আমার চাকরী। এমন অনেককাজ আছে পেয়ারের লোককে দিয়ে যা করানো যায় না। অথচ যে কাজ না করালেই নয়।

নবীন কয়েক মূহুর্ত কল্পনার পায়ের ফুলতোলা কার্পেটের চটিটার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ মুখ তুলে বলে, আপনাকে তা হলে অঘোরবাবু খাতির করেন।

সুনীল মৃদু হেসে বলে, মোটেই না। আমাকে খুব দরকারী কাজে খাটান— আমাকে দিয়ে ছাড়া সে কাজ অন্যকে দিয়ে করাতে পারবেন না। আমি তাই কাজটাকে খাতির করি, অঘোরবাবুকে খাতির করি না। উনিও কাজ করার জন্যই আমাকে খাতির করেন।

সুনীল ভিতরে গেলে কল্পনা নবীনকে বলে, নিজের দাদা তবু বলছি, এরকম পাথর দিয়ে গড়া মানুষ আর দেখেছেন ?

আল্পনা বলে, পাথর বলছ কি ? পাথর শক্ত হয়, নিষ্ঠুর হয় না।

নবীন যেন আনমনেই ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।

: মাথা নাড়ছেন যে ?

: নিষ্ঠুর ? না, সুনীলদা নিষ্ঠুর নয়। নিষ্ঠুর হলে নিষ্ঠুরতায় লোকে আনন্দ পায়। সুনীলদা কিছুই বোধ করে না। নিষ্ঠুর নয় তবে মায়ামমতা বলে কিছু নেই।

: হৃদয়হীন ?

: হৃদয় আছে। হৃদয়টা ভোঁতা। না, এবার পালাই। বিভাদিকে আবার খবর দিতে হবে। কি বলব তাই ভাবছি।

রাত প্রায় দশটার সময় সুনীল খেতে বসেছে, অঘোরের দামী গাড়ী বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায়।

ডেকে পাঠালেও সুনীল যায়নি। বিভা নিজেই তার কাছে এসেছে। তার দুটি পায়ের পাতাই মোচড়ানো ফরমাস দিয়ে বিশেষভাবে তৈরী জুতো পরে লাঠি ধরে সে হাঁটে।

বছর চব্বিশেক বয়স হয়েছে কিন্তু একটা করুণ লাবণ্যে মুখখানা কচি দেখায় বলে বয়স আরও কম মনে হয়। মুখের রোমের জন্য যদিও লাবণ্য চোখে পড়ে না।

বাইরের ঘরে চৌকিতে বসে বলে, সুনীলবাবু খাচ্ছেন? আচ্ছা আমি বসছি।

সুনীল সবে খেতে আরম্ভ করেছিল। বিভা এসেছে শুনে সে উঠে মুখ হাত ধুয়ে বাইরের ঘরে আসে।

: খাওয়া ফেলে উঠে এলেন?

: খাওয়া পালাবে না।

: আমিও কি পালাতাম নাকি? একটু নয় বসতাম!

চৌকীতে বিভার কাছে বসে সুনীল সকলকে ভিতরে যেতে বলে।

: তোমার নাকি গুরুতর বিপদ?

: শুনেও তো গেলেন না?

: আমি ভাবলাম এমনি খেয়ালের বশে ডেকেছ। তেমন কিছু হলে মুখে বলে না পাঠিয়ে চিঠি লিখে দিতে।

: বিপদে পড়েছি শুনেও যাবেন না, এটা ভাবতে পারিনি।

প্রচণ্ড রাগ আর অভিমান হয়েছে টের পাওয়া যায় কিন্তু প্রকাশটা হয় খুব মৃদু। সেও তো জানে সুনীলকে ভালভাবেই। একটানা চার বছর সে তাকে ইংরাজী পড়িয়েছে। নিছক হৃদয়াবেগের কি আর কোন মূল্য আছে সুনীলের কাছে।

সুনীল মৃদুস্বরে বলে, তোমার কি বিপদ হতে পারে আর আমি তোমার কি কাজে লাগতে পারি ভেবে পাচ্ছি না। এক রমেশবাবুর ব্যাপারটা হতে পারে—

বিভা চোখ বড় করে বলে, নিজেই বুঝতে পেরেছেন তাহলে? আপনি এত বোঝেন অথচ—

: কিন্তু এ ব্যাপারে আমায় টানবে কেন সেটাই যে বুঝতে পারছি না।

বিভা ব্যাকুলভাবে বলে, কি যে ঢুকেছে বাবার মাথায়, আমার বিয়ে দেবার জন্যে পাগাল হয়ে উঠেছে। তাও আবার আপিসের কারো সঙ্গে দেওয়া চাই!

তার অবস্থা মানে আছে। আপিসের লোক বশে থাকবে, তোমাকে অবহেলা করতে সাহস পাবে না।

আপিসের লোক হোক বাইরের লোক হেকে টাকার লোভে তো বিয়ে করবে।

টাকার লোভে খাতিরও করবে বিয়ের পর।

কিন্তু ও খাতির দিয়ে আমি করব কি ? ভাবলেও আমার গা ঘিন ঘিন করে। কচি খুকী তো নই, ঢের বয়স হয়েছে। ক'বছর আগে হলে বরং কথা ছিল, তখন আমিই কত স্বপ্ন দেখতাম—বাবা রাজপুত্র বর কিনে এনে দেবে, আমায় কত ভাল বলবে, খোঁড়া বলে আরও মায়া হবে বেশী। বুড়ো বয়সে এখন বুঝি তো সব! এতটুকু ভক্তি করতে পারব ওরকম পয়সার কাঙালী ওঁচা একটা মানুষকে ? বাবাকে বোঝালেও বোঝে না। বাবার সেই এক কথা, পয়সার কাঙালী সবাই। জামাই যে হবে সে আমায় মাথায় করে রাখবে, আবার কি চাই ?

বিভা করুণ চোখে চেয়ে থাকে। চোখ নামিয়ে একবার নিজের কুৎসিৎ পা দুটির দিকে তাকিয়ে নেয়।

সুনীল নীরবে তার বাকী কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করে।

বিভা একবার কেসে বলে, ভূপেনবাবুর তবু একটু মনুষ্যত্ব ছিল। বাবাকে কিছু বলার আগে আমায় একবার জিজ্ঞেস করেছিল। আমিও সোজা জানিয়ে দিয়েছিলাম, বাবার টাকার লোভে আমায় বিয়ে করলে রোজ দু'বেলা খোঁড়া পায়ের লাথি ঝাড়ব, স্বামী বলে কেয়ার করব না। তারপর থেকে ভূপেনবাবু আর যায়নি। কিন্তু রমেশবাবু দু'দিন গিয়েই বাবাকে মত জানিয়ে বসেছে। আমি এখন কি করি ? বাবা বিয়ে দেবেই আমার।

বিভা প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে যায়।

কেন দেবে জানেন ? মানুষকে বলতেও আমার মাথা কাটা যায়। বাবা আমাকে অবিশ্বাস করছে। কবে কি কাণ্ড করে বসি বলা তো যায় না, তাই একটা স্বামী জুটিয়ে দিচ্ছে। তারপর যা খুসী করি আসবে যাবে না।

—বিয়ে কবে ? কাল পরশু ?

তার প্রশ্ন শুনে বিভার কাঁদ কাঁদ ভাব কেটে যায়।

দিন ঠিক হয়নি, কিন্তু বাবা যত তাড়াতাড়ি পারে চুকিয়ে দেবে।

স্থনীল শান্তভাবেই বলে, তাহলে এমন অস্থির হয়ে পড়লে কেন? ভয়ানক বিপদ বলে নবীনকে পাঠিয়ে দিলে, এতরাত্রে নিজে ছুটে এলে। আমি কাল পরশু যাব বলেছিলাম, তখনও তো এসব বলতে পারতে।

বিভা ব্যাকুলভাবে বলে, আপনি বুঝবেন না। আমার কি রকম অস্থির অস্থির করছে, দম আটকে আসছে। কি মনে হচ্ছিল জানেন? আজ রাত্রেই বোধ হয় পাগল হয়ে যাব, একটা ভয়ানক কিছু করে বসব। আপনি আজকেই কিছু না করুন, আমায় একটু আশা দিন যে বাবাকে বুঝিয়ে বলবেন।

এত খারাপ লাগছে তোমার?

বলে বোঝাতে পারব না। কত খারাপ লাগছে।

স্থনীল একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, এই তো দোষ তোমাদের, একটা ঝন্‌ঝাট হলেই মাথা খারাপ করে বসবে। অঘোরবাবুকে বুঝিয়ে বলতে বলছ। আমি বললে তিনি বুঝবেন কেন একবার ভেবে দেখলে না? তাঁর ঘরোয়া ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে তিনি শুধু চটে যাবেন, আর কোন লাভ হবে না।

বিভা হতাশভাবে বলে, বাবা কিন্তু আপনার কথার দাম দেন।

সে আপিসের কাজের কথায়। আমি অবশ্য যদি রমেশ বাবুর নামে বানিয়ে বলি যে রমেশবাবু বদ লোক, স্বভাব চরিত্র ভাল নয়, তা হলে বিশ্বাস করবেন।

তাই বলুন বাবাকে, আমায় বাঁচান। এতো আর মিথ্যে নয়, বদ লোক না হলে টাকার জন্য নিজেকে বিক্রী করতে চায়?

ওরকম বদলোক বললে তোমার বাবার কিছু আসবে যাবে না। তোমাকেই তো বলেছেন, সবাই টাকার কাঙাল। অঘোরবাবুর কাছে টাকার জন্য নিজেকে বিক্রী করতে চাওয়াটা দোষ নয়। একজনের নামে বানিয়ে কিছু বলতে পারব না আমি। কাজেই বুঝতে পারছ আমার গিয়ে বলায় বিশেষ কোন লাভ হবে না।

আমি স্যুইসাইড করব।

তোমার লজ্জা করল না একথা বলতে? স্যুইসাইড করতে পারবে আর বিয়েটা ঠেকানোর জন্য একটু শক্ত হতে পারবে না! উপায় তোমার নিজের হাতেই আছে।

কি উপায়?

অঘোরবাবুকে পরিষ্কার জানিয়ে দাও এভাবে বিয়ে দেবার চেষ্টা করলে তুমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। কাঁদাকাটা করলে কিম্বা বিয়ে করতে তোমার অসুবিধা কি, বুঝিয়ে বলতে গেলে অঘোরবাবু বুঝবেন না। ভাববেন তুমি ঢং করছ, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিভা কাতরভাবে বলে, শুধু বললে বাবা বিশ্বাস করবে না। ভাববে ঢং করছি। আমাকে সত্যি সত্যি বাড়ী ছেড়ে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে বাজে কথা বলছি না।

সুনীল সহজভাবে বলে, প্রমাণ করবে। স্যুইসাইড করার চেয়ে কয়েকদিনের জন্য বাড়ী ছেড়ে যাওয়া অনেক সোজা।

কিন্তু কোথায় যাব?

আত্মীয়ের বাড়ী, বন্ধুর বাড়ী, হোটেল—যাওয়ার জায়গার অভাব আছে নাকি?

বিভা স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, আপনার এখানে এসে যদি উঠি ক'দিনের জন্য?

সুনীল হেসে বলে, সাধে কি বলি তোমাদের কেবল বয়সটাই বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে না। যাওয়ার এত জায়গা থাকতে বাড়ী ছেড়ে আমার এখানে আসবার কথা ভাবছ! ফলটা কি হবে? চাকরীটা যাবে আমার।

বিভা সঙ্গে সঙ্গে বলে, তা বটে, ঠিক বলেছেন। বাবা ভাববে আপনিই বুঝি আমাকে বিগড়ে দিয়েছেন। কথাটা সত্যি হলেও বাবাকে টের পেতে দেওয়া উচিত হবে না।

কি রকম ?

আপনার সংস্পর্শে এসেই তো আমার মনটন ভোঁতা হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গে এ্যাদ্দিন মেলামেশা না করলে আজকে হয় তো আমি খুসীই হতাম—ভাবতাম হোক, রমেশবাবুই ভাল।

সুনীল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

তুমি আমায় ভড়কে দিয়েছিলে।

কেন ?

আমি ভাবলাম তুমি বুঝি নালিশ করছ আমার নামে। আমি তোমার মনটন হরণ করেছি তাই তোমার অন্য কাউকে বিয়ে করতে আপত্তি।

বিভা প্রথমটা আশ্চর্য হয়ে যায়, তারপর ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, সত্যিই কি আপনার দয়ামায়া নেই ? একটা খোঁড়া মেয়েকে একথাটা না বললে চলত না আপনার ? আমি অন্যভাবে বলেছি কিন্তু ওরকমটাও তো সত্যি হতে পারে !

সুনীল বলে, না। সত্যি হতে পারে না। সত্যি হলে সত্যিই আমি খোঁড়া মেয়েকে কথাটা বলতাম না।

সত্যি হতে পারে না কেন ?

কি করে হবে ? আমি তোমার হৃদয়মন দখল করলাম আর আমিই কিছু টের পেলাম না ! .

বিভা তার বেশী বয়সের কচি মুখখানা যতদূর সম্ভব গভীর করে বলে, এমন তো হতে পারে আপনি দখল করেন নি, আমি নিজেই সঁপে দিয়েছি ?

সুনীল হেসে বলে, ওটা কথার মারপ্যাচ। তুমি যে আমার অজান্তে আমাকে হৃদয়মন সঁপে দেবে—কোথায় দেবে ? আমার জামার পকেটে ? আমি হৃদয়মন দিয়ে না নিলে তোমার হৃদয়মন সঁপে দেবার সাধ্যই হবে না।—

কেন একপক্ষে ভালবাসা হয় না ? কত গল্প উপন্যাসে পড়েছি। আমার কথাই ধরুন ! আমি তুচ্ছ একটা খোঁড়া মেয়ে, আমি জানি আপনার ভালবাসা

আমি পাব না। আমি তাই আমার ভালবাসা গোপন করে রাখি, আপনাকে জানতে দিই না।

তুমি যেসব গল্প উপন্যাস পড় তাতে এটা সম্ভব, জগতে কোথাও খুঁজে পাবে না। মানুষের ভালবাসা দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার ; একপেশে হয়ে সেটা গজাতেই পারে না। প্রথম দর্শনই আমায় তোমার ভারি পছন্দ হয়ে গেল, এমন কি সাতরাত ঘুমোতে পারলে না, আমাকে ভেবে ছটফট করে কাটালে। এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয়। কিন্তু তারপর তোমার ওই প্রথম দর্শনের ভালবাসা জীইয়ে রাখা গড়ে তোলা আমাকে বাদ দিয়ে তোমার একার পক্ষে অসম্ভব। তোমার মন আমি টের পাব আমার মন তুমি টের পাবে—আমার প্রশ্রয়ে তোমার ভালবাসা তোমার প্রশ্রয়ে আমার ভালবাসা দিন দিন বাড়বে। এভাবে ছাড়া মেয়েপুরুষের ভালবাসা হয় না।

ভিতরে দরজার পিছনে সন্তর্পণে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি কল্পনা আল্পনা দুজনের কথা শুনছিল। থুকু আর পুলিনও এসে দাঁড়িয়েছে। যন্ত্রণার একশেষ। তোরা কি বুঝবি এসব কথা ?

অথচ ধমক দিয়ে ওদের তাড়ানোও যায় না, স্থনীল টের পেয়ে যাবে তারা দু'বোন চোরের মত তাদের দু'জনের কথা শুনছে।

বিভা বলে, পাত ছেড়ে উঠে এসেছেন, আপনাকে আর বকাব না। কিন্তু এত কথাই যখন বললেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করে যাই। সত্যি জবাব দেবেন কিন্তু। আপনি কাউকে ভালবেসেছেন ?

স্থনীল মাথা নাড়ে !

তবে যে এত বড় বড় কথা বলে গেলেন ভালবাসা নিয়ে ?

স্থনীল হেসে বলে, ভাল না বেসে বুঝি ভালবাসার নিয়ম কানুন জানা যায় না ?

থিয়োরি আছে ?

বিভা ভেবেছিল এ প্রশ্নে জব্দ হয়ে যাবে সুনীল। সুনীল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, আছে।

কি থিয়োরী?

ভালবাসাটা ঠিক কি জিনিষ অথবা অ-জিনিষ, তার স্বরূপটা কি, সে বিষয়ে কোন থিয়োরি নেই। আজ কেউ বলতে পারে না। বৈজ্ঞানিকরা তো পারেনই না, কবি লেখকরা তবু খানিকটা আভাষ দিতে পারেন। কিন্তু ভালোবাসা যাই হোক যেমন হোক, ভালবাসার ব্যাপারেও সংসারের কতগুলি সাধারণ মূল নিয়ম খাটে। ভালবাসা হবে দুটো জীবন্ত মানুষের মধ্যে—তারা মেয়ে পুরুষ নাও হতে পারে! কিন্তু মানুষ দুটো হওয়া চাই।

বিভা যেন কাঠ হয়ে যায়। খোঁড়া পায়ের পাতা দুটো আরও ঠেলে দেয় চৌকিটার ভিতরের দিকে।

সুনীল বলে, ভালবাসা যখন দু'জনের ব্যাপার, একজন একা নিজের মনে ভালবাসা তৈরী করবে, এটা সম্ভব নয়। দু'জনে মিলে ভালবাসবে। তুমি গল্প উপন্যাসে একজনের যে গোপন নীরব ভালবাসার কথা পড়, তার মানেটা কি জানো? মানেটা হল দেবতা-ভক্তি, দেবতা-উন্মাদনা। দেবতা সাড়াও দেয় না কিছু গ্রহণও করে না। ভক্ত নিজের ভাবে হাসে কাঁদে পাগল হয়—পাগল হবার আর কোন রাস্তা নেই, উপায় কি! ওই অশরীরি দেবতাকে নিয়ে পাগল হওয়ার আরেক নাম একটা জ্যান্ত মানুষকে কিছু জানতে না দিয়ে নিজের মনে গোপনে ভালবাসা। দেবতাদের ভুলে যাও। দেখবে 'এ ভালবাসা ন্যাকামির মত লাগছে।

বিভা চুপ করে থাকে।

কল্পনা অধীর হয়ে ভাবে, বিভাদি কি বোকা! এমন সুযোগ পেয়েছে কিন্তু সুনীলকে বুঝিয়ে দেয় না যে তোমার নিয়ম খাটে না আমাদের বেলা। কোন মানেই নেই তোমার নিয়মকানুনের। আমরা অত সব ভেবে কাজ করি না, করতে পারবও না!

অথচ পাঁচমিনিট পরে কল্পনাই নিয়ম খাটায় নিজের তের মাসের ছোট বোন আল্পনার উপর।

লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গিয়ে বিভা গাড়ীতে ওঠে। সুনীল রান্না ঘরে গিয়ে তার ফেলে যাওয়া আটার পাতে বসে।

রাত বেজেছে এগারোটা।

আল্পনা চট করে পরণের শাড়ীটাই একটু ঘুরিয়ে পরে মুখে একটু পাউড়ার দিয়ে একগ্লাস জল খেয়ে স্যাণ্ডেলটা পায়ে ঢুকিয়ে বাইরে যাচ্ছিল, কল্পনা তার হাত চেপে ধরে হুকুমের সুরে বলে, না।

কেন মিছে গোলমাল করবি দিদি? আমি যাবই। কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না।

কল্পনা প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করে তার হাত চেপে ধরে রেখে বলে, তোকে ঠেকাচ্ছি না তো? তোর ইচ্ছে হলে তুই যাবি বৈকি। যেখানে খুসী যাবি এতরাত্রে হঠাৎ এভাবে গেলে নবীন চটে যাবে, ওর বাপ মা সুবিধে পেয়ে যাতা বলে নবীনের মন ভেঙ্গে দেবে। কাল সকালে ঠাণ্ডা মাথায় যাস। রাত কাটতে মোটে কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার।

আল্পনা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে বলে, হাতে লাগছে দিদি। তোর হাতে তো ভীষণ জোর!

কল্পনা তার হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, বাঃ, মায়ের পেটের বোনটি যাবে মরতে, হাতে জোর হবে না? হাতটা আমার কেলিয়ে গেছে আল্পনা। টন টন করছে।

ছাই করছে। দাদার মত চলতে ফিরতে কথা কইতে শিখেছ তুমি।

কল্পনা মিষ্টি স্বরে বলে, কত খেটে দাদা আমাদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে বলত? নতুন টীউসনী নিয়েছে আমাদের খরচ চালাতে না পেরে। দাদা অবশ্য একটু পাগলাটে কিন্তু সারাদিন খেটে যা পায় সব আমাদের পেছনে ঢালে তো? দাদা বিয়ে করলে কি হত ভাব দিকি!

দাদা আবার বিয়ে করবে।

কল্পনা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ায়। উনানের ছাই দিয়ে ঘষা চকচকে দাঁত। তাদের বিয়ের জন্য দাদা তোড়জোড় করেছে অথচ নিজে সে কেন বিয়ে করতে চায় না তার কোন মানেই বোঝে না কল্পনা।

বিয়ে হয় একটা ছেলে আর একটা মেয়ের।

সুনীল মহাপুরুষ নয়, একটা রোজগেরে ছেলে। নিজে সে বিয়ে করবে না, বোনটাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেবে।

পাশাপাশি ডাল আর ছেঁচকি দিয়ে রুটি খেতে খেতে কল্পনা বলে, পেট ভরে খা। মাথা ঠাণ্ডা থাকবে।

দুটি ভাত দাও।

মা ঝংকার দিয়ে বলে, ভাত? জন্মিয়ে আনগে যা চাল, ভাত রেঁধে খাওয়াবো।

৪

সেদিন পড়াতে যাওয়া মাত্র নন্দা বলে, রবীন্দ্র কাব্য নিয়ে আপনার প্রবন্ধটা পড়লাম। সুন্দর লিখেছেন—সবাই খুব প্রশংসা করছে।

আবার নিন্দেও করছে।

সেটা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কতগুলি আপত্তিকর কথা বলেছেন বলে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপত্তিকর কথা? রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমি একটি কথাও বলি নি, তাঁর কাব্যের সমালোচনা করেছি।

শচীন, তার কাগজের সম্পাদক নিখিল আর নন্দার ভাই প্রদ্যোত বসে গল্প করছিল। প্রদ্যোত নন্দার চেয়ে দু'এক বছরের বড়।

সে বলে, রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর কাব্য লোকের কাছে একাকার হয়ে গেছে।

সুনীল বলে তা হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলেছি বললে মানে দাঁড়ায় কবিকে অপমান করেছি। সমালোচনার মতামত নিয়ে লোকের আপত্তি থাকতে পারে, সে আলাদা কথা। রবীন্দ্রকাব্যের নিন্দাও আমি করিনি। বস্তুবাদের সঙ্গে সংঘাতটা রবীন্দ্রকাব্যে কি রূপ নিয়েছে সেটা দেখাবার চেষ্টা করেছি।

প্রদ্যোত বলে, ওটাই অনেকে নিন্দা বলে ধরে নিয়েছে। বস্তুবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের সংঘাত ছিল বলাতেই তাদের আপত্তি। কবিকে নাকি ছোট করা হয়। তিনি বাদ সংঘাত এসবের ঊর্দ্ধে ছিলেন।

সুনীল একটু হাসে, আর কিছুই বলে না।

শচীনের বয়স ষাটের কাছে গিয়েছে। কিন্তু অতটা বয়স অনুমান করা যায় না। সাধারণ হিসাবে এই বয়সের মত চুলও পাকে নি শরীরও ভাঙ্গে নি।

সে বলে, আমাদের কাগজে একটা লেখা দাও না?

সুনীল বলে, আমার লেখা কি চলবে আপনাদের কাগজে? আমি গা বাঁচিয়ে লিখতে পারব না।

শচীনের চেয়ে বয়সে ছোট হলেও নিখিলকে বুড়ো দেখায়। তার চুল প্রায় সব পেকে গেছে, কতগুলি দাঁত পড়ে গেছে, মুখে শরীরের কোন স্থায়ী অসুখের ছাপ।

কথাগুলি তার কিন্তু স্পষ্ট। বোধহয় বহুকাল সম্পাদকের কাজ করার ফলে।

সে বলে, তুমি আমাদের কাগজ পড় না বোঝা যাচ্ছে।

সুনীল সরলভাবে কথাটা স্বীকার করে বলে, কাগজটা পাই না। বাড়ীতে একটা বাংলা কাগজ রাখি, দু'তিনটে কাগজ কেনার ক্ষমতা নেই।

নিখিল বলে, কাগজে যখন লেখা দিচ্ছ এবার থেকে কম্প্লিমেণ্টারি কপি পাবে। কাগজ পড়লে বুঝতে পারবে, আমরাও গা বাঁচিয়ে কথা বলি না। কোনও বাদ বুঝি না, সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় উচিত অনুচিত বুঝি। সত্য কথা খাঁটি কথা বলতে ভগবানকেও কেয়ার করি না।

তাহলে বাদও মানেন। বাদ না মেনে সত্যবাদী হবেন কি করে?

নন্দা ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে, নাও, এবার তোমরা ওঘরে যাও। উনি আবার ঠিক ঘড়ি ধরে বিদায় নেবেন।

প্রদ্যোৎ ঘর ছেড়ে যেতে যেতে সুনীলের পক্ষ নিয়ে কৈফিয়ৎ দেয়। বলে, ঘড়ি ধরা দশটা কাজ থাকলে মানুষ করবে কি?

নন্দা বলে, কাজ বোলো না—বেশীর ভাগ পেটের ধান্ধায় অকাজ।

সুনীল বলে, পেটের ধান্ধায় হলে সেটা অকাজ হয় বুঝি?

হয় না? আপনি কোথায় বই ঘাঁটবার সময় পাবেন, প্রবন্ধ লিখবেন, একটা কাজে আপিসে কেরানীগিরি করছেন, আমায় পড়াচ্ছেন··

তাই বলুন। পেটের ধান্ধায় সবাই খাটবে। তবে বেখাপ্পা নিস্ফল খাটুনি হলে সত্যি আপশোষের কথা। যেদেশে মানুষ পেটের ধান্ধায় খাটতে চেয়ে কাজ পায় না সে দেশে এরকম হবেই।

নন্দা আচমকা অন্য কথা বলে, ছাত্রীকে কিছুতেই তুমি বলতে পারলেন না?

সুনীল বলে, আপনিটাই অভ্যাস হয়ে গেছে।

নন্দা দু'তিনবার তাকে তুমি বলার জন্য সুনীলকে অনুরোধ জানিয়েছিল কিন্তু সুনীল তাকে আপনিই বলে এসেছে।

ডাকটা যে গোড়ায় নন্দার কাণে বাজত বা এখন বাজে এমন নয়, তুমি বলার অনুরোধটা সে জানিয়েছিল সচেতনভাবে ওটাই উচিত মনে করে।

এদিক দিয়ে সুনীলের হৃদয়হীনতা সে ক্রমে ক্রমে টের পেয়েছে।

সহজ সরল ব্যবহার, মন দিয়ে শুধু পড়ায় না যে বিষয়েই কথা উঠুক খোলাখুলি আলগা আলোচনা করে, হাসির কথায় হাসে, সে নিজের কথা বললে মনোযোগ দিয়ে—মনে হয় যেন সহানুভূতির সঙ্গেই—শোনে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে হৃদয়গত ঘনিষ্টতা দূরে থাক মোটামুটি একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্পর্কে তার নিদারুণ অবহেলা, উদাসীনতা!

নন্দার প্রকৃতি হাল্কা নয়, তার ছেলেমি ন্যাকামি আসে না। কিন্তু জানাচেনা হলেই মানুষের সঙ্গে কম বেশী হৃদয়গত সম্পর্ক গড়ে উঠবে, এতেই সে অভ্যস্ত।

সেটা যে প্রেমাত্মক সম্পর্কই হবে এমন কোন কথা নেই।

বাপ ভাই আত্মীয় অনাত্মীয় শত্রু মিত্রের সঙ্গে হৃদয়গত একটা আকর্ষণ বিকর্ষণের সম্পর্ক থাকে না মানুষের?

স্থনীল যেন ওরকম কোন সম্পর্কই গড়ে উঠতে দিতে নারাজ।

নন্দা ফ্রয়েডের নামটাই শুনেছে। আর শুনেছে যে ওই ভদ্রলোকের থিয়োরী অনুসারে মানুষের হৃদয় মন নাকি কামময়—স্নেহ মায়া প্রেম ভালবাসা থেকে বিরাগ বিতৃষ্ণা নিষ্ঠুরতা হিষ্টিরিয়া সব কিছুর পিছনে ওই কামের শক্তি।

কে জানে এসব থিয়োরির কি মানে। একটু মাথা ঘামাবার তাগিদও সে বোধ করে না। যদিও তার বন্ধু লীলা কয়েকবছর ধরে ফ্রয়েডকে নিয়ে মেতে আছে এবং তার ধারণা জন্মে গেছে যে মানুষের সব কাজ আর আকাজের মানে সে বুঝে গিয়েছে। বিদ্যাটা প্রয়োগ করে তার চলাফেরা ওঠা বসার ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা তাকে বুঝিয়ে না দিতে পারলে যেন লীলার শান্তি নেই।

লীলা এক ধরণের বিকারগ্রস্ত মানুষের কথা বলে, মেয়ে হলে পুরুষ আর পুরুষ হলে মেয়েদের সম্পর্কে হৃদয়টা ভোঁতা করে রাখাই নাকি তাদের বিকারের প্রধান কথা।

স্থনীল কি ওইরকম বিকৃত মানুষ?

কিন্তু একটা বিকারগ্রস্ত মানুষ এরকম ধীর স্থির সংযমী বিবেচক হয় কি করে, এত কাজ আর দায়িত্ব পালন করে কি করে? জীবনের নীতিতে এমন কঠোর নিষ্ঠা, অন্য মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা সম্পর্কে এমন উদারতা, এত দায় ও হাঙ্গামা সত্ত্বেও দুঃখ দুঃশ্চিন্তা বিষণ্ণতার ধার না ধারা কি করে সম্ভব হয়?

অথচ চাকরীও করে কালোবাজারী অঘোরের আপিসে।

তিনমাস শুধু ঘড়ি ধরে একঘণ্টা পড়াতে এসে স্থনীল দলিত মথিত করে দিয়েছে নন্দার হৃদয় মন।

প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল এটা বুঝি স্থনীলের বাঁকা কায়দা, এইভাবে তাকে বুঝি অগ্রাহ্য করে অবহেলা দেখিয়ে—ইংরাজী বিদ্যা আয়ত্ত করতে ছাত্রী হিসাবে তার কাছে পড়লেও তার যে একটা হৃদয় আছে সে বিষয়ে উদাসীন থেকে অবজ্ঞা জানিয়ে—তাকে কায়দা করতে চায় স্থনীল।

অনেকে অনেক রকম ভাবেই তো কায়দা করতে চায় তাকে।

সেও কয়েকদিন খুব গম্ভীর হয়ে ছিল, অবজ্ঞা এবং উদাসীনতা দেখিয়ে ছিল।

স্থনীল এতটুকু ভাবান্তর দেখায় নি, শুধু প্রশ্ন করেছিল, পড়তে মন বসছে না? শরীর খারাপ? এসময় একদিন ছ'দিন পড়াশুনা কাজ কর্ম বন্ধ রাখাই ভালো।

নন্দার সাধ হয়েছিল একটা চাপড় কষিয়ে দেয় স্থনীলের গালে!

পুরুষের হৃদয়ে সাড়া জাগাবার জন্য মেয়েদের জানা বোঝা পুরানো নতুন কোন আঘাত তার মর্মের বাইরের দুয়ারেও পৌছায় না।

মেয়েরা যেন মানুষ হিসাবেই তারি কাছে গ্রাহ্য। মেয়ে হিসাবে সে গ্রাহ্যই করে না তাদের।

তার পরেই মনে হত, ঠিক তাতো নয় ব্যাপার।

মেয়ে বলে তাকে গ্রাহ্য করে বলেই তো তার কোনরকম মেয়েলিপণাকে প্রশ্রয় দেয় না স্থনীল।

জব্দ হয়ে যাওয়ার মত একটা বিশ্রী মনোভাব নিয়ে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল, দিনরাত খেটেখুটে পড়ছি, আপনিও এত কষ্ট করে পড়াচ্ছেন, ইংরাজীতে পাণ্ডিত্য দেখিয়ে আমার লাভ কি হবে?

স্থনীল বলেছিল, এই তো সেদিন আপনি ইংরাজীতে পাণ্ডিত্য চেয়ে আমায় মাষ্টার রাখলেন। তিন মাস আগে। আপনার বাবার কাগজে চাকরী করবেন বললেন। তিন মাসে উদ্দেশ্য হারিয়ে গেল আপনার? একেবারে ভুলে গেলেন কিজন্য আমার কাছে ইংরাজী জার্নালিজম শিখছেন?

চমকিত হয়ে গিয়েছিল নন্দা।

: জার্নালিজম শিখছি ?

: তা ছাড়া কি ? আপনার বাবার কাগজ হোক বা অন্যের কাগজ হোক, আপনি কাগজে কাজ করার জন্য ইংরেজী শিখছেন। আমিও আপনাকে সেই ভাবেই শেখাচ্ছি।

নন্দা প্রায় ক্ষেপে গিয়ে বলেছিল, আমি দু'জন সাব এডিটারকে যেচে কাজ দিয়েছি জানেন ? তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমার কাছে অনেকে কাজের জন্য আসে, তাদের আমি পাত্তা দিই নাকি ? ওরা অসহায় হয়ে পড়েছে কিন্তু আমার কাছেও আসেনি এইজন্য ডেকে এনে আমি আপনি ওদের কাজ দিয়েছি।

সুনীল ব্যাঙ্গের সুরে—হ্যাঁ ব্যাঙ্গের সুরেই—বলেছিল, আমিও তো মাসে পঁচিশটা টাকার কাজের জন্য যেচে তোমার কাছে এসেছিলাম।

নন্দার খেয়ালও হয়নি যে সুনীল তাকে তুমি বলেছে। অনেকবার অনুরোধ করেও যাকে 'আপনি' থেকে 'তুমিতে' নামাতে পারে নি, সে নিজে থেকেই তাকে 'তুমি' বলেছে।

খেয়াল সে অবশ্য করতেই পারে না। যদি পারত তবে সুনীলকে তুমি বলাবার জন্য দু'তিনবার যেচে যেচে অনুরোধ জানাত না।

সুনীল ভাবে, ভাগ্যে সকালবেলা এক ঘণ্টা একে পড়ানোর কাজ নিয়েছি। রাত্রে দু'এক ঘণ্টা নিশ্চয় ঘুমায়। নইলে আমায় নাজেহাল করে ফেলত।

নন্দা ভাবে, কী দুর্ভাগ্য, এই নারী-বিদ্বেষী লোকটাকেই মাষ্টার রাখলাম। এমন ভাবে ইংরাজী শেখায় যেন মেয়েদের শিক্ষিতা করাটা দয়াদাক্ষিণ্য দিয়ে করার কাজ।

পরদিন থেকে সুনীল আবার তাকে আপনি বলা সুরু করে। স্বেচ্ছায় নয়, আগের দিন যেমন আপনা থেকে তুমি বেরিয়ে এসেছিল আজ তেমনি আপনা থেকেই আপনি বেরিয়ে আসে।

নন্দার জীবন কাহিনী জানবার জন্য সুনীল বিন্দুমাত্র কৌতূহল দেখায় নি।

তবে, নন্দা নিজে থেকে যা জানিয়েছে সে মন দিয়ে শুনেছে।

কোন প্রশ্ন বা মন্তব্য করে নি।

নন্দা ভেবেছিল, বয়স বেশী হলেও বেশভূষা থেকে সুনীল তাকে কুমারী বলেই জানে।

তার বিয়ে হয়েছিল, সে পাঁচ ছ' বছর স্বামীর ঘর করেছে তার স্বামী যুদ্ধে সৈনিক হলেও যুদ্ধের সংবাদ সরবরাহ করার কাজে গিয়ে মারা পড়েছিল। বোমা বা গুলিগোলা খাওয়ার বদলে বুনো একটা মেয়ের সঙ্গে পীরিত করতে গিয়ে, তার জঙ্গুলে অসভ্য স্বামীর সেকেলে ভুজলির ঘায়ে, মারাত্মক রকম আহত হয়ে সে মারা গিয়েছিল।

নন্দার ধারণা ছিল এসব কাহিনী শুনে সুনীল চমকে যাবে।

সুনীল শান্তভাবে শুধু বলেছিল, এরকম কত ব্যাপার যে ঘটেছে! অন্য অনেক রকম হিসাব তো আছেই, যুদ্ধের জন্য কত লাখ মেয়ে যে স্বামী হারিয়েছে।

গা জ্বলে গিয়েছিল নন্দার।

ছেলে হারায় নি ?

হারিয়েছে বৈকি। ছেলে হরোনো মেয়েদের সয়। ছেলে মেয়ে বাইপোডাক্ট তো। স্বামী হারালেই সর্বনাশ।

নন্দা খানিকক্ষণ কথা বলতে পারে নি। তার বিয়ে হয়েছিল, সে স্বামীর সংসার করেছে, এসব শুনে না হয় চমক নাই লাগল সুনীলের, মৃত স্বামীর বুনো মেয়ের সঙ্গে পীরিত করতে গিয়ে প্রাণ হারাণোর কাহিনী যে সে এমন অনায়াসে শুনিয়ে দিল, এতে একটু আশ্চর্য্য হওয়া তো উচিত ছিল তার !

গলার স্বর পাল্টে সে বলেছিল, মানুষটা খারাপ ছিল ভাববেন না কিন্তু।

না। যুদ্ধের ব্যাপারে জড়িয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়ে একজন একদিন একটা অনাচার করেছিল, এ থেকে কি বিচার করা যায় মানুষটা ভাল না খারাপ ছিল ? তা'ছাড়া আপনিও হয় তো জানেন না ঠিক কি ঘটেছিল।

এমনও তো হতে পারে যে আপনার স্বামী বুনো মেয়েটাকে মজাতে যান নি, বাঁচাতে গিয়েছিলেন।

নন্দা স্তম্ভিতা হয়ে গিয়েছিল সত্যই। বড় বড় চোখ করে তাকিয়েছিল।

তার ভাব লক্ষ্য করে নিজের বক্তব্য আরেকটু স্পষ্ট করা উচিত মনে করেছিল সুনীল।

মানুষ হঠাৎ একটা অপকর্ম করে বলতে পারে না তা নয়। কিন্তু এটা স্রেফ একটা আলগা থিয়োরী। কি ঘটনা সঠিক না জেনে, অকাট্য প্রমান না পেয়ে, কোন মানুষ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা চলে না যে সত্যই সে অন্যায় কাজটা করেছে। ওরকম আন্দাজী বিচার মানুষ নিজের সুবিধার জন্য করে। বিনা বিচারে আটক আইনটা যেমন দেশের ভালর নামে শাসকদলের সুবিধার জন্য, আন্দাজে একটা মানুষকে খারাপ ভাবাও তেমনি নিজের সুবিধার জন্য।

নন্দা উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, দেখুন, এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আমিও মনে মনে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি তো ভাল করেই জানতাম মানুষটাকে। পাঁচ বছর একসাথে ঘর করেছি! হঠাৎ ওরকম তার মতি হয় কি করে? আপনি যে আমার কি উপকারটা করলেন আজ!

পরদিন দেখা গিয়েছিল থান পরে নন্দা বিধবার বেশ ধারন করেছে।

কেমন দেখাচ্ছে?

সুনীল প্রশান্ত মুখে তাকিয়েছিল, কিছু বলে নি।

ছেলেমানুষি ভাবছেন তো?

কেন তা ভাবব? আপনার কাছে এটা কত গুরুতর ব্যাপার জানি না আমি?

কয়েকদিন বাদেই আবার সে আগের মত কুমারী বেশ ধারণ করেছে।

পড়ার তাগিদে সকলকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দিলেও নন্দা পড়ায় মন দিতে পারে না।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবার জন্য সে যে খুব খাটছে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। তিনমাস আগেও মুখে তার কমনীয়তা ভেসে থাকত। সেটা প্রায় উপে গেছে। এসেছে একটু শুকনো ভাব—দৃঢ়তা ব্যাঞ্জক রুক্ষতা।

বড় বড় পরীক্ষার আগে ছেলেমেয়েদের কাঁচা মুখে যে ভাবটা আসে।

নিজে থেকে কোনদিন তার কোন ব্যক্তিগত বিষয়ে স্নুনীল কৌতুহল প্রকাশ করে না। বোধ হয় পড়া সংক্রান্ত ব্যাপার বলেই সে আজ জিজ্ঞাসা করে, কি অস্নুবিধা হচ্ছে ?

অস্নুবিধা ? এখন তো অস্নুবিধা নেই। কদিন ভারি অস্বস্তি বোধ করছিলাম, তাই আবার আগের মত বেশ করেছি।

আমি পডার কথা বলছিলাম। মন বসছেনা কেন ?

নন্দা আনমনে একটু ভাবে।

মন বসছে না কেন শুনবেন ? খবরের কাগজটা আসলে আমার—আমি কাগজটার মালিক।

শচীনবাবুর নয় ?

না। আমার স্বামী কাগজটা বার করেছিলেন।

নন্দা যেন খানিকটা আনমনা অবস্থায় ধীরে ধীরে 'দি পিপলস ভয়েস' কাগজটি বার করার কাহিনী বলে যায়। তার কাছে এ ভার মন থেকে না নামালে পড়ায় তার মন বসবে না জেনে, স্নুনীলও নীরবে শুনে যায়।

দেশ ভাগ হয়ে স্বাধীনতা আসবার সময় প্রমোদের খবরের কাগজ বার করার ঝোঁক চাপে। এই তো উপযুক্ত সময়। যে বিরাট পরিবর্তন ঘটতে চলছে চারিদিকে, ভবিষ্যতের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা যেন কোন দলের স্বার্থে ব্যক্তির স্বার্থে ব্যাহত না হয়, ক্ষুণ্ন না হয়।

আজকের দিনেই সবচেয়ে বড় দরকার একটি নির্ভীক নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের, দেশের মানুষের স্বার্থ ছাড়া, যে কাগজ আর কিছুই বড় করে দেখবে না।

যে কাগজ সহজ স্পষ্ট পরিস্কার ভাষায় দেশের লোকের কাছে খুলে ধরবে

সমস্ত দল আর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির স্বরূপ, তাদের প্রত্যেকটি কার্য্যকলাপের আসল উদ্দেশ্য, চিনিয়ে দেবে কে দেশের শত্রু কে মিত্র, তীব্র তীক্ষ্ণ আঘাতে নস্যাৎ করে দেবে মতলববাজ সুবিধাবাদী মানুষদের।

কিন্তু কোন ভাষার কাগজ? বাংলা না ইংরাজী?

দু'রকম হলেই ভাল। কিন্তু সেটা যখন সম্ভব নয়, ইংরাজীতে কাগজ বার করতে হবে প্রথমে। এ কাগজ তো কেবল বাংলা দেশের স্বার্থ দেখবে না—সারা ভারতের জনসাধারনের স্বার্থরক্ষাই হবে এ কাগজের ব্রত।

এই কাগজ বার করা নিয়ে সংঘাত লাগে বড ভাই বিনোদের সঙ্গে। ভাগাভাগি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় দু'জনের—সর্ব্বস্ব পণ করে প্রমোদ এই কাগজ বার করে।

সঙ্গে ছিল আরেকজন বন্ধু। তারা টাকা ঢালে নি, কিন্তু অন্যভাবে সাহায্য করেছিল।

আবার বন্ধুভাবে শত্রুতা করেছিল অনেকে।

নন্দা চুপ করলে সুনীল বলে, কাগজটা বার হবার সময একটা হৈ-চৈ হয়েছিল মনে আছে। তারপর আর বিশেষ কিছু শুনি নি।

নন্দা সায় দিয়ে বলে, লোকে তেমনভাবে নিল না কাগজটা। উনি ভেবেছিলেন প্রত্যেকটা কাগজ একটা দলের হয়ে একপেশে কথা বলে, লোকের মাথা গুলিয়ে দেয়, এরকম একটা অদলীয় স্পষ্টবাদী কাগজ লোকে হৈ চৈ করে নেবে। কিন্তু তা হল না। এখনো ওই টেনে টেনে কোনরকমে চলছে। আমিও ঠিক বুঝিনে ব্যাপারটা।

সুনীল ধীরে ধীরে বলে, অদলীয় মানুষ হয় না, অদলীয় কাগজও হয় না। মানুষ হোক কাগজ হোক, একটা পক্ষ নিতেই হবে।

কেন? আমি তো রাজনীতি নিয়ে মাথাই ঘামাই না, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আছি। অবশ্য আমায় যদি মানুষ বলে গণ্য না করেন······

সুনীল শান্তভাবে হাসে।

নিজেকে আপনি নিরপেক্ষ মনে করেন। কিন্তু মনে করলেই তো সেটা সত্যি

বা সম্ভব হয় না। রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামালেও রাজনীতি বাদ দিয়ে আপনার চলতেই পারে না, আপনার জীবনে রাজনীতি এঁটে থাকবেই। আপনি একটা কাগজের মালিক কিন্তু ধরে নেওয়া যাক্ আপনি কাগজ পর্য্যন্ত পড়েন না। কিন্তু শোনেন তো চালের দর কোথায় উঠেছে? লোকে না খেয়ে মরছে? উদ্বাস্তরা কিরকম কষ্ট পাচ্ছে? কত মানুষ বেকার বসে আছে? সব কিছু কালোবাজারের গ্রাসে গেছে? দেশের লোকের সভায়, শোভাযাত্রায়, লাঠি গুলি চলছে? শুনে নিশ্চয় গা জ্বালা করে আপনার। তার মানেই পক্ষ নিলেন।

গা জ্বালা করলেই পক্ষ নেওয়া হল?

হল বৈকি। আপনার ঠেকছে কোথায় জানেন? দলের পক্ষ নেওয়া মানে আপনি ধরে রেখেছেন আন্দোলন করা, সোজাসুজি আন্দোলনে যোগ দেওয়া। কোন দল সাধারণ লোকের জন্য ন্যায্য দাবী তুললে, ঘরের কোনে বসে মনে মনে সায় দিলেও আপনি পক্ষ নিলেন। মনে মনে সায় দেওয়াটা কাজে প্রকাশ পাবে—যত সামান্য হোক তুচ্ছ হোক কাজটা। ঘরের কোনায় থেকে নিজের ভাই-বোনকে কথায় কথায় মনের কথাটা জানালেন—তার মানে দাঁড়াল কি? ওই দলের হয়ে আপনি প্রচার করলেন।

সুনীল ঘড়ির দিকে তাকায়।

তারপর তাকায় নন্দার মুখের দিকে।

বলে, আজ ইংরাজী পড়া থাক, যা বলছি সেটাই পড়াই। বেশ একটু ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছি মনে হচ্ছে, কথাটা স্পষ্ট করা উচিত। পক্ষ যে মানুষেকে নিতেই হবে তার আসল মানে হল এই যে, সমস্ত মানুষ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে আছে,—শোষক আর শোষিত। এর একটা ভাগে মানুষকে পড়তেই হবে। রাজনৈতিক দলও আসলে আছে দুটোই—শোষকের দল আর শোষিতের দল।

কিন্তু দল তো অনেকগুলি।

দুটো ছাড়া বাকী সব উপদল, সুবিধাবাদী দল। যতই বড় বড় বুলি কপচাক আর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দেখাবার চেষ্টা করুক, হয় এপক্ষ, নয় ওপক্ষের স্বার্থে

চলতেই হবে। একটা শ্রেণী উপরে চেপে আছে, আরেকটা শ্রেণী উঠছে, আসল সংগ্রাম এই দুটো শ্রেণীর মধ্যে। যেখানে যেমন রূপ হোক সংঘাতের, স্পষ্ট হোক, আড়াল করা হোক, সব সংঘাতের পিছনে এই দুই শ্রেণীর নেতৃত্ব।

চাষীতে জমিদারে যেখানে মারামারি ?

জমিদার মালিক শ্রেণীর ঘাঁটি। চাষী যখন জমিদারের সঙ্গে লড়ে আসলে সে তখন শ্রোমিক শ্রেণীর পক্ষ নিয়ে মালিক শ্রেণীর সঙ্গে লড়ছে।

নন্দা একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই বলতে যায়, আপনি তো রাজনীতির ধার ধারেন না…

সে কি ? এতক্ষণ তাহলে কি বোঝালাম আপনাকে ? রাজনীতির ধার প্রত্যেককে ধারতেই হবে। রাজনীতি মানেই তাই।

নন্দা একটু বিরক্ত হয়ে বলে, আহা, আমি বলছি সোজাসুজি রাজনীতি করার কথা। তাতো আপনি করেন না ? আপনি আছেন চাকরী আর দেশ বিদেশের সাহিত্যচর্চা নিয়ে। এসব রাজনীতির কথা জানালেন কি করে ?

স্নীল হাসিমুখেই বলে, এসব আজকাল সব কিছুর অ, আ, ক, খ, হয়ে গেছে। সাহিত্যচর্চা বিজ্ঞানচর্চা সঙ্গীতচর্চা যাই চর্চা করুন, একটু সাধারণ জ্ঞান জন্মে যাবেই।

আমার তো জন্মে নি ?

আপনাকে চেষ্টা করে উল্টো জ্ঞানটা শেখানো হয়েছে বলে। এটাই কিন্তু প্রমাণ যে শ্রেণীযুদ্ধের মোট কথাটা সাধারণ জ্ঞান দাঁড়িয়ে গেছে। আপনি পাছে এ জ্ঞানটুকু পেয়ে যান সেজন্য আপনাকে বিভ্রান্ত করতে রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচান যায়, নিরপেক্ষ থাকা যায় এসব আপনাকে শেখাতে হয়।

ঘড়ি ধরে বিদায় নেবার জন্য স্নীল উঠে দাঁড়ালে নন্দা তাকে আরেকটা মনের কথা জানিয়ে বসে।

বলে, আমি এমন তাড়াহুড়ো করে ইংরাজী শিখছি কেন জানেন ? আসল কথাটা বলি আপনাকে। কাগজটা ভাল চলছে না, বাবা মাঝে মাঝে তুলে দেবার কথা বলেন। কে জানে, কিছুদিন পরে বাবা হয় তো একেবারে বেঁকে বসবেন,

তুলেই দেবেন কাগজটা। আমি তাহলে নিজে কাগজটা চালাবার চেষ্টা করে দেখব।

স্থনীল সহজভাবে বলে, কাল থেকে আমি তোমাকে লিখতে শেখানোর দিকে জোর দেব। ছোট ছোট ঘটনা খবরের মত লিখবে, ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখবে, বাংলা কাগজ থেকে অনুবাদ করবে।

নন্দা আশ্চর্য্য হয়ে বলে, এই তো অনায়াসে 'তুমি' বেরিয়ে এলো ?

স্থনীল বলে, অনায়াসে বলেই বেরিয়ে এল। আমি চেষ্টা করে কাউকে তুমি বলি না।

রেবার চেয়ে বয়সে অনেক বড় নন্দা। রেবাকে তুমি না বলার জন্য সে আঘাত পেয়েছে, অপমান বোধ করেছে—কিন্তু তাকে আপনি না বলে কথা বলতে পারে না স্থনীল।

বাড়ীর দিকে হাঁটতে হাঁটতে স্থনীল ভাবে, অনুমান তার মিথ্যা হয় নি। যাদবের মেয়েকে পড়ানোর বদলে পাঁচ টাকা কম বেতনে বেশী পথ হেঁটে নন্দাকে পড়াবার কাজ সে যে বেছে নিয়েছিল সেটা নিছক অকারণে নয়।

নন্দার গম্ভীর ভাব ও ভারিক্কি চালচলন দেখেই এটুকু সে অনুমান করে নিয়েছিল যে সে খেয়ালী নয়, জীবনকে সে গুরুত্ব দেয়, হাল্কা হওয়া তার পোষাবে না।

শ্রদ্ধাভক্তি ভয়ের সঙ্গে প্রেমকে গুলিয়ে ফেলার মত ভাবপ্রবণ সে কখনো হবে না।

রেবা যেমন অনায়াসে গুলিয়ে দিয়েছে।

এবং তাকে জ্বালাতন করে মারছে, তার মন জয় করার অভিযান স্থরু করে।

আঘাত দিয়ে পর্য্যন্ত তার ভুল ভাঙ্গা যায় না। বরং আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় যেন আরও বেশী করে তাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে।

সে নিষ্ঠুর। কাজেই তাকেই সে ভালবাসে। এ নিষ্ঠুর হৃদয় জয় না করতে পারলে বেঁচে থেকে কি হবে?

এরকম মেয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হওয়াও এক বিপদের কথা।

নন্দার সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে মেলামেশা করা চলে।

আজ তার কথা শুনে সে আরও নিশ্চিন্ত বোধ করছে। নন্দার স্বামী একটি ইংরাজী কাগজের মালিকানার দায় চাপিয়ে রেখে গেছে তার ঘাড়ে। এ দায় তুচ্ছ করার সাধ্য তার নেই।

প্রমোদ বেঁচে থাকতে কাগজটার পিছনে যথা সর্ব্বস্ব ঢালা হচ্ছে, শেষ পর্য্যন্ত তাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে এদিকটা নিয়েই হয় তো যেটুকু সে মাথা ঘামাত, কাগজটার জন্য বিশেষ মাথা ব্যথা ছিল না।

প্রমোদ মারা যাবার পর বাপের উপর কাগজটা চালাবার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েও সে খুব বেশী দায়িত্ব বোধ করেনি।

সে মেয়েমানুষ, খবরের কাগজ চালাবার ব্যাপারে তার কি করার আছে?

কিন্তু কাগজ ভাল না চলায় বাপ যেই কাগজটা বন্ধ করে দেবার কথা বলেছে তখনি টনক নড়ে গেছে নন্দার। সর্ব্বস্ব দিয়ে স্বামী তার যে কাগজটি চালু করেছিল, যে কাগজটি চালাবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করেছিল, আজ সে কাগজ তুলে দেবার কথা ভাবছে তার বাবা?

একি সর্বনাশের কথা!

কাগজটা বন্ধ করা তার কাছে সর্বনাশের সামিল বলেই এবার সে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। হোক সে মেয়েমানুষ, সে ছাড়া আর কে আছে যে দরদ দিয়ে কাগজটা চালু রাখার চেষ্টা করবে?

নিজেকে তৈরী করতে তাই সে উঠে পড়ে লেগেছে। শচীন যদি শেষ পর্য্যন্ত কাগজ চালাবার ভার বইতে অস্বীকার করে নিজেই সে দায় ঘাড়ে নেবে, প্রাণপণে চেষ্টা করে দেখবে কাগজটা বাঁচিয়ে রাখতে পারে কিনা।

এমন যার দায়িত্ববোধ সে কখনো দৃঢ়চেতা শক্ত সমর্থ একটা পুরুষের সংস্পর্শে এলেই প্রেমে পড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে না।

কিন্তু প্রেম সম্পর্কে তার নিজের এমন বিতৃষ্ণা কেন?

অনেকদিন পরে আজ আবার প্রশ্নটা তার মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। নন্দা সহজে তার প্রেমে পড়বে না এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে সে যে বিশেষভাবে স্বস্তি বোধ করছে—এটাই তুলে বড করে ধরেছে প্রশ্নটাকে।

নারীপুরুষের পরস্পরের আকর্ষণ মোটেই তুচ্ছ বাজে ব্যাপার নয় তার কাছে, নারীদেহ বর্জন করেই পুরুষের শুদ্ধ পবিত্র উচ্চতর জীবন সম্ভব, এই ধাপ্পাবাজিতেও সে বিশ্বাস করে না। নারীপুরুষের মিলন সুস্থ স্বাভাবিক জীবনেরই একটা অঙ্গ। বৃহত্তর জীবনের জন্য বড় দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই কেবল সংযমের মানে হয়, নিজের আর আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের ফাঁকির খাতিরে সংযমের নামে আত্মপীড়নকে সে অসুস্থতা, বিকারগ্রস্ততা বলেই জানে।

নৈতিক কোন কুসংস্কারের ধার সে ধারে না।

অথচ প্রেমের নামেই বিমুখ হয়ে ওঠে তার হৃদয় মন। টুইসনি খুঁজতে বেরিয়ে পর্য্যন্ত সে এমন ছাত্রী বেছে নেয়, যে তার প্রেমে পড়ে যাবে এ আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম!

আরও একটা কথা আজ খেয়াল হয় সুনীলের। খেয়াল হয় যে ঘটনাচক্রে যে দুটি টুইসনির খোঁজ পেয়েছিল, দুটিতেই ছিল মেয়েকে পড়াবার প্রয়োজন। তার মধ্যে একজনকে সে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু এদের দুজনকেই বাতিল করে কোন ছেলেকে পড়াবার টুইসনি খুঁজে নেবার কথা তো তার মনেও আসেনি?

তার বিতৃষ্ণা কি তবে প্রেম সম্পর্কে নয়? রেবার মত উমার মত মেয়েরা যেটাকে প্রেম মনে করে সেটাই তার অপছন্দ?

কিন্তু মেয়ে তো এরা বদ নয়, পাকা ঝানু নয়, প্রেম তো তামাসা নয় এদের কাছে। ভুল বুঝে থাকতে পারে রেবা, কিছুদিন বাদে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে তার প্রেম, কিন্তু এই প্রেমকে আশ্রয় করে ডুবড়ির মতই তো প্রচণ্ড

শক্তিতে উৎসারিত হয়ে উঠেছে সরল ছেলেমানুষ মেয়েটার আবেগ, কল্পনা, স্বপ্ন, অনুভূতি, সব কিছু।

হয় তো এই উন্মাদনাই প্রেম—প্রেম ব্যাপারটাই এরকম, সে পছন্দ করুক আর না করুক। এইরকমই রীতিপ্রকৃতি প্রেমের।

সে যে গুরুগম্ভীর ভারিক্কি প্রেমের কথা ভাবে সেটাই একটা অসম্ভব অবাস্তব কল্পনা মাত্র।

প্রতিদিনের মত আজও রেবা দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীর সামনের চার পাঁচ হাত লম্বা চওড়া বাগানটুকুতে।

আজকাল রেবা শান্ত সংযতভাবে কথা বলে, একটু উদাসীনভাবে। মুখে থমথমে ভাবটুকু বজায় থাকে কিন্তু সেটা ক্ষোভ বা অভিমানের জন্য মনে হয় না, এটা যেন তার নীরব ভৎর্সনার প্রতীক।

আমার বইটা এনে রেখেছেন ?

ওদিকে যাবার সময় পায়নি।

রেবা অভিমান করে না।

বলে, তা সত্যি, সারাদিন যা খাটুনিটা খাটেন। আবার টুইসনিটা কেন নিতে গেলেন বলুন তো ? বাড়ীর লোকেরাই নয় একটু কষ্ট করত।

সুনীল বলে, কষ্ট কি আর ওরা করছে না। কষ্ট করাটা নিস্ফল হচ্ছে এই যা আপশোষ। তুমি এক কাজ কর না কেন ? লাইব্রেরী থেকে নিজে বই এনে তো পড়তে পার ?

তার মুখে হঠাৎ আজ তুমি শুনে রেবা যেন চমকে ওঠে।

বোঝা যায় ভেতরে তার তোলপাড় করে উঠেছে।

কোনমতে বলে, ওসব বই কি সাধারণ লাইব্রেরীতে পাওয়া যায় ?

তা বলতে পারব না। বইটা আমি আনব, কবে আনব বলতে পারছি না। আনলে তোমায় পড়তে দেব।

যেখানটা বুঝব না বুঝিয়েও দিতে হবে কিন্তু।

৫

বাড়ীর মানুষের কাছে রহস্যময় হয়ে উঠেছে অনিলের চালচলন।

দিন দিন কেমন রোগা আর মনমরা হয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। সর্বদা অন্যমনস্ক ভাব, মুখে একটা চিন্তাক্লিষ্ট রুক্ষতার ছাপ।

সর্ব্বদা বিরক্ত হয়ে আছে, যখন তখন কারণে অকারণে ভয়ানক চটে যায়। পড়াশুনা করে না, কোনদিন বাইরে বাইরে কাটায়, কোনদিন গোমড়া মুখে ঘরের কোনায় মুখ গুঁজে থাকে।

জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলে না।

দরদ দেখিয়ে দু'বারের বেশী তিনবার কিছু জিজ্ঞাসা করলে একেবারে খেঁকিয়ে ওঠে।

এ সমস্তের সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে তার টাকার চাহিদা।

হঠাৎ মাকে বলে, আমায় দশটা টাকা দাও।

দশ টাকা? দশ টাকা কোথা পাব?

আমার ভীষণ দরকার। বাবার কাছে নয় দাদার কাছ থেকে চেয়ে দাও।

দাদা দেবে না। ওঁর কাছে আমি চাইতে পারব না, তুমি চাওগে।

আমার ভীষণ বিপদ।

বিপদ?

মা চমকে গিয়েও ধৈর্য্য ধরে বলে, কি বিপদ বল! সত্যি সত্যি বিপদ হলে কি দশটা টাকার জন্য আটকাবে? তোর দাদাই ব্যবস্থা করে দেবে।

আমি বলতে পারব না। দিলে দেবে, না দিলে দিও না।

গৌরী অনেক ভেবে চিন্তে নিশ্বাস ফেলে বলে, আচ্ছা বেশ দিচ্ছি এবারকার মত। তুই আমাকে শেষ করবি অনিল!

কার কাছে চাইবে? বাবার কাছে?

চেয়ে এনে দিতে পারব না। লুকিয়ে দশটা টাকা নিয়ে আসছি—হিসেবে কম পড়লে যখন জিজ্ঞেস করবে বলব আমার দরকার ছিল, নিয়েছি।

অনিল সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়ে বলে, না না, ছি! আমার জন্যে চুরি করবে? টাকা চাই না আমার।

গৌরী ব্যাকুলভাবে বলে, বিপদের কথাটা বল না গিয়ে স্থনীলকে? তোরা যত ওকে কঠিন ভাবিস, ও তত কঠিন নয়! সত্যি মুস্কিলে পড়েছিস বুঝলে ব্যবস্থা করে দেবে।

দাদাকে সে কথা বলা যায় না।

একটা কিছু বানিয়ে টানিয়ে বল না গিয়ে।

মিছে কথা বলতে পারব না।

মিছে কথা বলতে পারবে না অনিল!

মার্কিনী সিনেমা দেখে মাথায় রক্ত চড়ে যাওয়ায়—ছায়া, সন্ধ্যারাতে বাড়ী ফিরতে চায় নি, কানের দুল খুলে দিয়ে অনিলকে বলেছিল, টাকা যোগাড় কর।

পৌরুষে একটু বেঁধেছিল অনিলের কিন্তু নীতিবোধে বাধে নি।

দুল বিক্রীর টাকায় উদ্‌ভ্রান্ত অশান্ত মানসিক রোগের দুঃখ তারা মন্থন করেছিল হোটেলে আর ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া করা দু'ঘণ্টার বাসর ঘরে।

কিন্তু কত দুল বিক্রী করার জন্য অনিলের হাতে তুলে দেবে ছায়া? একটা দুল কোথায় পড়ে গেছে—একবার প্রথমবার এ কৈফিয়ৎ বাড়ীর মানুষ মেনে নেয়।

আরেকটা দুল হারালেই তাদের সন্দেহ জাগবে।

তার সঙ্গে ফূর্তি করতে চায় অথচ ব্যাটাছেলে টাকার ব্যবস্থা করতে পারে না, ছি!

কিছুদিন অনিল পারে বৈকি ব্যবস্থা করতে। আংটি বেচে কলেজের মোটা মোটা দামী বইগুলি অর্দ্ধেক দামে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বুক শপে বেচে কলেজে মাইনে না দিয়ে, মান্থলি টিকিট না কেটে টাকার ব্যবস্থা করেছে।

সে কি পুরুষ মানুষ নয় ?

কিন্তু তারপর ?

তারপর সে হয়ে গেছে নিরুপায়।

গিয়ে বলেছে ছায়াকে—ছাখো, হোটেলে হৈ চৈ করা, ভাড়া ঘরে চোরের মত যাওয়া বিশ্রী লাগছে। তার চেয়ে চলো তুমি আমি গিয়ে দাদার পায়ে একসঙ্গে প্রণাম করি। দাদাকে বলি যে আমাদের এই অবস্থা, একটা ব্যবস্থা করে দাও। দাদা সব ঠিক করে দেবে।

ছায়া চুপ করে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

তারপরে গম্ভীর মুখে রুক্ষ গলায় বলে আচ্ছা সে হবে'খন। আজ আমি একটু ব্যস্ত আছি। তুমি কাল এসো।

অনিল রাস্তায় নেমে গিয়ে মোড়ের পান বিড়ির দোকান থেকে একটা আনি ভাঙিয়ে দু'পয়সা দিয়ে একটা সিগারেট কিনে ছোবড়ার দড়ির আগুনে সেটা ধরিয়ে ভাবছিল, আরেকবার গিয়ে কি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করবে ছায়াকে ?

তার চোখের সামনে দিয়ে মোটর গাড়ীতে সেনদের ললিতের পাশে বসে ছায়া বেরিয়ে গিয়েছিল !

পরদিন কলহ।

ছায়া বলে, কেন ? কি দোষ করেছি ?

অনিল বলে, ছিছি, তুমি এত নীচ ? আমার পয়সা ফুরিয়েছে বলে আমায় ছেড়ে ললিতকে ধরলে—এত কিছুর পর !

ছায়া ঝেঁঝে ওঠে, তোমার পয়সা ফুরিয়েছে বলে ? তুমি অপদার্থ অমানুষ বলে ! একটা মেয়ের সঙ্গে খেলা করতে পার, দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা নেই।

দায়িত্ব নেব না কে বলেছে ?

তোমার লজ্জা করে না ? কোন মুখে বললে চলো তুমি আমি দু'জনে একসঙ্গে দাদার পায়ে ধরি, দাদা ব্যবস্থা করে দেবে ? আমি যেতে পারি ওভাবে ? নিজে ব্যবস্থা করতে পার না ? ললিত আমার কাছে প্যান প্যান করবে না, যা করার নিজেই সব করবে, আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাবে।

বিপদ ? ছায়ার বিপদ ? অনিল অবাক হয়ে যায় !

ছায়া বলে, বোকাসোকা পেয়ে মজা করলে আমাকে নিয়ে। বিপাকে পড়ে গিয়েছি মনে হচ্ছে। ওমাসে ভাবনা হয়েছিল, এ মাসে ভড়কে গিয়েছি। আমার কাছে ন্যাকামি না করে, পুরুষ মানুষ একটা ব্যবস্থা কর—আমি তো তোমারি। তুমি না পারলে অগত্যা আমাকে ললিতের ভরসা করতে হবে।

মা মরিয়া হয়ে বলে, অনিলের কি হল তুই তাকিয়েও দেখবি না ?

সুনীল বেগুন ভাজা দিয়ে ডাল মাখা ভাত চিবুতে চিবুতে বলে, আমি দেখতে গেলেই তো তোমরা চটে যাও। তোমরা ওকে তোমাদের আদরের ছোট্ট ছেলে করে রাখতে চাও। আমি কি করব বল ?

কল্পনা বলে, মেজদার যা রকম সকম ব্যাপার স্যাপার দেখছি, বোধহয় এবার স্যুইসাইড করে বসবে একদিন।

সকালে খবরের কাগজ পড়ার সময় হয় নি। সারাদিন খাটুনির পরে রাত্রে খেতে বসবার আগে কাগজে একটা খবর পড়েছিল—স্ত্রী পুত্রকে খেতে দিতে না পেরে যোয়ান মদ্দ একটা পুরুষ অশথ গাছের ডালে দড়ি বেঁধে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

খাওয়া ফেলে ওঠে না সুনীল।

বলে, অনিলকে ডেকে নিয়ে এসো।

ডাকা মাত্র অনিল আসে। এই মতলব নিয়ে আসে যে একটা চড়া কথা বলামাত্র পায়ের চটি খুলে সে সুনীলকে মারবে।

সুনীল খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করে, তুমি খাওনি ?

পরে খাব।

খিদে পায়নি? খেলে এখুনি খাও। এখন খিদের সময়ে না খেলে আজ রাতে উপোস দেওয়াই ভাল।

অনিল চুপ করে থাকে।

খেতে ইচ্ছে করে না কেন তোর? নেশা ধরেছিস?

ভূপেন আর গৌরী, দুজনেই যেন এক সঙ্গে নিশ্বাস টানে। ঠিক কথা। অনিলের নেপথ্য জীবন নিয়ে এমনি তারা বিব্রত হয়ে পড়েছে যে ছেলেটা খেয়েছে কি না খেয়েছে তাও খেয়াল হয় নি।

সুনীল নিজেই কল্পনার আল্পনা আঁকা পিঁড়িটা টেনে নিয়ে পেতে দিয়ে বলে, বসে পেট ভরে খা দিকি। তারপর অন্য ব্যাপার বিবেচনা করা যাবে। তোর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হয় নি তো?

অনিল কথা বলে না। পিঁড়িতে বসে নীরবে ডাল আর পুঁইশাকের ঘণ্ট দিয়ে সাতখানা সেঁকা রুটি পেটে চালান করে দেয়।

জল খেয়ে কুলকুচো করে উঠেই বলে, আমি এখন ঘুমোব। বিছানা হয় নি?

জবাব শুনবার অপেক্ষা না রেখেই সে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে।

নন্দার কাগজের জন্য প্রবন্ধটা শেষ করা দরকার ছিল কিন্তু ঘরে গিয়ে কাজে সুনীল মন দিতে পারে না।

মাঝে মাঝে যে চিন্তা মনে আসত আলগাভাবে আজ সেই চিন্তারই আবির্ভাব ঘটেছে গম্ভীর কালো মূর্তি নিয়ে। অগ্রাহ্য করার উপায় নেই।

সে যে এত করছে এদের জন্য, প্রাণপণে কর্তব্য পালন করে চলেছে, সত্যই তার কোন মানে আছে কি?

পথ কেবল দেখিয়ে দেওয়া নয়, পথ সে কি ধরিয়ে দিতে পারবে ভাইবোনদের? ওদের জীবনের গতি ঘুরিয়ে দিতে পারবে ভবিষ্যতের দিকে?

অথবা তার কিছু করা না করার প্রশ্নই আসে না? যে ভাঙনের খাতে হিসাব

লেখা হচ্ছে ওদের বাঁচন মরণের তারই মধ্যে ব্যবস্থা আছে ভাঙার প্রতিক্রিয়ার পর গড়ে উঠবার—নতুন দিকে নতুন ভাবে?

ভাই-এর কাছে সে বিশেষ কিছু আশা করেনি—নিজের দিক থেকে তার যদি কোন প্রত্যাশা থেকে থাকে তা শুধু এই যে, জীবনের অপরিহার্য্য নিয়মনীতি মোটামুটি হৃদয়ঙ্গম করে জীবনের গতির দিকে চলার কায়দাটা একটু আয়ত্ত করে নিক।

অনিলের ঝোঁক অনিয়মের দিকে, উল্টো দিকে।

জীবন যেদিকে এগোয় না। যেদিকে ব্যর্থতা ওৎ পেতে থাকে।

অনিয়মকে বেছে নেয় অথচ সে অনিয়মে বিদ্রোহ থাকে না। নিজেকে ভেঙে চুরমার করে ক্ষয়িষ্ণুকে দ্রুত শেষ করে ফেলার মধ্যেও একটা ব্যতিক্রমের নিয়ম আছে। সেটা পছন্দ নয় অনিলের। ভীরুতায় হতাশায় কাবু হয়ে সে শুধু নিজেকে কষ্ট দেবে, কষ্ট পাবে আর ভাববে জগৎসংসার তার উপরে বিরূপ।

অসময়ে মায়া আসায় সুনীল আশ্চর্য্য হয় না। মায়া আসবে সে জানত। আজ রাত্রে না এলেও কাল সকালে নিশ্চয় আসত।

নিজেও সে যেতে পারত অনায়াসেই। কিন্তু বোনের ব্যাপারে মায়াকে একটু হাল ধরতে দেওয়া সে উচিত বিবেচনা করেছে।

অন্ততঃ তার ঘর পর্য্যন্ত এগিয়ে আসুক।

মায়া বসে বলে, চুপচাপ যে?

নানা কথা ভাবছি।

কাজের কথা নিশ্চয়। নইলে আপনার ভাববার গরজ পড়ে না। আমি কেন এসেছি জানেন?

জানি।

অনিল আপনাকে বলেছে বুঝি?

সুনীল মাথা নাড়ে।

মায়া আশ্চর্য্য হয়ে বলে, তবে কি করে জানলেন ?

স্নীলের মুখের ভাব এতটুকু বদলায় না, শান্তভাবে বলে, আপনার বোনকে সিনেমা দেখাতে, হাত খরচের টাকার জন্য ভাইটি আমার সাথে ঝগড়া করেছিল। তারপর কটা টাকার জন্য সব সময় খাঁ খাঁ করছে। আংটি কলেজের বই হাত ঘড়ি সব বিক্রী করে দিয়েছে শুনলাম। কদিন থেকে দেখছি ভাইটি পাগলের মত করছে। ব্যাপারটা অনুমান করা কি কঠিন এ অবস্থায় ?

মায়া রুষ্টস্বরে বলে, আমার বোনের জন্য আপনার ভাই পাগল হলে তো কথাই ছিল না—সাদাসিধে ব্যাপার হত। আপনার কাছে ছুটে না এসে আমি সংসারের হিসেবপত্র দেখতে বসে যেতাম।

স্নীল সোজা হয়ে বসে বলে, বটে ? শুনিতো ব্যাপারটা তবে ?

মায়া বলে শুনে আপনি অবশ্য এতটুকু বিচলিত হবেন না। বলতে আমার কান্না পাচ্ছে। ছায়া কদিন ধরে ছটফট করছিল। আমি টের পেয়েও কিছু জিজ্ঞেস করি নি—জানি তো, আমাকে দিয়ে জিজ্ঞেস করাবার জন্যই ছটফট করছে। জিজ্ঞেস করলেই পেয়ে বসবে। আমি এমনভাব দেখাচ্ছিলাম যেন কিছুই আমার চোখে পড়েনি। আজ মেয়ে নিজে থেকে আমায় সব বললেন।

একটু থেমে মায়া আবার স্নুরু করে, গোড়ার দিকে অনিল ছায়াকে সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিল কয়েকবার—এদিক ওদিক হৈ চৈ করেও বেড়িয়েছে। একদিন পয়সা ছিল না, ছায়া হাতের চুড়ি পর্য্যন্ত খুলে দিয়েছে। কিন্তু পরে ছায়াকে ছেড়ে অনিল নাকি রেবাকে ধরেছে। ছায়ার বদলে রেবাকে নিয়ে সিনেমায় যায়, এখানে ওখানে যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোকে ছাড়ল কেন অনিল ? ও অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যে কারণ বলল তার সোজা মানে দাঁড়ায় এই—অনিলের কাছে সব সময় পয়সা থাকে না, উনি তাই আরেকজনের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিলেন। সেনদের ললিতের সঙ্গে। সেজন্য রাগ করে পাল্লা দিয়ে অনিল রেবাকে নিয়ে যায়—ছায়ার সঙ্গে কথা কয় না।

কথা কয় না ?

কথা কয় না মানে মেশে না। রোজগার না থাকলে কি হবে মেয়েরা যে সম্পত্তি এ জ্ঞানটি আপনার ভায়ের বেশ টনটনে হয়ে উঠেছে। আরেকজনের সঙ্গে সিনেমা গেলেই মেজাজ বিগড়ে যায়।

সুনীল গম্ভীর মুখে বলে, তাহলে অনিলের সঙ্গে শুধু সিনেমায় যেত না, হৈ চৈ করত না। আরও কিছু নিশ্চয় ছিল।

তাই তো মনে হচ্ছে মেয়েটার রকম দেখে। একেবারে এলিয়ে পড়েছে। কি করা যায় বলুন দিকি ?

সুনীল ভাবতে ভাবতে বলে, বলছি। ছায়াকে আপনি বলবেন না আমি বলব ভেবে একটু ঠিক করে নি, তারপর বলছি।

মায়া জোর দিয়ে বলে, কি বলবেন কথাটাই আগে বলুন না, তারপর ঠিক করা যাবে ছায়াকে কে বলবে।

সুনীল তবু একটু সময় গভীরভাবে চিন্তা করে নিয়ে বলে, বলবেন রেবার দিক থেকে ছায়ার কোন ভয় নেই। সিনেমায় নিয়ে যাক আর যেখানেই নিয়ে যাক অনিলকে রেবা দেওরের মতই আপন করবেন তার বেশী এতটুকু নয়।

তাই নাকি !

আমার সঙ্গে ভাব করতে চেয়ে অপমান হয়েছিল, সেটা চেপে রেখে আবার ভাব করার চেষ্টা করছিল। অপমান হয়ে, হয় তো গায়ের জ্বালায় শোধ নেবার জন্য বাইরে একটু বাড়াবাড়ি দেখাতে পারে, সেটা স্রেফ লোক দেখানো অর্থাৎ আমাকে দেখানো ব্যাপার হবে।

মায়া খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলে, মেয়েদের সম্পর্কে আপনার তো ভারি বিশ্বাস !

সুনীল হেসে বলে, মেয়েদের অবিশ্বাস করার চেয়ে বিশ্বাস করে মার খাওয়া ঢের ভাল।

মায়াও হাসে।— অভিজ্ঞতা আছে নাকি ?

না, সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

তারপর মায়া বেশ খানিকক্ষণ অত্যন্ত চিন্তিতভাবে চুপ করে থেকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে তার দিকে তাকায়। মায়া চিন্তা শেষ করে মুখ খুলতে অনেক সময় নেবে টের পেয়ে স্বনীল নিজে থেকে বলে, না, তা হয় না। আমি রাজী হব না।

মায়া তাজ্জব বনে বলে, মানুষের মনের কথাও টের পান নাকি ?

স্বনীল সহজ ভাবেই বলে, সময় অবস্থা যোগস্বত্র অনেক কিছু ধরে বিচার করলে পাওয়া যায় বৈকি। এতক্ষণ ওদের কথা বলার পর ওদের বিয়ে দিয়ে সব হাঙ্গামা চুকিয়ে দেবার কথাটা আপনার মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়। আমাকেও কথাটা ভাবতে হয়েছে।

উচিত হবে না, না ?

নিশ্চয় না। তার চেয়ে ওরা বখাটে হয়ে যায় তাও অনেক ভাল। বখাটে হলে শোধরাবার আশা আছে, বিয়ে দিলে আর কোন আশা নেই।

মায়া নিশ্বাস ফেলে বলে, কিন্তু ছায়ার কি উপায় হবে ?

স্বনীল বলে, কি আশ্চর্য্য, এই বিজ্ঞানের যুগে ওই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনার এত দুর্ভাবনা! ডাক্তাররা আছে কি-জন্য ? ভয় পাবেন না, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

মায়া বিদায় না নিয়েই নীরবে উঠে চলে যায়। এটা আজ নতুন নয়—এক বাড়ীতে দিনে যাদের দশবার দেখা হয় কথা হয় তাদের মতই কথার শেষে কখনো শুধু যাই বলে কখনো কিছু না বলে চলে যাওয়া তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে।

তাদের এই স্বভাবের জন্য আজ অস্থবিধা হয় কল্পনার।

সে খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কাম পেতে ভিতরে তাদের কথা শুনছিল!

মায়া হাত বাড়িয়ে কান ধরতে তার মুখখানা রাঙা হয়ে যায় বটে কিন্তু মায়ার হাত চেপে ধরে টানতে টানতে ও-ঘরে নিয়ে গিয়ে সে চাপা গলায় বলে, বেশ করেছি শুনেছি। নইলে কি তোমাদের এ রহস্য কোনদিন ভেদ করতে পারতাম মাসীদি!

মায়া আশ্চর্য্য হয়ে বলে, আমাদের রহস্য ?

কল্পনা বলে, রহস্য বৈকি ! তাইতো বলি তোমরা দু'জনে মিলেমিশে ঘর কন্না করছ, শুধু লীলাখেলাটুকু বাদ দিয়ে ! আচ্ছা, মায়াদি—মায়াদি তো নয়, বৌদি—তোমাদের আইন মতে বিয়ে হয়েছে না তোমরা ওটা একদম বাদ দিয়েছ ?

তোদের মত বিয়ের জন্য পাগল নই আমরা।

প্রেমের জন্য পাগল তো। তাই তো বলি, দাদার বুকটা বিয়ে না করেই এমন পাথর হল কিসে ? অন্য সংসারে আগে সংসারে বৌ আসে তারপর ভাই দাপট চালায় বাপ মা ভাই বোনদের ওপর। কে জানত দাদা আমাদের বৌ না এনেই সংসারী।

মায়া বলে, বিয়ের পর যেন মাথাটা বিগড়ে গেছে মনে হচ্ছে তোর ? আমি অন্য বিষয়ে পরামর্শ করতে এসেছিলাম।

কল্পনা নির্ভয়ে বলে, আমি সব শুনেছি। ছোড়দার সঙ্গে ছায়ার বিয়ে তো তোমরা বাতিল করবেই, নইলে যে তোমাদের বেলা অসুবিধা হয়।

মায়া এবার রাগ করে বলে, আবোল তাবোল কি বলছ তুমি কল্পনা ? আমাদের তো অসুবিধা হবেই। যে দিনকাল, অনিল রোজগার না করলে, ঠিক পথে চলে মানুষ হবে কিনা না জানলে আমিই বা ওর হাতে কি করে বোনকে দেব ?

একটু থেমে শান্ত গলায় মায়া আবার বলে, সুনীলবাবু ঠিক কথাই বলেছেন, এরকম হাল্কা প্রকৃতির ছ্যাবলা ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়াটাই মস্ত ভুল হবে। আমাদের জিজ্ঞাসা করে কি ওরা বিগড়ে গিয়েছে ? গোল্লায় গিয়েছে নিজেরাই। মানুষ যদি হয়, নিজেরাই চেষ্টা করে ব্যবস্থা করুক—তখন আমাদের যতটা করা দরকার করব ! আমরা ওদের ছেলেমানুষিকে প্রশ্রয় দিলে ওদের দুজনেরি সর্বনাশ করা হবে।

কল্পনা বলে, তোমাদের দুজনেরি সত্যি কঠিন প্রাণ মায়াদি !

৬

স্নীলের ইংরাজী প্রবন্ধটা নিয়ে চারিদিকে হৈ চৈ না হলেও লেখাটার বেশ নাম হয়েছে। এ ধরণের গুরুতর প্রবন্ধ নিয়ে বোধ হয় সেরকম হৈ চৈ হয় না, এমনিভাবেই ধীরে ধীরে গুণগ্রাহীদের মধ্যে নাম ছড়ায়।

হৈ চৈ করার মানুষেরা বোধ হয় মেতে উঠবার কিছু খুঁজে পায় না এসব লেখায়।

আগে কথা হয়ে না থাকলেও সম্পাদক হিসাবে নিখিল তাকে লেখাটার জন্য কয়েকটা টাকা দিয়েছে।

অন্য কাগজ থেকে ফরমাস এসেছে লেখার।

নবীন খুসী হয়ে বলে, এদিকে আপনার ভবিষ্যৎ আছে স্নীলদা।

কিসের ভবিষ্যৎ? নাম না টাকার?

দুটোরি।

সে ভবিষ্যৎ দিয়ে কি করব? তোমার থাকলে বরং কাজে লাগত।

নবীন একটু হেসে বলে, নিজেকে যত উদার নির্ব্বিকার ভাবছেন আসলে আপনি কিন্তু অতটা নন স্নীলদা। আল্পনা আর কল্পনার কথা সবটা না হলেও খানিকটা ঠিক। আপনি কর্তালি করতে ভালবাসেন।

স্নীল বলে, তা হয়তো বাসি। মানুষের কতরকম স্বভাব থাকে। কিন্তু নিজেকে আমি উদার নির্ব্বিকার ভাবি এটা তুমি কি থেকে আবিষ্কার করলে?

অনিলকে আপনার শাসন করে দেওয়া উচিত ছিল।

স্নীল একটু সময় তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কল্পনা তার আর মায়ার কথা লুকিয়ে শুনে মায়াকে খোঁচা দিয়ে মন্তব্য করেই ক্ষান্ত

থাকেনি, অন্তরঙ্গ সকলের কাছে নিজের ভাষ্য সমেত সেই কথাগুলি বলেও বেড়িয়েছে বোকার মত।

কিন্তু কল্পনার নয় বিয়ে হয়ে গেছে, সে এখন পরের বাড়ীর মেয়ে, স্নুনীলকে সে আর এতটুকু ভয় করতে রাজী নয়। বরং গায়ে পড়ে দেখাতে চায় যে আমি তোমায় একটুও ভয় করি না।

কিন্তু নবীনের এ দুঃসাহস কোথা থেকে এল? কল্পনার কাছে সব শুনে তার ভয় উপে গেছে?

স্নুনীল ধীরে ধীরে বলে, অনিলকে শাসন করলে সেটা কর্তালি হত না তোমাদের হিসাবে?

নিশ্চয় না। ওটা হত শাসন। কিন্তু যেখানে শাসন করতে সাহস হয় না সেখানেই তো উদার নির্ব্বিকারতা দিয়ে কর্তালি করা স্নুবিধা। অনিলের সম্পর্কে আপনার ভাবটা এই যে তোমার ওসব ছেলেমানুষি ব্যাপার নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই।

স্নুনীল আর কিছু বলে না।

আপিস ছুটির পর স্নুনীল টাইপরাইটারে গিয়ে বসে।

পকেট থেকে হাতে লেখা কাগজ বার করতে দেখে নবীন জিজ্ঞাসা করে, আরেকটা প্রবন্ধ লিখেছেন? কি বিষয়ে?

তোমাদের বিষয়ে। আধুনিক কবিতা নিয়ে।

আপনি আধুনিক বাংলা কবিতা পড়েছেন?

পড়েছি বৈকি। বেশী গদ্য পড়ার সময় পাই না। ট্রামে বাসেও কয়েকটা কবিতা পড়ে নেওয়া যায়।

ঝুলতে ঝুলতে?

আমি হেঁটে গিয়ে ডিপো থেকে ট্রামে উঠি।

নবীন ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, তবু, ট্রামে কবিতা পড়ে সমালোচনা লিখেছেন! ট্রামে লোকে ডিটেকটিভ বই পড়ে। খুব নিন্দা করেছেন তো?

নিন্দাও করেছি, প্রশংসাও করেছি। ট্রামে ডিটেকটিভ বই পড়া যায়, কবিতা পড়লে দোষটা কি ?

ডিটেকটিভ বই যেমন তেমন ভাবে পড়া যায়। কিন্তু কবিতা একটু বিশেষভাবে না পড়লে···

চান করে গরদ পরে ফোঁটাচন্দন কেটে যোগাসনে বসে ? না পরীক্ষা পাশ করার মত সিরিয়াস হয়ে ?

নবীন রেগে বলে, শেলী কিট্স কখনো পড়েছেন ট্রামে বসে ?

স্থনীল গম্ভীর হয়ে বলে, না, পড়িনি। তাতে কি প্রমাণ হয় ?

কি প্রমাণ হয় ? প্রমাণ হয় যে শেলী কীট্সরাই আপনার কাছে আসল কবি। খুব মনোযোগ দিয়ে সিরিয়াস হয়ে ওদের কবিতা পড়তে হবে। দেশের চ্যাংড়া ছোকরারা যেসব কবিতা লিখছে সেগুলো ফাঁকতালে একটু চোখ বুলিয়ে পড়াই যথেষ্ট।

স্থনীলের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে যায়।

বলে, ট্রামে, রেশনের দোকানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আমি রবিবাবুর কবিতাও পড়েছি, আরও অনেক জাঁদরেল পুরাণো কবির কবিতাও পড়েছি। আমার তো পড়তে বা বুঝতে কোন অস্থবিধা হয় নি। শেলী কীটস সেকস্পিয়র বিদেশী কবি—বুঝে পড়তে বেশ খানিকটা কসরৎ করতে হয়। আমার মাতৃভাষায় লেখা কবিতা বুঝতে আমাকে কষ্ট করতে হবে কেন ? লেখাপড়া না জানতাম তা হলেও বরং কথা ছিল। ছেলেবেলা থেকে বাংলা, ছড়া বাংলা কবিতা পড়তে পড়তে ত্রিশ বছর বয়স হল, প্রায় সমস্ত বাংলা কথার তাৎপর্য্য জানি, রাস্তায় ঘাটে পড়লেও বাংলা কবিতা বুঝব না কেন ? যে কবিতা বুঝব না সেটা নিশ্চয় না বুঝবার জন্যই কায়দা করে লেখা। সে কবিতা বুঝবার জন্য আমার মাথাব্যথা নেই।

কেন নেই ? একটা ইংরাজী কবিতা বুঝবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোমর বেঁধে চেষ্টা করবেন, বাংলা কবিতায় চোখ বুলিয়ে বুঝতে না পারলেই ছুঁড়ে ফেলে দেবেন ?

দেব।

কেন দেবেন? কোন অধিকারে?

এই অধিকারে দেব যে বাংলা কবিতাটা পরীক্ষা পাশের জন্য পড়ছি না। এই তো সেদিন চাকরীতে ঢুকলে,-এর মধ্যে ভুলে গেছ পরীক্ষা পাশের জন্য ইংরাজী বাংলা সব কবিতাই কেটে ছিঁড়ে নোট মিলিয়ে পড়তে হত?

নবীন আহত হয়ে চুপ করে থাকে।

তবু সুনীল তাকে আঘাত দিয়ে বলে, বেশী কথা বলা দোষ নয়, একটা দোষের লক্ষণ। চিন্তা হালকা হলে বেশী কথা বলিয়ে ছাড়ে। বিবেচনা করে কথা বলার দরকার হয় না কিনা।

নবীনের ফর্সা মুখ তামাটে হয়ে যায়।

ব্যাঙের স্বরে সে বলে, সেকেলে ভারি চিন্তার চেয়ে হাল্কা চিন্তাও ভাল। নিজের ভাবে গ্যাঁট হয়ে না থেকে হাল্কা চিন্তা তবু এদিক ওদিক নড়ে চড়ে, এগোয় পিছোয়।

এত চটে গিয়েছে নবীন কিন্তু সুনীল যেন গ্রাহ্যও করে না!

নিজেকে না শুধরে নিলে তুমি কোনদিন বড় কবি হতে পারবে না। কথায় কথায় হৃদয় যার ফোঁস করে ওঠে, তার আর এদেশেও বড় কবি হবার চান্স নেই। দশ পনের বছর আগেও খানিকটা ছিল।

রাগে নবীনের হাত পা কাঁপছিল। একটা চেয়ার টেনে ঘুরিয়ে নিয়ে ধপাস করে বসে সে প্রশ্ন করে, কবি কি হৃদয়হীন?

না। কিন্তু এ যুগে হৃদয় সর্ব্বস্ব কবির দিন ফুরিয়েছে।

আমার কবিতা পড়েছেন আপনি?

কবিতার বই বেরিয়েছে তোমার?

এখনো বই বেরোয় নি। মাসিকে কয়েকটা ছাপা হয়েছে।

তা হলে এমন গোঁয়ারের মত জিজ্ঞেস করছ কেন তোমার কবিতা পড়েছি নাকি? হয় তো কোন মাসিকে পড়েছি তোমার দু'একটা কবিতা, মনে নেই।

নবীন যেন খুসী হয় তার জবাব শুনে। সে যেন এবার বাগে পেয়েছে সুনীলকে।

তার তামাটে মুখ সাদাটে হতে থাকে। মুখে একটু বিদ্রুপাত্মক হাসিও ফোটে।

এই বিচারবুদ্ধি নিয়ে আপনার এত বড়াই? আমার কবিতা না পড়েই রায় দিলেন সেগুলি হৃদয়সর্বস্ব কবিতা?

বিদ্রুপাত্মক হাসিটা আরও স্পষ্ট হয় নবীনের। সুনীলের কথাই ব্যাঙ্গের সুরে ঢেলে সেজে সে বলে, নিজেকে শুধরে না নিলে আপনি কোনদিন বড় কাব্য-সমালোচক হতে পারবেন না। কবিতা না পড়েই যে কবির ওপর ফোঁস করে ওঠে এদেশেও তার বড় কাব্য সমালোচক হবার চান্স নেই। দশ পনের বছর আগে হয়তো খানিকটা ছিল।

সুনীল যেন একটা নিশ্বাস ফেলেই পকেট থেকে সস্তা সিগারেটের একটা প্যাকেট বার করে। নিজে একটা নিয়ে নবীনকে একটা বাড়িয়ে দেয়! তার সামনে নবীন সিগারেট খায় নি আজ পর্যন্ত।

নবীন বলে, না।

তুমি তো সিগারেট খাও?

খাই। কিন্তু সিগারেট দিয়ে ভোলাবেন না আমায়।

ভোলানোর কথা নয়। তুমি সিগারেট খাও কিন্তু আমার সামনে খাও না। সিগারেট আমি খুব কম খাই—রোজ পাঁচ সাতটার বেশী পয়সায় কুলোয় না। আমার বাবা গড়গড়ার তামাক টানেন, ইচ্ছা হলে তাঁর সামনেও আমি সিগারেট ধরিয়ে টানি। আমার সামনে সিগারেট খেতে তোমার লজ্জা হচ্ছে কেন?

লজ্জা? মোটেই নয়। আপনার সামনে সিগারেট টেনে চাকরী খোয়াবো এই ভয়ে খাই না। এখন খাচ্ছি না এইজন্য যে আপনি আমাকে একটা সিগারেট দিয়ে ভোলাতে চাচ্ছেন, আসল কথাটা চাপা দিচ্ছেন। আমি সিগারেট খাওয়ার

অনুমতি চাই না, কবিতা না পড়েও আমার কবিতা নিয়ে ওরকম মন্তব্য কেন করলেন জানতে চাই। কবিতা না পড়েই মন্তব্য!

সুনীল হাসে। সে হাসি শূলের মত বেঁধে নবীনের বুকে।

সুনীল সিগারেটা ধরিয়ে বলে, প্রায় বছর খানেক উদীয়মান কবিটিকে দেখলাম শুনলাম জানলাম বুঝলাম। কবিকে জানলে বুঝলে বলা যায় না সে কি রকম কবিতা লেখে? ধান গাছটাকে জানলাম বুঝলাম। অনায়াসে ধরে নিতে পারব না এ গাছে ধান ছাড়া কিছুই ফলবে না।

নবীন যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

আপনি তামাসা করছেন!

তোমার তাই মনে হবে।

কিন্তু এ কি রকম অদ্ভুত কথা বলছেন! কবির সঙ্গে জানাশোনা থাকলেই সে কেমন কবিতা লেখে বলা যায়, কবিতা পড়বারও দরকার হয় না? এ কি ম্যাজিক নাকি?

তোমার তাই মনে হবে। তোমার কাছে কবি আর কবিতা ভিন্ন। কবি একরকম হলেও কবিতা অন্যরকম হতে পারে। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির মিল থাকবে এমন কোন কথা নেই।

আমাকে নিয়ে আপনি আবোল তাবোল বকছেন। কে আপনাকে বললে যে আমি মনে করি কবি আর কবিতায় সম্পর্ক নেই? আমি মোটেই তা মনে করি না।

তুমি নিজেই বললে কবির বিচার করা গেলেও কবিতার কোনরকম বিচার করা যায় না। কবিকে জেনেও জানা যায় না তার কবিতা কোন ধরণের।

নবীন যেন হঠাৎ স্বস্তি বোধ করে। তার মুখে মৃদু একটু হাসিও দেখা যায়।

তাই বলুন। আপনি আমার কথাটাই বুঝতে পারেন নি। আপনি যদি বলতেন কবিকে কবি হিসাবে জানতে চিনতে পারলে সে কি ধরনের কবিতা লেখে আন্দাজ করা যায়, আমি কথাটি না কয়ে আপনার কথা মেনে নিতাম। আপনি

বলছেন, এমনি চেনা পরিচয় করছি।
করছি বলেই আপনি যেন আমার সম্রকাব্য নিয়ে তোমার একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে।
মানুষ হয়েছি, আপিসের বাইরে কি ভাবেনিয়ে।
খেতে ভালবাসি জানেন? আপিসের বাই
খবর রাখেন?

সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা স্থনীল
প্রায় স্থনীলের মতই ধীর শান্ত ভাবে একটা সিগারেট আমায় ডিষ্টার্ব করব না। সময়

সে যেন সমবয়সী অন্তরঙ্গ বন্ধু এমনি অমায়িকভ,
ব্যাবাম হয়েছে জানেন? আপনার হয়েছে গুরুজন কম্‌প্লেক্‌স।
গুরুজন হতে চান। অবতারেরা যেভাবে জগতের গুরু হয়েছিলেন, আপনার ে
ভাবে গুরুজন হবার সাধ্য নেই। আপনি তাই চাকরী করতে করতে যতখানি
গুরুজন হওয়া যায় সেই চেষ্টা করছেন।

স্থনীল নিশ্বাস ফেলে বলে, নবীন, তোমাকে শুধু একটা প্রশ্ন করব। সোজা
স্পষ্ট জবাব দিও। তুমি তো বললে আপিসে ঘরে বাইরে তোমার অনেক গুরুজন।
আমার সঙ্গে যে ভাবে কথা বল তর্ক কর আর কোন গুরুজনের সঙ্গে সেটা তোমার
চলে কি?

নবীন চুপ করে থাকে।

স্থনীল বলে, এখনো পাকা হও নি। আমি ইচ্ছা করলে তোমায় বিদায় দিতে
পারি, অঘোরবাবু ইচ্ছা করলেই পারেন। এক বছর চাকরী করছ। আমার সঙ্গে
প্রায় রোজ তর্ক কর। অঘোরবাবুর সঙ্গে সামনাসামনি মুখোমুখি জোর গলায় তুমি
কদিন কথা বলেছ নবীন? আমি রিপোর্ট দিয়েছি তুমি খুব ভাল কাজ করছ,
তোমাকে এবার পারমানেণ্ট করা উচিত। অঘোরবাবু কাউকে পারমানেণ্ট করছেন
না—আটজনকে বিদায় দিয়েছেন। আমিও তোমার গুরুজন, অঘোরবাবুও তোমার
গুরুজন। আমার সঙ্গে রোজ তর্ক কর, আমাকে রোজ নস্যাৎ করে দিতে চাও—
অঘোরবাবুর সঙ্গে একদিন তর্ক করার সাহস হয় না কেন তোমার? অঘোরবাবু

অনুমতি চাই না, কবিতা না পড়েও আমার ণী বলে তর্ক করতে দিয়ে আমি করলেন জানতে চাই। কবিতা না পড়েই ম

সুনীল হাসে। সে হাসি শূলের মত কেরে না, শুধু চুপ করে থাকে।

সুনীল সিগারেটটা ধরিয়ে বলে, প্রা দ গুছিয়ে নিয়ে তার ইংরাজীতে লেখা বাংলা শুনলাম জানলাম বুঝলাম। কবি ত আরম্ভ করার আগে সুনীল বলে, নবীন, কাল কবিতা লেখে? ধান গাছটাকে বলবে না। আপিসের কাজের জন্য দরকারী কথা পারব না এ গাছে ধান ছাড়া বলবে না। এটা গুরুজনের হুকুম নয়—অনুরোধ।

নবীন যেন স্তম্ভিত — টাইপ করে যায়।

আপনি ঙুলগুলির দ্রুত স্বচ্ছন্দগতির দিকে চেয়ে নবীন অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে, হঠাৎ বলে, কি দোষ করলাম?

সুনীল যেন শুনতেও পায় না।

নবীন রেগে বলে, বেশ। তাই হোক। আমি কিন্তু এ জীবনে আপনার সঙ্গে আর কথা কইব না। আজ কত বড় অন্যায় করলেন একদিন নিশ্চয় বুঝবেন। সেদিন ক্ষমা চাইলেও কথা কইব না।

সুনীল ফিরেও তাকায় না। রাগে নবীন থরথর করে কাঁপছিল। তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের সুরে বলে, আচ্ছা, নমস্কার! গুড ইভনিং! রাম রাম!

টাইপ করা বন্ধ রেখে সুনীল একটু ভাবে। নবীনের বেয়াদপি তাকে মোটেই বিচলিত করেনি। গায়ের জ্বালায় তার ওরকম ঝাঁঝালো কিন্তু সস্তা বিদ্রূপ করাটাই প্রমাণ করেছে যে নবীন এখনো ছেলেমানুষ।

এটা সে কি হিসাবে ধরেনি? এটা বিবেচনা না করেই তার অন্ধ আত্মপ্রীতি আর একগুঁয়েমির জন্য কথা বন্ধ করার সাজা দিয়েছে?

তা হোক। এখন ছেলেমানুষী কাটিয়ে ওঠার সময় হয়েছে নবীনের। ভাবপ্রবণতা কাটিয়ে ওঠাই তার উচিত।

অঘোর নীচে নামবার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে, এখনো কাজ করছ?

আমার একটা প্রবন্ধ টাইপ করছি।

ও, হ্যাঁ। বিভা বলেছিল, রবীন্দ্রকাব্য নিয়ে তোমার একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। খুব নাকি তর্কাতর্কিও চলেছে প্রবন্ধটা নিয়ে।

নতুন কথা বললে তর্ক উঠবেই।

এ প্রবন্ধটা কি নিয়ে লিখছ?

আধুনিক কবিতা সম্পর্কে।

আধুনিক কবিতাও পড় নাকি তুমি? যাক্, তোমায় ডিস্টার্ব করব না। সময় পেলে একদিন যেও।

যাব।

অঘোর ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। চুলে কিছুটা পাক ধরেছে। মানুষটার ধীর শান্ত এবং প্রায় নির্ব্বিকার ভাব দেখে কল্পনা করাও কঠিন যে কতখানি কঠোর আর নিষ্ঠুর সে হতে পারে দরকার পড়লেই। শাস্তি পাওয়ার যোগ্য অপরাধ করে এ আপিসের কেউ ক্ষমা বা অল্পে রেহাই পেয়েছে এরকম একটি দৃষ্টান্তও কেউ স্মরণ করতে পারে না।

অপরাধ কেন, তার কাছে অনিচ্ছাকৃত ভুলেরও ক্ষমা নেই, ভুলের ফলটা অবশ্য যদি তার পক্ষে কোনদিক দিয়ে ক্ষতিকর হয়।

মানুষের ভুল করার অধিকার সে স্বীকার করে না। তার মতে, ভুল হয় অবহেলার জন্য। যে ভুলের জন্য বিশেষ কিছু আসে যায় না, শুধরে নিলেই চলে, সে ভুল সে উদার ভাবে ক্ষমা করে।

সুনীল ছাড়া কেউ জানে না যে তার বিদ্যাবুদ্ধিকে কিম্বা মেয়ের অনুরোধকে খাতির করে অঘোর তাকে চাকরী দেয় নি, কঠোর সততা বলে জিনিষটা তার চরিত্রের স্বাভাবিক গুণ এটা টের পেয়ে তাকে চাকরী দিয়েছে।

অঘোরের সৎ-অসতের বিচারের মাপকাঠি, লাভ আর লোকসান। তার তাই এরকম দু'একজন লোকের প্রয়োজন আছে যাদের সম্পর্কে এক বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত

থাকতে পারবে যে তার নিজেরও সাধ্য হবে না ওদের দিয়ে মিথ্যা বলায় চুরি-চামারি ছলনা করায় বা কারো বিশ্বাস ভাঙ্গায়।

সুনীলকে কাজ দিয়ে শুধু একবার বলে দিলেই হল এটা গোপনীয়। গুরুতর বিষয়টা যে গোপনই থাকবে সে বিষয়ে তারপর আর মনের মধ্যে এতটুকু খুঁতখুতানি রাখবারও দরকার হয় না।

সুনীলের মত লোক না রাখলে কাজটা তার নিজের করা ছাড়া উপায় থাকে না।

অবশ্য মূল্য দিতে হয়। সুনীল তাকে খাতির করে না, ভয়ও করে না। সে যে তার চাকরী রাখার, চাকরী খাবার মালিক এটা যেন গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না সুনীল।

তাছাড়াও আরেকটা অসুবিধা আছে। ব্যবসার নীতিতে না হলেও সাধারণ নীতির বিচারে যেটা দুর্নীতির পর্য্যায়ে পড়ে, সুনীলকে দিয়ে সে কাজ করানো যায় না। অথচ ব্যবসা করতে গেলে ওরকম বিচারও চলে না।

এ দোষটা যদি না থাকত সুনীলের, তার ব্যবসাগত স্বার্থের বেলাতে নীতিরোধটা ঢিল দিতে পারত, আরও কত উঁচু আসনে অঘোর তাকে নিজেই তুলে বসাত!

কিন্তু অঘোর জানে তা হয় না। যে তাকে খাতির করবে ভয় করবে, পয়সার জন্য নিজের ন্যায় অন্যায়ের বিচার শিকেয় তুলতে পারবে, তার সততা কিছুতেই টেঁকসই হবে না সুনীলের মত।

তার বিশ্বাস রাখার বেলা লোহার মত শক্ত হবে আর অন্যদিকে হবে তার মনের মত—এরকম মানুষ সে পাচ্ছে কোথায়?

অগত্যা সুনীলকেই রাখতে হয় তার নম্রতার অভাবটা মেনে নিয়ে।

সুনীল বাড়ী ফিরলে আল্পনা মুখ ভার করে বলে, তুমি নাকি বিনা দোষে নবীনের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছ?

বিনা দোষ দিই নি, দোষ ছিল বলেই দিয়েছি।

কি দোষ করেছে? তোমার কথা মানে নি, এই তো?

ও নিজের দোষ দেখতে পায় না, অন্যকে দোষ দেয়, এটাও ওর একটা মস্ত দোষ। একগুঁয়ের মত নিজের মত আঁকড়ে থাকে, অন্যের মত উড়িয়ে দেবার জন্য তর্ক করে, আবার ছ্যাবলার মত রেগেও যায়। এইজন্য কথা বন্ধ করেছি।

আল্পনার মুখ ভার কমে না।

সে বলে, নিজের মত, নিজের ধারণা জোরের সঙ্গে বলা কি দোষ? নিজে যেমন জানবে বুঝবে তাই তো মানবে মানুষ।

তা মানবে, সেটা দোষ নয়। কিন্তু অন্যের কথা কিছুতেই জানব না বুঝব না মানব না—এই একগুঁয়েমিটা মস্ত দোষ।

আল্পনা তবু হার না মেনে বলে, তুমি বুঝিয়ে দিতে পার না তাই বোঝে না, এটাও তো হতে পারে?

সুনীল বলে, হতে পারে বৈকি। সেটা আলাদা কথা। আমার কথা বুঝতে পারে না বলে তো আমি কথা বন্ধ করি নি। ওর বুঝবার ইচ্ছা নেই চেষ্টা নেই—গায়ের জোরে সব কথা উড়িয়ে দেবে। এ ঝোঁকটা খুব খারাপ।

সুনীলের পক্ষ নিয়ে এবার আর আল্পনা কোন যুক্তি তর্ক খাড়া করতে পারে না, সে শুধু বলে, ওর মনে ভয়ানক আঘাত লেগেছে।

সুনীল বলে, তাতে ক্ষতি নেই। ছেলেমানুষী ঝোঁকটা কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করবে।

৭

নন্দার খবরের কাগজের বেশ খানিকটা দায় যে শেষ পর্য্যন্ত সুনীলের ঘাড়ে চাপবে কে তা ভাবতে পেরেছিল।

তার দায় ছিল কেবল নন্দাকে মোটামুটি ইংরাজী শেখানো—এমন পাণ্ডিত্য দান করা নয় যাতে দরকার হলে খসখস করে যে কোন বিষয়ে একটা লাগসই সম্পাদকীয় লিখে ফেলতে পারবে।

অন্যের লেখা পড়ে মোটামুটি মানে বুঝতে পারবে, একটা ইংরাজী কাগজ চালাবার আনুষঙ্গিক ব্যাপার ও কাগজপত্রগুলি নিজে ঘেঁটে আয়ত্ত করতে পারবে এইটুকুই ছিল নন্দার দাবী।

নন্দাকে পড়াতে পড়াতে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে তার কাগজে একটা গুরুগম্ভীর সাহিত্যিক প্রবন্ধ লিখে ফেলা থেকে, ক্রমে ক্রমে ছোট বড় আরও লেখা দেওয়া এবং সেই সূত্রে কাগজটার আপিসে যাতায়াত ক্রমে ক্রমে বেড়ে যাওয়া ও সংবাদ ও মন্তব্যের এটা ওটাতে মাঝে মাঝে চোখ বুলানো—এসব কিছুই অসাধারণ ঘটনা ছিল না।

কেউ আশ্চর্য্যও হয় নি।

পেটে বিদ্যা আছে, ভাল ইংরাজী লিখতে পারে—অন্য একটা আপিসে চাকরী করতে করতেও সে একটা ইংরাজী সংবাদপত্রে লিখবে এবং পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবে এ পর্য্যন্ত সকলে হজম করেছিল অনায়াসেই। কিন্তু একটা আপিসে চাকরী করতে করতে সে যে কাগজটার সম্পাদকীয় দায়িত্বই একরকম গ্রহণ করে বসবে, একটা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি!

একটা বিশেষ ঘটনার পর এটা ঘটে।

কাগজটার সম্পাদনা করে নিখিল, কিন্তু সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হয় প্রদ্যোতের।

একটা উদ্ভট সম্পাদকীয় ছাপা হবার দায়ে প্রদ্যোতকে কিছুদিনের জন্য জেলে যেতে হয়।

সে এক অদ্ভুত খাপছাড়া ঘটনা।

যে সম্পাদকীয় ছাপানোর জন্য প্রদ্যোতের জেল হল, সেদিন সকালে কাগজটি বার হলে সম্পাদকীয় পড়ে সকলেই প্রায় চমকে গিয়েছিল!

সুনীল ভেবেছিল, মাথা কি খারাপ হয়ে গিয়েছে নিখিলের? এতো জার্ণালিজম নয়—এতো স্রেফ উন্মত্ততা! খুব কড়া, খুব গরম সম্পাদকীয় লেখারও একটা কায়দা আছে, এ লেখায় সমস্ত কায়দা গিয়েছে বাদ, উন্মাদের প্রলাপ দিয়ে প্রাণপণে শুধু চেষ্টা করা হয়েছে লেখাটাকে ভয়ানক রকম বেআইনী করে তোলা।

নন্দাকে পড়াতে গিয়ে ছাখে, সমস্ত বাড়ীটা যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। সুনীলের বাড়ীর ভেতরে যাবার আহ্বান আসে। ভেতরের একটা ঘরে নন্দা, শচীন, প্রদ্যোত আর অনুকূল বসে জটলা চালাচ্ছেন।

অনুকূল ব্যারিস্টার।

শচীন জিজ্ঞাসা করে, কাগজ পড়েছ আজকের? এডিটোরিয়াল?

পড়লাম বৈকি! এটা কি ব্যাপার হল হঠাৎ?

আমরাও তাই বুঝবার চেষ্টা করছি।

অর্থাৎ ওটা প্রদ্যোতের লেখা নয়?

নন্দা বলে, এতকাল পরে আপনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। দাদার নামটাই শুধু সম্পাদক হিসেবে ছাপা আছে জানেন না? দাদা কখনও সম্পাদকীয় লেখে নাকি!

এই সব রিস্কের জন্যই মাইনে করা সম্পাদকের নাম ছাপা রীতি।

নন্দা হেসে বলে, দেখুন না দাদার পাগলামি। নিখিলবাবুকে মাইনে দিয়ে

রেখেছি, ওর নামটা কোথায় ছাপা থাকবে, এসব ঝন্‌ঝাট ওঁর উপর দিয়েই যাবে—দাদার সখ হল, না, সম্পাদক হিসাবে ওর খ্যাতি চাই।

প্রদ্যোত মৃদু হেসে বলে, খ্যাতি না ছাই। তোমরা তো মুলো হয়ে থাকো, নিখিলবাবুটি কি চিজ খবর রাখো না। কবে কর্তাভজা সস্তা কিছু ছেপে দেবেন, এই ভয়ে আমি সম্পাদক হয়েছি।

সুনীল জিজ্ঞাসা করে, নিখিল বাবু আসেন নি?

নিখিল বাবু পরশু বাইরে গেছন—পুরীতে। কাল পরশুই ফিরে আসবেন।

সুনীল বলে, বেশ ব্যাপার তো! নিখিলবাবু দুদিনের জন্য বাইরে গেছেন অমনি এরকম একটা লেখা ছাপা হয়ে গেল! কাগজ দেখবার—অন্ততঃ এডিটোরিয়ালটা দেখবার কেউ ছিল না? এটা লিখল কে?

সেটাই সমস্যা দাঁড়িয়েছে। কেউ দায়িত্ব নিতে চাচ্ছে না। শিশিরবাবু চার্জে ছিলেন, তিনি বলছেন, এটা নিখিলবাবুর লেখা হিসাবেই তিনি ছাপিয়ে দিয়েছেন। টাইপ করা লেখা আজকের তারিখ টারিখ দিয়ে রেডি করা ছিল।

টাইপ কপিটা পাওয়া গেছে?

প্রদ্যোত মাথা নাড়ে।

শিশিরবাবু বলছেন তিনি প্রুফের সঙ্গে প্রেসে ফেরত পাঠিয়েছেন, প্রেস বলছে, কপি প্রুফের সঙ্গে শিশিরবাবুর কাছে পাঠান হয়েছিল, প্রুফ ফেরত গেছে, কপি ফেরত যায় নি।

তারপর সুনীল কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ওদের পরামর্শ শুনতে শুনতে এখন সমস্যাটা কি দাঁড়িয়েছে সহজেই ধরতে পারে।

সম্পাদকীয়টি প্রত্যাহার করা হবে কিনা এই হল সমস্যা।

অনুকুল আগেও বলেছিল, এখন আরেকবার বলে যে কালকের কাগজে যদি পাইকা হরফে বর্ডার দিয়ে স্পষ্ট পরিষ্কার করে ছাপিয়ে দেওয়া যায় যে এই লেখাটি ভুল করে ছাপা হয়েছে, এটি প্রত্যাহার করা হল—সমস্ত হাঙ্গামা মিটে যাবে। গরম হলেও, এতদিন কাগজটিতে যে সুর অনুসরণ করা হয়েছে সেজন্য কর্তাদের বিরক্তি

থাকলেও বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। আচমকা একদিন শুধু অবিশ্বাস্য রকম বেখাপ্পা, উদ্ভট নয় একেবারে মারাত্মক রকম গরম একটা সম্পাদকীয় বেরিয়ে গেছে বলেই হাঙ্গামা করার সুযোগ নেওয়া হবে না।

কিন্তু ত্রুটি স্বীকার করা চাই—বলা চাই যে ভুল হয়েছে। পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় সেটা ছাপাতে হবে। লেখাটি প্রত্যাহার করা চাই।

প্রদ্যোত সোজাসুজি বলে, তা হয় না। অন্যসময় হলে করা যেত, এখন করা যায় না।

সুনীল বলে, লেখাটা তো ভুল করে ছাপা হয়েছে। হয় তো কারো ষড়যন্ত্রের ফলে ছাপা হয়েছে।

ষড়যন্ত্র ?

তাই তো মনে হচ্ছে আমার! নইলে ঠিক এরকম যোগাযোগের সময় লেখাটা বাপমাহীন অবস্থায় এভাবে ছাপা হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে ? ভুল স্বীকার করতে তো কোন লজ্জা নেই !

প্রদ্যোত বলে, লজ্জার কথা নয়। লোকে ধরে নেবে যে এটা আমাদের ভয়—যেমন আমারা কাছাখোলা তেমনি আমরা ভীরু। আমাদের কাগজে, আমাদের অজান্তে এডিটোরিয়াল পর্য্যন্ত বেরিয়ে যায়, আবার কড়া কথা লেখার জন্য আমরা হাত জোড় করে কর্তাদের কাছে ক্ষমাও চাই। এর একটা হতে পারে—দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না। হয় আমাদের অব্যবস্থা হয়েছে—নয় আমরা ভুল করে গাল দিয়েছি। গাল আমরা দিয়েছি ঠিকই, আরও খানিক দিলে হত। ওটাই বজায় থাক—আমাদের অব্যবস্থাটা সংশোধন হোক।

সকলে চুপ করে আছে দেখে প্রদ্যোৎ নন্দার দিকে চেয়ে আবার বলে, একজন সর্ব্বস্ব দিয়ে জীবনপণ করে একটা কাগজ চালিয়ে গিয়েছিল—আমরা সেটা শুধু চালাচ্ছি, আমাদের সম্পত্তি হিসাবে।

শচীনের দিকে চেয়ে বলে, নন্দা তোমার মেয়ে না হলে, আমার বোন না হলে, সব কিছু দিয়ে এই কাগজটা করে সে বেচারা মরে না গেলে, আমরা কোন দাম

দিতাম এই কাগজটার? কিন্তু সত্যি সত্যি একটা কাগজ কি কম দামী জিনিষ! কতলোকের পয়সা চিন্তা খাটুনি আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়ে একটা খবরের কাগজ চলে, দেশের মানুষের ভালমন্দের কত বড় দায়িত্ব থাকে কাগজের। খবরের কাগজ মানেই সকলের কাগজ। কোন দেশে খবরের কাগজ কোন একজনের সম্পত্তি হলেই সে দেশের সর্ব্বনাশ।

একটু থেমে বলে, সর্ব্বনাশ আগে থেকে থাকলে সেটা ঠেকাতেই হবে, দূর করতেই হবে।

শচীন বলে, তুমি কি এতদিন ঘুমোচ্ছিলে?

প্রদ্যোত নির্ব্বিকারভাবে বলে, ঘুমোচ্ছিলাম বৈকি। ঘুমটা সবে ভাঙছে, হাইমুড়ি তুলছি। নইলে কর্তাভজামি ঠেকাতে সম্পাদক হিসেবে নামটা ছাপাবার তোড়জোড় করলাম—কি ছাপা হচ্ছে সেদিকে তাকাবার অবসর পাই না!

চা এসে গিয়েছিল।

অনুকুলের স্পেশাল চায়ের সঙ্গে সাতান্ন বছুর বয়সে সে যা চায় তাই তাকে দেওয়া হয়েছে। অনুকুলকে তারা ঘনিষ্টভাবেই জানে।

অনুকুলও যে তাদের ঘনিষ্টভাবে জানে তার পরিচয় পাওয়া যায় কয়েক মিনিট পরেই।

চা-টা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে অনুকুল বলে, যাকগে, যাকগে।

কি যাকগে?

একটা কাগজের একটা দিনের একটা এডিটোরিয়াল! তাতেই যেন জগৎ উল্টে-পাল্টে যাবে। তোমরা যদি এক কাজ কর প্রদ্যোত, এটা আপনা থেকে চাপা পড়ে যাবে।

প্রদ্যোত স্নিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করে, কি কাজ?

কাগজটা বার করে এ পর্য্যন্ত তোমাদের কত লাভ হয়েছে তার একটা হিসেব কাগজে ছাপিয়ে দাও।

নন্দা উৎফুল্ল হয়ে বলে, দেব, কালকের কাগজেই দেব। এতো সোজা কাজ।

ফাঁকি থাকলে কিন্তু ধরে ফেলবে।...

বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে অনুকূল বলে।

আমাদের হিসেবে ফাঁকি থাকে না। ঘরের পয়সা ঢেলে কাগজ চালাই, হিসেবে ফাঁকি থাকবে কি রকম? যারা কাগজ থেকে মোটা লাভ করছে, তারা হিসেবে ফাঁকি দেবে?

তবু সেই একটি এডিটোরিয়াল ছাপা হবার দায়ে প্রদ্যোত জেলে গেল। তাকে অনেক সুযোগ দেওয়া হল ওই লেখাটার নিন্দা করে জেলে যাওয়া ঠেকাবার—সে বলল কি যে, তা হয় না, আমি ব্যাপার বুঝেছি, আমার জেলে যাওয়া ঠেকানোর জন্য তোমরা দাঁড়াও নি—আমাকে দিয়ে কর্তাদের জয়গান করিয়ে আমাকে ছেড়ে দেবার ফিকিরে দাঁড়িয়েছ।

সুনীলকে সে বলে, একটা দায়িত্ব নিতে পারবেন? খুব গুরুতর ব্যাপার।

ভূমিকা শুনেই অনুমান করছি।

আচমকা লেখাটা ছাপা হবার পিছনে ব্যাপারটা কি একটু খোঁজ নেবেন?

সুনীল ধীরভাবে বলে, আগে ওই রহস্যটাই ভেদ করার চেষ্টা করছি। বেশী কঠিন হবে মনে হচ্ছে না। খানিকটা ইতিমধ্যেই অনুমান করা সম্ভব। স্বার্থঘটিত ব্যাপার তো, সুতো টানলেই সব বেরিয়ে আসে।

দায়িত্ব নিলেন?

নিলাম।

প্রদ্যোত বলে, যাক, খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে জেলে যেতে পারব। ওই একটা ভাবনা ছিল আমার—আসল মতলবটা যার, সে না বাজী মেরে বসে।

নন্দা উপস্থিত ছিল। কিন্তু দু'জনের কথা হেঁয়ালির মত মনে হয় তার।

পরে সে সুনীলকে হেঁয়ালির মানে জিজ্ঞাসা করে।

সুনীল বলে, হেঁয়ালি কিছুই নয়—হঠাৎ যে এডিটোরিয়েলটা ছাপা হয়ে গেল তার একটা কারণ তো থাকবে? কেউ কোন একটা মতলব নিয়েই ওটা ছাপিয়েছে নিশ্চয়। সে মতলবটা কি, কে সেটা খাটাবার চেষ্টা করছে—এদিকে একটু নজর রাখতে বলছিল আপনার দাদা।

নন্দা বলে, মতলব? কিসের মতলব? দাদাকে জেলে পাঠানো?

সুনীল বলে, না, ওকে জেলে পাঠানো আসল উদ্দেশ্য মনে হয় না। উনি সম্পাদক থাকবেন না, এটাই ভদ্রলোক চাইছেন মনে হচ্ছে। উনি সম্পাদক থাকায় ভদ্রলোকের অসুবিধে হচ্ছিল।

নন্দা মুখ কালো করে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে।

নিখিলবাবু?

আমি তাই সন্দেহ করছি।

না না, নিখিলবাবু সেরকম লোক নন্। এরকম লেখা কখনো ওঁর হাত দিয়ে বেরোতে পারে না।

অন্যের নামে ছাপা হবে জেনেও নয়?

নন্দা চুপ করে থাকে।

সুনীল আপিস থেকে সোজা প্রেসে চলে যায়।

কাগজের নিজস্ব প্রেস নয়, সুধীন সরকার নামে আবগারী বিভাগের একজন পদস্থ, পেনসন প্রাপ্ত ভদ্রলোক, প্রেসটার মালিক। প্রেসটা আরম্ভ করেছিল আরেকজন ভদ্রলোক, যার ছিল সাংঘাতিক রকম নেশার বাতিক। নেশার খাতিরেই প্রেসটা তাকে বেচে দিতে হয়, একেবারে জলের দামে।

সুধীন এমনি কোন নেশা করে না, কিন্তু দাও মারার নেশাটা তার চিরদিন প্রবল। কোথায় বিপদে পড়ে কার কি সম্পত্তি নীলাম হচ্ছে কম দামে, কোথায় কোন জিনিষটা সস্তায় বিকিয়ে যাচ্ছে, শকুনের শব-খোঁজার মতই তার চোখ সর্বদা দাও খোঁজে।

দাঁওটা শেষ পর্য্যন্ত লাভজনক হবে না বোঝা হয়ে উঠবে এসব হিসাব সে করে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে দামী কিছু সস্তায় পাওয়া মানেই কিস্তি মাৎ করে দেওয়া।

নন্দার কাগজটা ছাপা না হলে প্রেসটা তার চালু রাখা সম্ভব হত না, অনেকদিন আগেই তুলে দিতে হত।

তাই সুধীন সরকার মালিক হলেও কাগজটা চালাবার দায়িত্ব যাদের, তাদেরই প্রেসের লোক মালিক মনে করে।

আগেকার ব্যবস্থাই সব বজায় আছে, সম্পাদক হিসেবে নামটাও ছাপা হচ্ছে প্রদ্যোতের—সবাই কেবল টের পেয়েছে যে, কাগজ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে কর্তালি পেয়েছে সুনীল।

সে যা বলবে তাই হবে। তার কথার উপরে আর কোন কথাও নেই, কারো কাছে নালিশও নেই।

নিখিল দেশ থেকে ফিরেছিল যথাসময়েই। বদখত এডিটোরিয়েলটা ছাপানো নিয়ে সেও হৈ চৈ কম করে নি। কিন্তু সুনীলকে কর্তৃত্ব নিতে দেখে সে অত্যন্ত আহত হয়।

শচীনকে সে ক্ষুব্ধভাবে বলে, এই ছেলেমানুষেরা কতটুকু জানে কাগজ চালানোর ব্যাপার? কোনদিন কাজ করেছে কোন কাগজে?

শচীন বিব্রতভাবে বলে, ও খুব কাজের মানুষ, পাকা লোক।

নিখিল বলে, ওকেই সব করে দিচ্ছেন নাকি—ম্যানেজার, এডিটর?

শচীন বলে, আপনি ভুলে যাচ্ছেন কাগজটা আমার মেয়ের, আমি কাগজের মালিক নই।

শচীনের কাছে নিখিলের কথা শুনে নন্দা গম্ভীরমুখে বলে, ওঁর গা জ্বালা করছে কেন? সুনীলবাবু তো ওঁর কোন ক্ষতি করেন নি, ওঁর কাজেও ব্যাঘাত জন্মান নি।

শচীন বলে, অনেকদিন থেকে ভদ্রলোকের সম্পাদক হবার আশা।

তুমিও সে খবর রাখো?

এ আর খবর রাখারাখি কি? এখন নামেই সম্পাদক—কাগজে নামটা ছাপা হলে বাজারে দাম বাড়বে। দরকার হলে অন্য কাগজেও যেতে পারবেন।

নন্দা বলে, এবার বুঝেছি ব্যাপারটা। ভদ্রলোক টের পেয়েছিলেন কাগজটা তোমারও বোঝা হয়ে উঠেছে—তুমিও দায় এড়াতে চাও। একটা গোলমাল হলে সব জেনে বুঝেও তুমি চুপ করে থাকবে—কাগজটা উঠে যায় তো যাক্। তাই এমন সস্তা চাল চালতে সাহস হয়েছে নিখিলবাবুর।

শচীন আহত হয়ে বলে, বুড়ো হলাম, আমার কি এত ঝন্ঝাট পোষায়?

তবে দায়িত্ব নাও কেন?

স্থনীল নিখিলকে বলে, আজ একটা কড়া লেখা চাই নিখিলবাবু।

কিরকম কড়া?

বেশ খানিকটা কড়া। কালোবাজার কিম্বা সরকারী তুর্নীতি—তুটোর যে কোন একটা সাবজেক্ট নিতে পারেন।

নিখিল একটু ভেবে বলে, গাল দেব?

পারলে দেবেন, আইন বাঁচিয়ে। মোটকথা আমার খুব কড়া লেখা চাই।

একঘণ্টার মধ্যে পিয়ন নিখিলের লেখাটা স্থনীলের কাছে পৌঁছে দেয়। শ্লিপ ক'খানায় চোখ বুলোতে বুলোতে স্থনীলের মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে না, কিন্তু পড়া শেষ করে সে প্রায় মিনিট দশেক গুম খেয়ে বসে থাকে।

তারপর নিজেই নিখিলের বসবার ঘরে যায়।

ধরতে গেলে নিখিলও কার্যত সাবএডিটার। কিন্তু অল্পবয়সী সাবএডিটরদের মধ্যে এতদিন সে সম্মান পেয়ে এসেছে এডিটরের।

স্থনীল বলে, নিখিলবাবু, এই নাকি আপনার গরম লেখা? কড়া লেখা আপনার বোধহয় আসে না, না?

এর চেয়েও কড়া?

নিখিল যেন আশ্চর্য হয়ে যায়।

সুনীল বলে, এ লেখা কি কড়া হয়েছে? ভূপেনবাবু, দেখুন তো পড়ে। আপনার মতটা শুনি।

ভূপেন তাড়াতাড়ি স্লিপ ক'খানা পড়ে বলে, পয়েণ্ট মোটামুটি সব আছে, তবে ভাষাটা নরম হয়ে গেছে।

সুনীল বলে, আমারও তাই মনে হচ্ছিল। আগে মোটে একটা দুটো কাগজ পড়তাম, বুঝতাম না। আজকাল অনেকগুলি কাগজে চোখ বুলিয়ে দেখছি— ভাষার কায়দাটাই যেন আসল ব্যাপার। কি বলা হচ্ছে তার চেয়ে বলার ভঙ্গিটা দিয়েই যেন কাগজের পলিশি বজায় রাখার চেষ্টা হচ্ছে। আপনি ঠিক বলেছেন। নিখিলবাবুর এ লেখাটায় সব কথাই আছে—ভাষার জন্য আসল কথা ছোট হয়ে, ছোট কথা গুরুত্ব পেয়েছে।

ভূপেন খুসী হয়ে হাসে।

সুনীল বলে, আপনি একবার চেষ্টা করে দেখবেন, গরম করতে পারেন নাকি? আমি খুব গরম লেখা চাইছি। আপনি যত পারেন কড়া করে দিন, আমি দরকার মত ঘষে মেজে নেব।

সুনীল চলে গেলে ভূপেন ও নিখিল মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

শৈলেশ নতুন এসেছে, সে জিজ্ঞাসা করে, হাত বদল করে কি লেখা ভাল হয়?

খবরের কাগজে আবার ভাল লেখা!

রাত দশটায় ভূপেন লেখা নিয়ে সুনীলের ঘরে গেলে সুনীল তাকে বসতে বলে। একটা সিগারেট দেয়।

ধীরে ধীরে তার লেখাটা পড়ে মুখ তুলে বলে, ভূপেনবাবু, নিখিলবাবুকে আমি বিদায় দিচ্ছি। ওঁকে দিয়ে আর দরকার নেই।

ভূপেনের মুখ একটু পাংশু হয়ে যায়।

সে আমতা আমতা করে বলে, কড়া লেখা অবশ্য ওনার ভাল আসে না কিন্তু—

সুনীল বলে, কড়া লেখা আসে না বলে নয়। উনি সেই লেখাটা ছাপিয়ে দেবার চক্রান্ত করেছিলেন বলে। আপনার সম্পর্কে কি করা যায় ভাবছি।

ভূপেন চুপ করে থাকে।

সুনীল বলে, আপনি ওর কথায় রাজী হলেন কেন? আমায় সব খুলে বলুন। এবারের মত আপনার ফাঁড়া কাটিয়ে দিচ্ছি—পরে যেন আর কখনো এরকম করবেন না। এভাবে মানুষের উন্নতি হয় না।

ভূপেন ধীরে ধীরে বলে, আমাকে নিখিলবাবু যা ছাপতে বলবেন, আমি তাই ছাপতে বাধ্য।

সেটা গোপন করতেও কি বাধ্য?

উনি বললে খানিকটা বাধ্যতা এসে যায়।

সুনীল মুখের ভাব কঠিন করে বলে, শুধু ওঁর বলার জন্য? আর কিছু কারণ ছিল না?

ভূপেন একটু ভেবে বলে, ছিল। আমি—আমি ওঁর ভাগ্নীকে বিয়ে করেছি। উনি বলেছিলেন এডিটর হলে আমায় সুবিধা করে দেবেন।

ভূপেন ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকায়।

আপনাকে একটা কথা বলি। প্রদ্যোতবাবুর জেল হবে এসব উনি ভাবেন নি। উনি আমায় বলেছিলেন যে এরকম একটা লেখা বেরিয়ে গেলে হৈ চৈ হবে, তাতেই ভয় পেয়ে প্রদ্যোতবাবুর নাম সরিয়ে নিয়ে ওঁর নাম এডিটর হিসাবে বসানো হবে। একদিন একটা খারাপ লেখা বার হলে সামলানো কঠিন নয়।

প্রেষ্টিজ নষ্ট হয়।

প্রদ্যোতবাবু কি প্রেষ্টিজের জন্য জেলে গেলেন?

তা বৈকি। তার নিজের প্রেষ্টিজ, কাগজের প্রেষ্টিজ। আইনে বাধুক, কথাগুলি তো মিথ্যা লেখা হয় নি। না লিখলে আলাদা কথা ছিল কিন্তু একবার ছেপে বেরিয়ে যাবার পর কথাগুলি আর ফেরত নেওয়া যায় না।

দশ মিনিটের মধ্যে স্নীল দু'মাসের বেতন এবং বরখাস্ত পত্রখানা নিখিলের হাতে দেয়।

নিখিল বলে, তুমি আমাকে তাড়াতে পার না।

স্নীল বলে, নিশ্চয় পারি। আমাকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে—লিখেই দেওয়া হয়েছে।

ফেরার পথে নন্দাকে সব জানিয়ে স্নীল বাড়ী ফেরে।

নন্দা বলে, সকালবেলা নিখিলবাবু একবার দরবার করতে আসবেন। দয়া হলে দয়া দেখাব?

স্নীল বলে, দয়া নয়। জগাই মাধাই ছাড়া দয়ায় কেউ উদ্ধার পায় না। হিসাব করে দেখবে ওঁকে আর রাখা চলে কিনা। যদি মনে কর যে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর এসব চালাকিবাজির দিকে ঝুকবেন না—তাহলে এবারের মত ক্ষমা করতে পার।

নন্দা মাথা নাড়ে।

আমি ক্ষমা করতে পারি না। আমি আপনাকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করতে পারি।

এই তো শিখে গিয়েছ কায়দাকানুন!

শিখে গিয়েছি বলে সরে যাবেন না যেন। এটাও শিখেছি যে আমার এখনো অনেক শেখা বাকী। যে দায় নিয়েছেন সেটা আর ফেলতে পারবেন না কিন্তু—অন্ততঃ যদ্দিন আমি সব শিখে পড়ে না নিচ্ছি।

স্নীলের বাড়ী ফিরতে রাত বারটা বেজে যায়।

মুখ হাত ধুয়ে খেতে বসেছে, মায়া এসে কড়া নাড়ে। দরজা খুললে ভেতরে এসে পাতের কাছেই মেঝেতে উবু হয়ে বসে বলে, তোমার খবর নিতে এলাম। আমার চাকরীটা সত্যি ছাড়লে তা হলে?

কি করি? কটা চাকরী করব?

নবীনকে রাখব তোমার যায়গায় ?

ও যদি পারে কেন রাখবে না ? আমার সঙ্গে কিন্তু নবীনের কথা বন্ধ !

সেটা শুনেই তো জিজ্ঞাসা করতে এলাম কি করব। নবীন নিজেই আমাকে বললে তুমি নাকি হঠাৎ কথা বন্ধ করে দিয়েছ।

আল্পনা বলে, আপনাকেও বলেছে ? নবীন তর্ক করতে করতে দাদার হল রাগ—বাস্, কথা বন্ধ ! আমি যত বলি, দাদা ওরকম নয়, দাদা কখনো অন্যায় করে না—কে কার কথা শোনে। ওর ওই এক কথা—তর্ক চলছিল, তর্ক চালাতে চালাতে হঠাৎ রাগ করে দাদা কথা বন্ধ করে দিয়েছে।

মায়া একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই আল্পনার দিকে তাকায়। সুনীলের সামনে এই ভঙ্গিতে এরকম সুরে কথা বলা আল্পনার পক্ষে নতুন বটে।

গৌরী মেয়ের কথাগুলি শোনে নি কিন্তু কথার সুরটা কানে গিয়েছিল। ছেলের জন্য তরকারী এনে সে বলে, আমিই তো ওকে দিচ্ছিলাম, তুই জেগে বসে রয়েছিস কেন ?

মায়াদি এসেছে তাই।

সুনীল মায়ার মুখের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলে, শুনলে ? নবীন যেমন মিথ্যা বলে, আল্পনারও তেমনি মিথ্যা আটকায় না।

মিথ্যা বলি !

আল্পনা ফোঁস করে ওঠে।

এখুনি বললি। মায়া এসেছে বলে তুই জেগে বসে আছিস, এটা মিছে কথা নয় ?

আল্পনা জোর দিয়ে বলে, না। ওটা কথার কথা, মার কথার একটা ভাসাভাসা জবাব। আমি কেন জেগে আছি সেটা বলতে পারব না কিন্তু মার কথার জবাবে কিছু বলতে হবে তো ? আমি তাই বল্‌লাম মায়াদি এসেছে বলে জেগে আছি। এটা শুধু মার মান রাখা, মিছে কথা বলা নয়। চুপ করে থাকা আর একথা বলার মধ্যে আর কোন তফাৎ নেই। তোমার হিসেব যদি সংসারে চলত দাদা—

সুনীল বাধা দিয়ে বলে, তুই শুবি যা তো। মায়ার সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে।

এই তো তুমিও একটা মিছে কথা বললে। মায়াদির সঙ্গে দরকারী কথা হয়ে গেল, আর কোন দরকারী কথা নেই জানো। তবু বলছ দরকারী কথা আছে।

সুনীল তার দিকে না তাকিয়েই মায়াকে জিজ্ঞাসা করে, অনিল আর ছায়ার ঝগড়া মিটেছে?

কই আর মিটল? অনিল ওর সঙ্গে মিশবে না বলেছে।

আল্পনা বলতে যায়, বলেছে বটে, কিন্তু—

নিজেই সে থেমে যায় হঠাৎ।

কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে থেকে ধীরে ধীরে উঠে চলে যায়।

মায়া জিজ্ঞাসা করে, ওর কি হল?

অভিমান! নবীনের সঙ্গে কথা বন্ধ করেছি বলে।

বেশ আছে ওরা, মান অভিমান ছেলেমানুষি নিয়ে।

বেশ আছে? বেশ থাকলে তো ভাবনাই ছিল না। ছেলেমানুষিতে পর্য্যন্ত ঘূণ ধরে গেছে। আড়াল করা ছেলেমেয়েদের মানুষ করা কঠিন দাঁড়িয়ে গেছে। একটা লড়াই অবলম্বন চাই মানুষ হতে হলে।

মায়া উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, নবীনের সঙ্গে কথা বন্ধ করেছ কেন? কারণটা ভাল বুঝলাম না।

সুনীল একটু হাসে।

কারণ? কারণ ওর একগুঁয়েমি, সঙ্কীর্ণতা। আসলে কথা বন্ধ করেছে নবীন নিজে। বড় বেশী তর্ক করত, আমি সেদিন আপিসে তাই অনুযোগ দিয়ে বলেছিলাম যে অন্যের সঙ্গে তর্ক করে আমায় কিছুদিন রেহাই দিক—কাজের কথা, দরকারী কথা ছাড়া আমার সঙ্গে যেন অন্য কথা না বলে। তাইতে চটে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে জীবনে কোনদিন আমার সঙ্গে কথা বলবে না। কিন্তু বদনামটা হয়েছে আমার। আমিই নাকি কথা বন্ধ করেছি।

মায়া বলে, এসব ছেলেমানুষদের সঙ্গে সত্যি পারা মুস্কিল। ছায়া আমার সঙ্গে কি আরম্ভ করেছে জানো? কথা কয় কিন্তু সেটা প্রায় না বলারই সামিল—নেহাৎ দরকার হলে মুখ ভার করে সংক্ষেপে বিরক্তির সঙ্গে বলে। আমি যে অনিলকে শাসন করে দিই নি।

মায়া আর দাঁড়ায় না।

মায়া চলে যেতেই আল্পনা যেচে স্নীলের বিছনা ঝেড়ে দিতে, তার ঘরে গিয়ে প্রথমে চুপচাপ হাতের কাজটা সারে। তারপর বলে, তুমি যদি কথা না বন্ধ করে থাকো, কথা বললেই পার নবীনের সঙ্গে?

আমাকেই যেচে যেচে কথা বলতে হবে?

তাতে দোষ কি? তোমার তো বাধা নেই—ও বেচারী একবার প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে, ওর পক্ষে তো আর নিজে থেকে কথা বলা সম্ভব নয়।

আপিসে কাজের কথা বলি।

অন্য কথা দু'একটা বললেও হয়।

স্নীল হেসে বলে, হ্যাঁ, আমি যেচে অন্য কথা বলি আর ও জবাব না দিয়ে আমাকে অপমান করুক। নিজের দাদার মান অপমানের বুঝি দাম নেই তোর কাছে?

আল্পনা মুখ তুলে বলে, নবীন তোমায় অপমান করবে? একবার করেই দেখুক। সেদিন থেকে আমি ওর মুখ দেখব ভেবেছ?

৮

কদিন অঘোরের মুখ দেখলেই বোঝা যায় খোঁড়া মেয়ে তার সচল বাপকে কাবু করেছে।

রমেশের ব্যাপারের পর থেকে সে সন্দেহ করেছে যে মেয়ের এই বিদ্রোহাত্মক দুর্বুদ্ধির পিছনে আছে সুনীল। ড্রাইভারের কাছে অবশ্যই সে খবর পেয়েছিল যে রাত করে বিভা সুনীলের বাড়ী গিয়েছিল। তারপরেই পঙ্গু বিভা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, সে বিয়ে করবে না।

শিক্ষিত বুদ্ধিমান সুদর্শন যুবক রমেশ, কত সাধারণ বাপের কত সাধারণ মেয়ে, আজকালকার দিনে একরকম একটা স্বামী জুটিয়ে দেবার জন্য, বাপের ভালবাসার পরিচয় পেয়ে কেঁদে ফেলে যে কেমন করে সে বাপকে ছেড়ে যাবে স্বামীর ভালবাসা ভোগ করতে—বিভা স্পষ্ট পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে এরকম বাজে লোকের বৌ হওয়ার চেয়ে কুমারী হয়ে থেকে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া সে অনেক ভাল মনে করে। কি ফাঁদেই যে পড়েছে অঘোর!

খোঁড়া মেয়ে, বিকারগ্রস্তা মেয়ে। খোঁড়া হবার জন্যই সে বিশেষ অধিকার খাটাতে চায় তার বাপের উপর।

মেয়ের নীতির হিসাব বাপকে মানতেই হবে। অন্ততঃ তার বিয়ের ব্যাপারে।

রমেশ মেয়ের কাছে বাজে লোক কেন অঘোর বুঝতে পারে না। মেয়ে বুঝিয়ে দেবার পরেও নয়।

বিভার জন্য তার একবিন্দু মায়া মমতা নেই তবু তার বাপের টাকার লোভে সে তাকে বিয়ে করতে রাজী—সারাজীবন তাকে তোষামোদ করে চলতেও রাজী। এই জন্য সে নাকি বদ লোক।

তাতে দোষটা কি ?   টাকার জন্য কি লোকে বিয়ে করে না ?

দোষটা বিভার মতে এই যে, টাকার কোন দরকার নেই লোকটার, লোকটা খোঁড়া বৌ নিয়ে জীবন কাটাতে একেবারেই অনিচ্ছুক তবু টাকার লোভ সামলাতে না পেরে বিভাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। সে যদি গরীব হত, আপনজনদের ভালর জন্য নিজেকে বিক্রী করা যদি তার দরকার হত, সে যদি কোন বিপদে পড়ত,—টাকার জন্য তাকে বিয়ে করতে চাইলে কিছুই মনে করত না বিভা।

কিন্তু শুধু টাকার লোভটাই যার বড সে কি মানুষ ?

তুমি পারতে বাবা ?—তবে !

মেয়ের যুক্তি অনুসারে না হলেও রমেশ লোকটা যে সত্যই বাজে লোক এটা বুঝতে বাকী থাকে নি অঘোরের।

বাজে লোক না হলে এমন সুন্দর চেহারা নিয়েও একটা খোঁড়া দুঃখী মেয়ের মন ভুলাতে পারে না ?   সে নিজে রাজী হলেও, মেয়েটাই তাকে বিয়ে করার নামে বেঁকে বসে !

রমেশকে অঘোর তার ব্রাঞ্চ আপিসে বদলী করে দিয়েছে। নীচু পোষ্টে নামিয়ে দিয়েছে।

তার মতলব যে হাসিল হয়নি রমেশকে দিয়ে, এটাই রমেশের মারাত্মক অপরাধ। আপিসের কাজের দিক থেকেও সে সুনীলের মত অপরিহার্য্য নয়— সুনীলের বিপরীত হিসাবেও অপরিহার্য্য নয়।

তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না অঘোর—ভাল কাজেও নয়, চোরা কাজেও নয়।

সে ব্যাপারের জের হয় তো আজও মেটে নি। এখনো হয় তো অঘোর বুঝবার চেষ্টা করছে তার মেয়ের বিদ্রোহের জন্য সুনীলের দায়িত্ব কতখানি, সুনীলকে শাস্তি দেওয়া কর্তব্য কিনা অথবা সুনীল ভালই করেছে তার !

খোঁড়া যুবতী মেয়ে।

বাপের এত টাকা।

এরই প্রতিক্রিয়ায় কি হয়ে যেতে পারত সে হিসাব কি আর অঘোর করে না, এত বড় সে হিসাবী মানুষ! মেয়েকে নিয়ে হয় তো নাকের জলে চোখের জলে একোকার হতে হত তার।

হয়ত সুনীলের জন্যই তার ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া গ্রাস করা দূরে থাক, বিভার চরিত্রটি হয়েছে শক্ত, নিজের মনকে সে বশে রাখতে পারে।

কিন্তু কদিন ধরে নতুন করে আবার মেঘ ঘনিয়েছে অঘোরের মুখে।

বিভার জন্যই মেঘের সঞ্চার সেটা অনুমান করা যায়, কারণ মেয়ের জন্য ছাড়া অন্য কোন কারণে তার মুখে এরকম মেঘ সঞ্চারিত হয় না।

মেজাজ বিগড়ে গেলে অঘোর আপিসে কর্মচারিদের সঙ্গে সাধারণত খুব ভাল ব্যবহার করে। ব্যতিক্রমও অবশ্য ঘটে থাকে কিন্তু এটাই তার সাধারণ নিয়ম।

সে জানে, রাগ দিয়ে কোন কাজ হয় না সংসারে। রাগ বরং কাজ নষ্টই করে দেয়, লোকসান ঘটায়। অন্য সময় তো টনটনেই থাকে সাধারণ বিচার বুদ্ধি, রাগের সময়টাই বরং সাবধান থাকা বিশেষভাবে দরকার।

রোজ একটা দুটো জরুরী কাজ সুনীলের থাকেই। হয় সে কাজ অন্য কেউ করতে পারবে না অথবা অন্যকে দিয়ে করাতে অঘোরের বিশ্বাস বা সাহস হবে না।

কাজ বুঝিয়ে দিয়ে অঘোর বলে, তোমার হাতে উন্নতি হচ্ছে কাগজটার। কিন্তু এত খাটুনি কি পেরে উঠবে?

অঘোরকে বলে' সুনীল নন্দার কাগজের জন্য একটা স্থায়ী বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেছে। সেই সূত্রে অঘোর নিয়মিত কাগজ পায়।

কাগজে খাটুনি বিশেষ নেই। ঘরেও লেখাপড়ার কাজ করি, ওখানেও সেই একই কাজ। এ আনন্দের কাজে কষ্ট হয় না।

আমার এখানের কাজটা হল কষ্টের, কেমন ?

কাজ কষ্টের নয়। তবে একটা বাধ্য হয়ে করা, একটা কাজ নিজের খুসীতে করা। আপনার কাজে আমি ফাঁকি দেব না। যদি দেখি দু'দিক সামলাতে পারছি না, একটা ছেড়ে দেব।

কোনটা ? আমার কাজ ?

সুনীলের মুখে একটু হাসি ফোটে।

আপনার কাজ ছাড়বার কি উপায় আছে ? কাগজ চলছে লোকসান দিয়ে, আমাকে এত বেতন দিয়ে ওরা কি রাখতে পারে ?

অঘোর আচমকা বলে, তুমি যাবার পর কাগজটায় বড় কড়া কড়া কথা লেখা হচ্ছে। এতটা কি ভাল ?

সুনীল বলে, অন্যায় অনাচারের সমালোচনা আর কত নরম হতে পারে বলুন—সেরকম সমালোচনায় লাভ কি ? আগে বরং এলোমেলো গালাগালি থাকত, আমি সেটা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি। যুক্তি দিয়ে সিরিয়াসলি সমালোচনা হয় বলেই আজকাল লেখাগুলি কড়া মনে হয়। আগে ঢের বেশী কড়া কথা লেখা হলেও সস্তা গালাগালির জন্য সমস্ত লেখাটাই হাল্কা হয়ে যেত, তেমন কড়া মনে হত না।

বটেই তো, বটেই তো !

একটু চিন্তিত মুখেই সুনীল ফাইল হাতে নিজের জায়গায় ফিরে যায়। সে টের পেয়েছে, কোন একটা মতলব ভাঁজছে অঘোর, তারই সম্পর্কে ভাঁজছে !

*

রবিবার ভোরে অঘোরের গাড়ী এসে দাঁড়ায় সুনীলদের বাড়ীর সামনে।

লাঠিতে ভর দিয়ে নেমে আসে বিভা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেদিনের মত ভিতরে যায়।

বলে, বড্ডই নাকি ব্যস্ত শুনলাম ? না শুনলেও বুঝতে পারছি। নইলে অতবড় একটা ব্যাপারে পরামর্শ নিতে এলাম—আর তারপর খোঁজ খবর নেওয়া নেই।

সুনীল বলে, খোঁজ খবর নেওয়া নেই ? রোজ তোমার খবর পাই। তোমার বাবার আপিসে চাকরী করি ভুলে গেছ নাকি ?

আমি ভুলি নি, ভুলেছ তুমি। চাকরীটা খসিয়ে মনে পড়িয়ে দিতে হবে মনে হচ্ছে। মনিবের মেয়ে, এত অবহেলা সইব না আপিসের একটা কেরানীর।

অবহেলা ? রোজ তোমার খবর নিই বলে ?

মাসে একবারটি গিয়ে চোখে দেখে খবর আনো না বলে।

বিভা হাসে।

জানি জানি, তুমি খবরের কাগজ বার করেছ, তোমার চাদ্দিকে নাম, কাজের তোমার অন্ত নেই। মনিবের মেয়ে হয়েও তাই তো নিজে নীচু হয়ে এলাম।

বিভা আবার একটু হেসে গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, তামাসা নয়, কি ব্যাপার বলত সুনীলদা ? কাল বাবা প্রায় এক ঘণ্টা তোমার সম্বন্ধে আমাকে জেরা করল। তোমার আদর্শ কি, জীবনে তুমি পলিটিক্স করতে চাও নাকি, খবরের কাগজে ভিড়েছ কেন—এমনি সব কত যে আবোল তাবোল প্রশ্ন। আমি সত্যি ভাবনায় পড়ে গেলাম। জগতে একটা মানুষ একটু নিস্বার্থভাবে স্নেহ করে, বিপদে আপদে পরামর্শ দেয়, কি বলতে কি বলে ফেলে শেষকালে তার দফাটি রফা করব ! হঠাৎ তোমার সম্পর্কে বাবার এত কৌতূহল চড়ে গেল কেন ?

সুনীল বলে, হঠাৎ যে খবরের কাগজে ভিড়ে গেলাম—কড়া কাগজ হল। তোমার বাবাই শুধু নন, আরও অনেকের কৌতূহল হঠাৎ চড়ে গেছে।

তোমার কোন বিপদের ভয় নেই তো ?

কাতর মুখে করুণ প্রশ্ন। সুনীলের কাছে বিভা আজ একেবারে সংযম হারিয়ে ফেলেছে। অথচ সুনীলের কাছেই প্রাণপণে সে নিজেকে বিচলিত বিগলিত হতে দেয় না, সুনীল পাছে মনে করে যে সে তার কাছে স্নেহ আর বন্ধুত্বের বেশী আর কোন আশা রাখে।

সুনীল নীরবে একটা সিগারেট ধরাতে বিভা সচেতন হয়। মুখখানা তার রাঙা হয়ে ওঠে।

সুনীল বলে, তবে তো আর জবাব দেবার দরকার নেই। তুমি নিজেই বুঝতে পেরেছ পুরুষ মানুষের বিপদের ভয়ে কেঁচো বনে থাকলে চলে না।

বিভা বলে, পুরুষমানুষ! পুরুষমানুষ! বড় অহংকার পুরুষমানুষের! মেয়েমানুষ যেন মানুষ নয়! ছেলেবেলা থেকে এ অবস্থা না হলে একবার দেখিয়ে দিতাম মেয়েমানুষ ভেসে আসে নি। নিজে বাবার আপিসের ভার নিয়ে তোমায় হুকুম দিয়ে খাটাতাম।

সুনীল বলে, এই তো ধাতে ফিরেছ!

তারপর হেসে বলে, বাবার আপিসের ভার নিয়ে? তোমার বাবা বুঝি পুরুষমানুষ নন?

বিভা তর্জনী তুলে বলে, ছি! পৌরুষের অহঙ্কারে শেষে এই বুদ্ধি হল? মেয়ের কাছে শেষে বাপকেও পুরুষ বানাবার চেষ্টা? বাপের সম্পত্তি ছেলে পায়। আমি মেয়েছেলে হয়েও বাপের সম্পত্তি পাব, পুরুষকে টেক্কা দেব। বাবা পুরুষ না স্ত্রীলোক সে খবরে আমার কাজ কি?

সুনীল বলে, তুমি সত্যি আজ আমাকে লজ্জা দিলে।

খবর আসে, লোক এসেছে। একজন, দু'জন নয়, পাঁচজন বিশিষ্ট বেশধারী ভদ্রলোক।

সুনীল বলে, দেখলে? রবিবার সকালটাও একটু রেহাই দেয় না। আবছা ভোরে বেরিয়েছিলে তাই সুনীল বাবুর সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলার ভাগ্য হল। নইলে—

সুনীল শুধু গেঞ্জিটা গায়ে চড়িয়ে বাইরে যাওয়ার উপক্রম করে।

বিভা বলে, গেঞ্জি নয়, পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে যাও।

সুনীল খানিকক্ষণ যেন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর সোৎসাহে বলে, ঠিক বলেছ!

শচীন বাঁধানো দাঁত খুলে রেখে দুধে ভেজানো পাঁউরুটি মাড়ি দিয়ে পিষে খেতে

খেতে মেয়েকে বলে, খেয়াল হল তাই সাবধান করে দিচ্ছি, পরে যেন আমায় দোষ দিও না। আমি সেকেলে মানুষ।

সেকেলে মানুষ ?

নিশ্চয়। একেলে তোদের দিকে খানিক সহানুভূতি না দিয়ে উপায় নেই—কিন্তু মানুষটা আমি পূরো মাত্রায় সেকেলে। বাপ ছেলেমেয়ের জন্য যতটুকু একেলে হতে পারে, আমি তা হব, তার চেয়ে বেশী যেন টেনো না আমায়। তোরা বড় বেহিসেবী।

আমরা বেহিসেবী ? আমরা নিজেদের হিসাব কষছি, তোমাদের ভুল হিসাবকে সামলে নিচ্ছি।

তোরাই শেষ হিসাব করবি ? তোদের পরে আর হিসাব থাকবে না ? এইখানে শেষ জগৎ জীবন সভ্যতা সব কিছুর ?

নন্দা হাসে। এ প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না।

শচীন বলে, আমার কাছে চুপ করে থাকার সুবিধে আছে—অন্যেরা কিন্তু রেহাই দেবে না।

অন্যেরা মানে কাদের কথা বলছ ? কাগজে যাদের সমালোচনা করছি ? না, যারা টাকা পাবে ? অথবা যারা কাগজের জন্য খাটছে ?

সকলের কথাই বলছি। এভাবে বেশীদিন কাগজ চালানো যাবে না। তোমরা ক্রমে ক্রমে বাঁ দিকে মোড় নিচ্ছ। কাগজের লাভ কিছুই নেই, বামপন্থী যাদের কাগজ নেই, তারা মাঝখান থেকে সুবিধা ভোগ করে নিচ্ছে।

তুমি সত্যি সেকেলে বাবা, অ্যাদ্দিনে ভাল করে বুঝলাম। এতদিন কাগজটার কোন নীতি না থাকার নীতি ছিল—সব খিচুড়ি পাকিয়ে একটা নিরপেক্ষ মত প্রকাশের চেষ্টা চলত। অ্যাদ্দিনে দস্তুরমত একটা নীতি ঠিক হচ্ছে, কতকটা সত্যিকারের খবরের কাগজ হতে চলেছে কাগজটা—তাতেই তুমি ভয় পেয়ে গেলে !

দূরদৃষ্টি থাকলে তোরও ভয় হত। সার্কুলেশন বাড়ার সঙ্গে লোকসান বেড়ে যাচ্ছে খেয়াল করেছিস্ ?

করেছি বৈকি। তাই বলে সার্কুলেশন না বাড়া ভাল নাকি? কাগজ বার না করলে কিছুই লোকসান যায় না!

শচীন নীরবে খেয়ে ওঠে। হরতকীর টুকরো মুখে দিয়ে ধীরে ধীরে বলে, একে একে বাইরের লোক এসে জুড়ে বসছে। হয়তো এমন দাঁড়াবে, তুই একটা কথা বললে কেউ দাম দেবে না।

নন্দা নিশ্চিন্তভাবেই বলে, ওরকম খাপছাড়া কথা আমি বলব কেন? পাঁচজনের চেষ্টাতেই একটা খবরের কাগজ চলতে পারে, যে খাটবে তারও কাগজটাকে আপন ভাবা চাই। নইলে মালিকের একার সাধ্য আছে কাগজ চালায়? পাঁচটা পাঁচ রকমের লোক নিয়ে সাধারণ একটা আপিস চালানো যায়, যে যার নিজের মনে নিজের কাজ করে যাবে। কিন্তু খবরের কাগজে পাঁচজনের খাটুনিতে সামঞ্জস্য থাকা চাই, তাদের খাটুনি মিলে মিশে কাগজটাকে রূপ দেবে।

শচীন বলে, এগুলি তোর কথা নয়, তুই এগুলি সুনীলের শেখানো কথা বলছিস।

নন্দা বলে, তা বলছি। কিন্তু কথাগুলি ঠিক তো? আমি মনে মনে যা ভাবছি জানলে তুমি চমকে যাবে বাবা।

বুড়ো বাপকে বেশী চমকে দিও না।

তবে মনের কথা মনেই থাক। একদিন অবশ্য জানতে পারবে।

সন্ধ্যার দিকে কাগজটার আপিসে গেলে মনে হবে এতদিনে বুঝি স্বপ্ন সফল হয়েছে মৃত প্রমোদের, এতদিনে জেঁকে উঠেছে তার স্থাপিত সংবাদপত্রটি। নানা কাজে লোকজন তো সর্বদা যাতায়াত করছেই, বিনা কাজেও যে কত লোক আজকাল আসা যাওয়া করে তার হিসাব রাখা দায়।

কেবল সাধারণ বাজে লোক নয়, খ্যাতিমান অর্থবান মানুষেরও পদার্পন ঘটে পত্রিকার আপিসে,—অনেক নামকরা নেতা লেখক সাংবাদিক শিক্ষাব্রতী সন্ধ্যার দিকে এসে আড্ডা জমায়।

নন্দা সুনীলকে বলে, আপনার আমার মধ্যে একটা পরিস্কার লেখাপড়া হওয়া

উচিত। কবে কি নিয়ে আপনাতে আমাতে ঝগড়া লাগবে—মাঝখান থেকে সর্বনাশ হয়ে যাবে কাগজটার।

কি লেখাপড়া হবে?

আপনাকে কাগজটার আংশিক মালিকানা দিয়ে দেব। আমার সঙ্গে ঝগড়া হলেও তাহলে কাগজটার ক্ষতি করতে পারবেন না।

আমি তো মাইনে নিচ্ছি।

ভারি মাইনে নিচ্ছেন এত খেটে! তাও তো গত মাসে পুরো টাকা পান নি। কাগজটাকে যে তুলছেন এত চেষ্টা করে, শুধু মাইনে নেবার স্বার্থ হলে জোর পাবেন কেন?

সুনীল একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, শুধু মাইনের স্বার্থ নয়—কাগজে লিখছি। কাগজে আমার মতামত প্রকাশ পাচ্ছে, অনেক গায়ের জ্বালা কাগজটার মারফৎ ঝাড়তে পারছি, দেশের লোকের অনেক দাবী দাওয়া নিয়ে লড়াই করছি। কাজ করে এত আনন্দ জীবনে কখনো পাইনি। কেবলি কি মনে হয় জানো? বদ্ধ একটা জলার মত এতদিন যেন জীবনটা শুধু পচছিল—এতোদিনে সত্যি একটা গতি-লাভ করেছে। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। কাগজ তোমারি থাক, আমাকে কাগজটা চালিয়ে যেতে দিও, তাহলেই হবে।

নন্দা বলে, ধরুন তুদিন বাদে আমার মন বিগড়ে গেল, আপনাকে কাগজ চালাতে দিলাম না, তাড়িয়ে দিলাম। জগতে কত রকম কি হতে পারে, তখন কি করবেন?

অন্য একটা কাগজে ঢুকে পড়ব।

নন্দা জোর দিয়ে বলে, এ হিসাবটা ভুল হল আপনার। এ কাগজটার জন্য যে ভাবে খাটছেন অন্য কাগজে ঢুকে সে সুযোগ পাবেন না। এ কাগজটাকে নিজের ভাবতে পারছেন, অন্য কাগজে গিয়ে তা পারবেন? তার চেয়ে আমি যাতে আপনার অধিকারে কোনদিন কোন কারণে হস্তক্ষেপ করতে না পারি, সেরকম একটা ব্যবস্থা করে নেওয়াই তো ভাল। আপনাকে সে দায়িত্ব শেষ পর্য্যন্ত

নিতেই হবে—আমার রসদ ফুরিয়ে এসেছে। নিখিলবাবু নানাভাবে শুষতেন, এখন বুঝতে পারছি।

সুনীল নীরবে ভাবে।

নন্দা বলে, আমি নিঃস্বার্থভাবে আপনার উপকার করছি ভাববেন না। কাগজের ভাগীদার হলে কাগজ থেকে লাভ করতে পারলে নেবেন, নইলে নেবেন না, আপনার সম্পর্কে আমার কোন দায় থাকবে না। লাভ দিয়ে হোক লোকসান দিয়ে হোক, নিজের কাগজ আপনি নিজে চালিয়ে যাবেন।

সুনীল চিন্তিতভাবে বলে, হিসেবটা করেছ বুদ্ধিমতীর মতই। এখন মাইনে বলে তবু কিছু নিচ্ছি, সেটা বন্ধ করতে চাও। এ কাগজ থেকে লাভ হতে দেরী আছে।

নন্দা হাসি মুখে বলে, এত খেটে, এত সময় দিয়ে, সামান্য যা আপনি নিচ্ছেন, সেটা না পেলে আপনার চলবে কেন? ভাগীদার করে আপনাকে হাত খরচের টাকা কটা থেকে বঞ্চিত করব, আমি মোটেই সেটা হিসাবে ধরি নি। নিজে দোকান দিলে, লোকে আয় থেকে নিজের খরচের টাকাও নেয়। না নিলে চলবে কেন? যে নামেই নিন—এত সময় দিয়ে খাটলে খুটলে, কিছু টাকা আপনাকে নিতেই হবে।

সুনীল ভেবে বলে, তোমার বাবা? প্রদ্যোতবাবু? ওরা কি বলবেন?

বুঝলে কিছুই বলবেন না, খুসীই হবেন। না বুঝলে যা খুসী হয় বলবেন! এতদিনে কাগজটা তুলবার একটা সুযোগ পেয়েছি, বাপ-দাদার খাতিরে সে সুযোগটা নষ্ট করব নাকি? আগেও একবার একজন পার্টনার জোটাবার কথা হয়েছিল, পয়সাওয়ালা পার্টনার। সুবিধামত লোক না পাওয়ায় হয় নি। ঠিক লোকটিকে পেয়ে গেছি, আমি ছাড়ছি না কিছুতেই।

আচ্ছা, একদিন দু'জনে বসা যাবে। খরচ আরও বাড়বে মনে হচ্ছে। প্রেসটার পিছনে কিছু পয়সা ঢালা দরকার।

সেইজন্যই তো তাগিদ দিচ্ছি—ভাগ নিন। নিয়ে যা দরকার টরকার সব ব্যবস্থা করুন।

আনন্দ আর উৎসাহ যেন উৎসারিত হয় নন্দার মুখ থেকে। সে মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সুনীলের মনে পড়ে যায়, এই সেদিন নন্দাকে পড়ানোর কাজটা সে বেছে নিয়েছিল যে এ মেয়ে তাকে বিশেষ পাত্তা দেবে না, এর কাছ থেকে কোনরকম ন্যাকামির ঝনৃঝাট পোয়াবার আশঙ্কা নেই।

হিসাব তার ভুল হয় নি। কিন্তু এতখানি প্রাণশক্তি যে নন্দার আছে এটা সে ধরতে পারে নি আগে। নন্দার মধ্যেও কি রসকস নেই মায়ার মত, তাব মত? কাজ আর দায়িত্বের মধ্যেই তারও জীবনের আনন্দ-বেদনার হিসাব নিকাশ? অথবা মৃত স্বামী মনটা দখল করে আছে বলে ওদিক দিয়ে তার আর কোন আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন নেই?

কিন্তু স্বামীর জন্য শোক নেই বলেই তো এদিকে আবার কুমারীও সেজে থাকে।

৯

নবীনের একখানা কবিতার বই বেরিয়েছে।

চটি বই। ছোট আর মাঝারির আকারের গোটা বাইশ কবিতা।

আল্পনা সগর্বে বইখানা দাদার হাতে তুলে দেয়। বলে, কবিতা না পড়েই সমালোচনা করে একদিন ওকে চটিয়েছিলে, কবিতাগুলি পড়ে একটা সমালোচনা লেখো দিকি ভাল করে।

আমায় লিখতে বলেছে?

আমি বলছি, তুমি লেখো না।

কল্পনা দিন দুই আগে প্রণবের সঙ্গে বাপের বাড়ী এসেছিল। প্রণব একদিন থেকেই চলে গিয়েছে। কল্পনার চেহারা দেখে তার শ্বশুরবাড়ীর উপর এবাড়ীর লোকেরা খুসী হতে পারে নি।

কল্পনা বলে, এত বিদ্যে হয়েছে তোমার? যার বই সে আসতে পারল না, বলতে পারল না, তুমি দাদাকে হুকুম দিচ্ছ সমালোচনা লিখতে!

আল্পনা বলে, দাদার সঙ্গে নবীনের যে কথা বন্ধ।

কল্পনা বলে, তাহলে দাদাকে দিয়ে সমালোচনা লেখানোও বন্ধ।

এই সুরটাই এবার স্পষ্ট হয়েছে কল্পনার কথায় ব্যবহারে—দাদার উপর দরদ। এ বাড়ীতে আসবার আগে থেকেই বোধ হয় মতলব এঁটে এসেছে যে এবার যতদিন বাপের বাড়ী থাকবে স্পষ্টভাবে গায়ে পড়ে দাদাকে দরদ দেখাবে।

দাদা পছন্দ করুক বা না করুক!

প্রণব শ'দুই টাকার একটা চাকরী করে। এবার কথায় কথায় সে সুনীলকে সলজ্জভাবে জানিয়ে গেছে যে সে-ও একবার রাজনীতির ধার ঘেঁষে কিছুদিনের জন্য জেলে গিয়েছিল—ছাত্র বয়সে।

সুনীলের কাগজটা পড়তে পড়তে নাকি মনটা আবার নাড়া খাচ্ছে তার।

সুনীল বলেছিল, ঠিক দলগত পলিটিক্স নেই কাগজটার পিছনে। ওটা কোন দলের কাগজ নয়।

প্রণব বলেছিল, তা হোক না। যারা দশজন সাধারণ লোকের পক্ষে থেকে তাদের স্বার্থে কথা বলছে, আপনারা তাদের কথাই তো বলছেন। ও মিলে যাবেই; কমনম্যানের ইণ্টারেষ্ট যেই দেখুক—একাই দেখুক আর দল বেঁধেই দেখুক, বলতে হবে সেই এক কথাই।

সুনীল বলেছিল, তুমি ঠিক বলেছ। আমি দলীয় কাগজ উড়িয়ে দিচ্ছি না, বলছি না ও সব কাগজ দরকার নেই। রাজনৈতিক দল হলে তার একটা কাগজও চাই। সে কাগজে দলের কথা বেশী থাকবে, দলের স্বার্থ বড় হবে, সেটাও দোষের কিছু নয় বরং উচিত কথাই। তবে এরকম একটা কাগজেরও দরকার এদেশে—অনেক দল কিনা।

সুনীল বলেছিল, কাগজ যারা পড়ে তারাও একটা দল কিন্তু। সংগঠিত নয়, কিন্তু দল।

প্রণব চলে গেলে কল্পনা সুনীলকে জানিয়েছিল, তোমার খুব ভক্ত হয়ে পড়েছে আজকাল।

তাই নাকি! তা ভক্ত হয়েও আমার বোনটিকে এমন কাহিল করে ফেলেছে কেন?

সেটা তোমার বোনের দোষ হতে পারে।

সত্যি কি তাই? কেন রোগা হয়েছিস্?

এমনি। রোগা কি মানুষ ইচ্ছে করে হয়?

কল্পনার শরীর খারাপ হবার ব্যাপারটা একটু ভাল করে খোঁজ করবে ভেবে রাখে, কিন্তু সময় আর হয় না সুনীলের। আগে ছিল বাঁধাধরা সময়ের কাজ, যতই খাটতে হোক অবসরের সময়টুকু ছিল তারই হাতের মুঠোয়—বিশ্রাম করার বদলে সে সময়টাও অন্য কাজে মাথা ঘামালে কারো কিছু আসত যেত না। এখন তার সব চেয়ে বেশী টানাটানি পড়েছে সময়ের।

তাই আল্পনাকে মুখখানা যথাসম্ভব ভারিক্কি করে আসতে দেখে সে বিরক্ত হয়ে বলে, সামান্য কথা হলে এখন থাক। আমার সময় নেই।

আল্পনা বলে, দিদির কথা বলব।

কি কথা?

দিদি কেন রোগা হয়ে যাচ্ছে জানো?

অগত্যা কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে বোনের দিকে সুনীলকে তাকাতে হয়।

আল্পনা ভূমিকা না করেই বলে, জামাইবাবুকে দিদির পছন্দ হয় নি।

তুই কি করে জানলি?

রকম সকম দেখেই টের পেয়েছি। প্রণববাবুকে একেবারে আমল দেয় না। কেমন যেন একটা অবজ্ঞার ভাব। কথা কইলে গায়ে মাখতে চায় না।

সুনীল বলবার চেষ্টা করে, নতুন নতুন বিয়ে হলে—

আল্পনা মাথা নাড়ে।—হাল্কা হাসি ঠাট্টার কথা বলছ? আমি সেটা চিনি না? প্রণববাবুর সঙ্গে ইয়ার্কি দিলে তো কথাই ছিল না। ওরকম অনেকেই

দেয়, দেখায় যেন সব কিছু হাসি তামাসার ব্যাপার। দিদি সামান্য ব্যাপারে মুখ বাঁকায়, কথায় কথায় বিরক্ত হয়—অনেক সময় কথাই বলে না ভাল করে। প্রণববাবুও কেমন একটু দূরত্ব রেখে চলেন।

খেতে বসে সুনীল গৌরীকে জিজ্ঞাসা করে, প্রণব একদিন থেকেই চলে গেল কেন? দু'একদিন থেকে যেতে বলনি?

বলিনি? কতবার বলেছি। থাকতে না চাইলে করব কি! আপিস তো এখান থেকেই করতে পারে।

একটা চিঠি লিখে দিই, রবিবার দুপুরে এখানে খাবে, কি বল?

গৌরী কিছু বলার আগেই কল্পনা বলে বসে, থাকগে না, অত খাতির না করলেও চলবে।

সুনীল বলে, তার মানে? নতুন জামাইকে খাতির না করলেও চলবে কিরকম?

কল্পনা বলে, ভারি তো একটা মানুষ। লেজ গুটিয়ে গুটিয়ে নিজেই ছুটে ছুটে আসবে দেখো তোমার কাছে।

বোনের মুখের ভাব লক্ষ্য করে সুনীল চিন্তিতভাবে খেয়ে যায়।

মুখের কথায় শুধু নয়, কল্পনার মুখের ভাবেও প্রণব সম্পর্কে দারুণ অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পেয়েছে!

গভীরভাবে তলিয়ে না বুঝুক, নব বিবাহিতা বোনটির জীবনের কঠিন সমস্যাটা আন্দাজ ধরতে পেরেছে ঠিকই। প্রণবের সঙ্গে সাধারণভাবে কল্পনার কথা ও ব্যবহার লক্ষ্য করে, স্বামীর উপর তার শ্রদ্ধার অভাবটা ধরা আরও সহজ হয়ে গেছে তার পক্ষে।

কিন্তু এই অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবের কারণ কি কল্পনার? নিজে সে প্রণবের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে, তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেছে বিয়ের আগে। তাকে তো হাল্কা ফাজিল ছোঁড়া মনে হয় নি, যে বিয়ের পর তাকে কল্পনার পক্ষে মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করা সম্ভব হয় না।

এবং স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে না পারাটাও তো অতি মারাত্মক কথা! প্রেম ছাড়াও স্বামীস্ত্রীর চলে যায় কিন্তু এই সহজ শ্রদ্ধাটুকুর অভাব ঘটলে তো তাদের পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব হয় না কোনমতেই!

খেয়ে উঠে সে একটু পরামর্শ করতে যায় মায়ার সঙ্গে।

মায়া সব শুনে বলে, আমিও তোমাকে বলব কিনা ভাবছিলাম। যা ব্যস্ত দেখি তোমায়, এসব ঘরোয়া সমস্যা ঘাড়ে চাপাতে আবার মায়াও হয়। ছায়াও বলছিল আমাকে, কল্পনা নাকি প্রণবকে কেয়ার করে না, কেমন একটা অবজ্ঞার ভাব আছে। আমি প্রথমটা বিশ্বাস করি নি, কিন্তু গতবার যখন ওরা এসেছিল, তখন লক্ষ্য করে দেখেছি যে সত্যিই তাই। তোমার বোনের কাছে স্বামীটি হয়েছে নেহাৎ বাজে লোক।

সুনীল বলে, এতো ভারি মুস্কিল হল।

মায়া বলে, মুস্কিল বৈ কি। আমি আস্তে আস্তে ওর পেটের কথা টেনে বার করার চেষ্টা করেছি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে কল্পনাকে জেরা করেছি। আমার কি মনে হয়েছে জানো? দুটি কারণে কল্পনার মন বিগড়ে গেছে।

মায়া একটু থামে।

না, বিগড়ে গিয়েছে বলব না, মন উঠছে না বলি। প্রণব শুধু চাকরী আর বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলে আড্ডা দিয়ে দিন কাটায়, সিরিয়াস কাজ কিছু করে না, এই হল একটা কারণ। আরেকটা কারণ আমার মনে হয়, প্রণব একটু বাড়াবাড়ি কাব্যি করতে গিয়েছিল মেয়ের সঙ্গে। অন্য মেয়ে খুসী হত, উনি তোমার বোন তো। বৌয়ের সঙ্গে ন্যাকামি করাই ভদ্রঘরের রীতি, প্রণবের বিশেষ দোষ নেই। অনেকে আবার নিজে থেকে করে না, বন্ধুরা যেমন শিখিয়ে দেয় সেই রকম করে। কিন্তু কল্পনা ধরে নিয়েছে যে, ওর স্বামী জুটেছে ছ্যাবলা।

সুনীল ধীরে ধীরে বলে, কি করা যায় বলত?

মায়া বলে, কিছুই করা যায় না। ওদের নিজেদের মধ্যেই সামঞ্জস্য হয়ে

যাওয়াই ভাল। তুমি শুধু প্রণবের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে, দেখাবে যে প্রণবকে তুমি তুচ্ছ মনে কর না।

বড় ঝনঝাট সংসারে!

ঝনঝাট বৈকি! কিন্তু তুমি আমি সংসার না করেই ঝন্‌ঝাট পোয়াচ্ছি, এই হল আসল মজা।

মাঝে মাঝে সুনীলের মনে হয় সে যেন নিজের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নয়, নিতান্তই ঘটনাচক্রে নন্দার কাগজটার সঙ্গে গভীরতর ভাবে জড়িয়ে পড়েছে, একটা অদৃশ্য শক্তি তার খেয়াল খুসীর তোয়াক্কা না রেখেই তাকে ক্রমে ক্রমে আরও বেশী করে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধছে কাগজটার সঙ্গে।

এ চিন্তা মনে মনে এলে অবশ্য সে সঙ্গে সঙ্গেই ঝেড়ে ফেলে।

অদৃশ্য শক্তিতে তার বিশ্বাস নেই বহুকাল।

তার সব কাজের, সহজ হোক কিম্বা একটু জটিল হোক, সাধারণ বাস্তব বাখ্যা যতক্ষণ সে খুঁজে পাচ্ছে, অদৃশ্য কোন শক্তির উপর দায় চাপিয়ে রেহাই খুঁজবার সাধ সত্যই তার নেই।

নন্দা তাকে কাগজটার ভাগ্যের মালিক করে ছেড়েছে।

সেটা তার সমস্যা নয়। মালিক হবার আগেই যেচে যেচে যে দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছিল, মালিক হবার পর এমনি দায়িত্ব হয় তো বেড়েছে, কাজ বাড়ে নি। মালিকানার ভাগ না পেলেও এ খাটুনি তাকে খাটতে হত। সেটা পালন করতে গিয়ে অঘোরের আপিসে চাকরী বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে তার পক্ষে।

কাগজটা যদি দাঁড়ায় আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই দাঁড়িয়ে যাবে—নইলে একেবারেই দাঁড়াবে না।

সমস্ত কিছু নির্ভর করছে তার উপরে। নন্দা থেকে আরম্ভ করে কাগজটার সাব এডিটররা পর্যন্ত যেন তার উপর সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে, তার কথায় উঠবার বসবার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করে।

দায়িত্ব তোমার। কি করতে হবে বলো, আমরা করব।

নন্দা বলে, সাধে কি ভাগীদার করেছি? আমি ভারি চালাক মেয়ে। এই সুযোগে তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে না পারলে যে আর হবে না আমি সেটা টের পাইনি ভাবছ? টের পেয়েই দায় চাপিয়েছি।

সুনীল বলে, সে তো বুঝলাম। আমি এখন কোন দিক সামলাই?

নন্দা সঙ্গে সঙ্গে অম্লান বদনে বলে, কাগজটার দিক। অন্য দিক অন্য লোকেরা ঢের ঢের সামলাচ্ছে, একটা খবরের কাগজের দিক কি সবাই সামলাতে পারে, না চেষ্টা করার সুযোগ পায়?

ভেবে চিন্তে সুনীল অঘোরের কাছে তিনমাসের ছুটির দরখাস্ত দাখিল করে।

দরখাস্তে লেখে যে ছুটিটা তার পাওনা আছে, ব্যক্তিগত কারণে ছুটিটা এখন দরকার হয়েছে।

মুখে কাগজের কথা সব জানায়।

অঘোর বলে, চাকরী না ছেড়ে ছুটি নিচ্ছ এইজন্য যে কাগজ যদি নেহাৎ না দাঁড়ায়, চাকরীতে ফিরে আসবে। কাগজ একটু দাঁড়ালেই আর তোমায় আমি এ আপিসে দেখতে পাব না।

সুনীল বলে, সেটা তো বুঝতেই পারছেন। মাইনে পাব দু'মাসের। তারপর যে আমার কি অবস্থা হবে ভাবতে পারছি না। বাড়ীতে সকলকে আধপেটা খেতে হবে।

অঘোরের আজ নতুন ভাব। হাসিমুখে সে বলে, আরে বোসো না। এই তো দোষ তোমাদের, একা একাই তোমাদের বীরত্ব, কারো সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটু কম বীর হতে তোমাদের মন চায় না।

সুনীল মনে মনে বলে, সেরেছে!

কিন্তু ক্লান্ত মুখে হাসি নিয়েই সে বসে। বাইরের ক্ষমতাশালী বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই শুধু অঘোরের মুখোমুখি যে চেয়ারে বসার অধিকার, আজ নিয়ে দ্বিতীয়বার সে সেই চেয়ারে বসতে পায়।

অঘোর বলে, আমি তোমায় বিশ্বাস করি, এতদিনে নিশ্চয় সেটা জেনেছ। তোমায় বিশ্বাস করা যায়—এটাই আমার কাছে তোমার একমাত্র গুণ। শুনে রাগ হচ্ছে না তো ?

সুনীল বলে, রাগ ? এতবড় প্রশংসা করলেন, রাগ হবে কেন ?

অঘোর বলে, বিশ্বাস করলে সকলে খুসী হয় না। মনে করে যে বোকা পেয়ে বাগাচ্ছি। তোমায় আমি সত্যি বিশ্বাস করি। আমি জানি, তোমার কয়েকটা আদর্শ আছে, নিয়মনীতি আছে, মরলেও তুমি তা ছাড়বে না। আমি তাই ভাবছিলাম কি, তুমি যখন এভাবে কাগজটার দিকে ঝুঁকেছ, নিশ্চয় ওর মধ্যে সাবষ্টানস্বিয়াল কিছু আছে।

অঘোর একটা সিগার ধারায়। সিগার ধরানোটা তার চাল মাত্র, ধোঁয়া খেতে সে ভালবাসে না। এই সিগারটাই তার চার পাঁচদিন চলবে।

খানিক সুনীলের মুখের ভাব লক্ষ্য করে অঘোর বলে, আমি যদি তোমার ওই কাগজটার পিছনে দাঁড়াই ? আমি যদি কাগজটা দাঁড় করাতে যত টাকা দরকার, ঢালতে রাজী হই ? তুমি এমনভাবে মেতেছ বলেই আমি কিন্তু মোটা টাকা এভাবে রিস্ক করতে রাজী হচ্ছি সুনীল।

সুনীল খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলে, আপনি এ কাগজের পিছনে টাকা ঢালবেন ? এটা তো মুনাফার কাগজ নয়।

মুনাফা ? তুমি এটা অন্যায় বললে সুনীল। মুনাফা তো চাদ্দিক থেকে পাচ্ছিই—আমি কি মানুষ নই ? বিভার পেছনে যে এত টাকা ঢালি, সেটা কি মুনাফার জন্য ?

কি সর্তে আপনি টাকা দেবেন ? হাজার চল্লিশ টাকা পেলেই আমি কাগজটাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি।

অঘোর বোধ হয় এতটুকুও আশা করেনি। সে খুসী হয়ে বলে, তুমি সিগারেট ধরাও না, সিগারেট খাও। ওসব প্রেজুডিস আমার নেই। আমি খুব সোজাসুজি সর্তে তোমায় টাকা দিতে রাজী আছি। তোমায় আমি

বিশ্বাস করি তো। আমার সর্ত খুব সোজা। যতই হোক তোমরা যোয়ান ছেলে মেয়ে তো, রক্ত তোমাদের গরম। ওর একটা সেফগার্ড রাখব যে কোন লেখা আমি বাতিল করলে সেটা ছাপা হবে না। আরেকটা সর্ত খুব বাজে ঠেকবে—নেতিবাচক। কাগজে আমেরিকাকে গাল দেওয়া চলবে না।

সুনীল বলে, কাগজের মালিকের সঙ্গে আলাপ করে আপনাকে জানাব।

কাগজের মালিক কে ?

একটা ফাজিল মেয়ে। কাগজটা ওর স্বামীর। ওকে না জিজ্ঞাসা করে কিছু বলতে পারছি না আপনাকে।

সুনীল উঠে যাবার পর অঘোর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় শেষবার সম্পাদকীয় প্রবন্ধটার প্রুফ দেখে দিয়ে সুনীল ভাবছে যে এখন বাড়ী ফেরার চেষ্টা করাই শক্তির অপচয়, দুঘণ্টা ধরে চেষ্টা করে বাড়ী ফিরে খেয়ে দেয়ে অভ্যস্ত বিছানায় শুয়ে হয় তো ঘুম আসবে না।

তার চেয়ে এখানে কিছু আনিয়ে খেয়ে, এখানেই রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করলে, অতদূরে বাড়ী ফেরার শক্তিক্ষয়টা বেঁচে যায়।

নন্দা তখন আসে।

লুচি আর মাংস নিয়ে আসে।

বলে, বোকা হলে বাড়ীতে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতাম। কিন্তু দেখছ তো, মানুষকে খাটিয়ে নেবার কায়দা জানি।

কি রকম খিদে পেয়েছিল এতক্ষণে যেন টের পাওয়া যায়, হাত ধুয়েই সুনীল তাড়াতাড়ি খেতে আরম্ভ করে।

তাকিয়ে দেখে নন্দা বলে, যতই হিসেবী হোক, নিজের পেটের হিসাবটা পুরুষের খেয়াল থাকে না। আর সব কিছু ভাবতে পারলে, রাত্রে খিদে পাবে এটা মনে পড়ল না কেন ?

সুনীল বলে, মেয়েরাই চিরকাল খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছে বলে আমিও ওই নিয়মের মধ্যেই মানুষ হয়েছি। বাড়ীতে ওদিকে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছে।

নন্দা বলে, আজ্ঞে না। এদিকে লুচি মাংস খাবে, ওদিকে খাবার ঢাকা থাকবে—এই রেশন আর চোরা বাজারে অত নবাবী করে না। বিকালে গিয়ে বারণ করে দিয়ে এসেছি যে আজ থেকে রাত্রে তোমার রান্না হবে না, আমার কাছে খাবে।

শুনে কি বলল বাড়ীতে?

খুসী হল না তেমন। পুরুষ মানুষ রাত্রে বাড়ী না ফিরলেই মেয়েদের খারাপ লাগে—যে জন্যেই ফেরা না হোক।

সে একটু থামে।

তোমার মা বলছিলেন, অনিলও নাকি খুব রাত করে ফেরে।

খেয়ে উঠে সিগারেট ধরিয়ে সুনীল অঘোরের প্রস্তাবটা নন্দাকে শুনিয়ে দেয়।

নন্দা আশ্চর্য্য হয় না। বলে, এরকম কত প্রস্তাব আসবে। একটা কিছু গড়তে গেলেই টাকাওলা লোক সেটা বেদখল করতে চায়।

সুনীল বলে, টাকার কিন্তু খুব দরকার ছিল। কিছু টাকা যোগাড় করতেই হবে।

নন্দা সায় দিয়ে বলে, কিন্তু এঁর কাছে টাকা নিলেই তো ইনি কাগজটা কণ্ট্রোল করবেন?

তা খানিকটা করবেন।

তবে? এমনি দিতে যদি রাজী হন, শুধু লাভের ভাগ পাবেন কিন্তু কাগজ চালানো সম্পর্কে একটি কথাও বলতে পারেন না—তা হলে নেবেন।

সুনীলের বিছানার চাদরটা ঝেড়ে পেতে দিয়ে নন্দা বলে, এখানেই ঘুমোবেন তো?

হ্যাঁ। বাড়ী যেতে কুড়ি মিনিট সময়ও যদি লাগে, ঘুমোলে কাজ দেবে।

ঘুমোন। আমি পালাই

সকালে একেবারে বাজার করে নিয়ে বাড়ী ফিরে স্থনীল খবর পায়, অনিল তখনও পর্য্যন্ত বাড়ী ফেরে নি।

গৌরী আপশোষ করে বলে, কি যে মতিগতি হল ছেলেটার!

কল্পনা বলে, আমার মনে হয় কোন বদ খেয়াল ধরেনি ছোড়দাকে, পয়সা রোজগারের চেষ্টা করছে।

তোর একথা মনে হয় কেন?

মেয়ে বন্ধু পুষতে পয়সা লাগে তো।

আধঘণ্টা পরে অনিল ফিরে এলে তার চেহারা দেখে মনে হয় কল্পনার অনুমানই সত্য, বদখেয়ালে বাইরে রাত কাটাবার মত কোনরকম ছাপ তার মুখে নেই। বেশ তাজাই দেখাচ্ছে তাকে।

কল্পনাই তাকে জিজ্ঞাসা করে, বাড়ীতে কিছু না জানিয়ে কোথায় রাত কাটানো হল বাবুর?

বন্ধুর বাড়ী ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কেন? ঘুম কি আজকাল বেশী হচ্ছে?

বিয়ে হয়ে তোর মাতব্বরি তো বেশী হয়েছে!

ওটা মেয়েদের হয়ে থাকে। বেশ তো আমার মাতব্বরি পছন্দ না হয়, দাদার কাছে ব্যাপার ট্যাপার সব খুলে বলবে যাও। কলেজের ছাত্র যদি পড়াশোনা বাতিল করে দিনরাত আড্ডা মেরে বেড়ায়, বাড়ীর লোকের একটু ভাবনায় পড়তে হয় কিন্তু ছোড়দা। তোমার উচিত নিজে থেকে সব খুলে বলা। দাদা কিছু বলতে গেলে তো আবার অপমান হবে।

অনিল চা খেতে খেতে গোমড়া মুখে ভাবে। কল্পনার কথাগুলি হেসে উড়িয়ে দেবার সাধ্য তার নেই। উচিত অনুচিতে একটা সহজ বাস্তব বিচার স্থনীল যেন গায়ের জোরে তার অভ্যাস করিয়ে দিয়েছে।

সুনীল শেখাতে সময় পায়না কিন্তু মায়ার স্কুলের হিসাব নিকাশ তাকেই দেখে দিতে হয়।

মায়া কাগজপত্র এনে সবে তাকে হিসাবটা বুঝিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে, অনিল ঘরে এসে বলে, তুমি নাকি আমায় ডেকেছ দাদা?

সুনীল বলে, ডেকেছিলাম। বাবা নালিশ করেছিলেন তোমার নামে। তুমি ঘর থেকে টাকা নিচ্ছ, বাইরে রোজগার করছ—অথচ তোমার নিজের খরচের দায়িত্বটা তুমি নিতে পারছ না।

অনিল চুপ করে থাকে।

সুনীল আবার বলে, আমরা টাকা ঢালব, তুমি পড়বে—তার একটা সার্থকতা আছে। আমরা পড়ার খরচও দেব, তুমি আবার নিজেও ওদিকে রোজগারের জন্য টাইম আর এনার্জি নষ্ট করবে, আমি এর মানে বুঝি না।

অনিল ধীরে ধীরে বলে, মানুষ বিশেষ অবস্থায় পড়লে—

বিশেষ অবস্থায় পড়বার অধিকার তো তোমার নেই।

মায়া অস্বস্তি বোধ করে বলে, আমি চলে যাব? তোমাদের কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে হয় তো।

সুনীল বলে, অসুবিধা কেন হবে? গোপন কথা তো কিছু হচ্ছে না আমাদের। অবশ্য অনিল যদি কিছু বলতে চায়—

আমার কিছুই বলার নেই।

আমার কথার একটা জবাব তো দেবে? আমরা পড়ার খরচ দিলে তোমাকে পয়সা রোজগারের চেষ্টা বাদ দিতে-হবে। ছাত্রজীবনে যা দরকার সব আমরাই যোগাব।

অনিল গোমড়া মুখে বলে, পয়সা রোজগারের চেষ্টা কি খারাপ?

সুনীল বলে, নিজের কাজ ফাঁকি দিয়ে করা খারাপ বৈকি। রোজগার ছাড়া তোমার যদি না চলে, পড়া ছেড়ে দিয়ে ভিড়ে পড়। ভুল করে কোন দায়িত্ব যদি নিয়ে ফেলে থাকো, টাকার জরুরী দরকার হয়ে থাকে, আমাকে জানালে

নিশ্চয় বিবেচনা করে দেখব। তোমার ভুল করার অধিকার তো আমি কেড়ে নিইনি।

অনিল একটু চুপ করে থেকে বলে, কাল বলব।

সে চলে গেলে মায়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, রেবার এবার ওবেচারাকে রেহাই দেওয়া উচিত।

সুনীল বলে, গায়ের জ্বালা মিটছে না যে। আমার অপমানের শোধ নিচ্ছে। আমার কাছে পাত্তা পায় নি, গায়ে জ্বালা ধরেছিল। তার শোধ নিচ্ছে।

মায়া ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, এ কিরকম শোধ নেওয়া? নিজের ঘাড়েও তো পড়ছে! যখন সামলাবার দরকার হবে তখন কি করবে?

সে বিবেচনা যার থাকে তার কি মিছামিছি গায়ে জ্বালা ধরে?

ও বেচারাদের দোষ নেই। ঘরে বাইরে সিনেমায় খালি ভাবুকতাই তো শেখানো হয়। মেয়েরা আরও বেশী টস্ টস্ করে ভাবে।

তুমিও তো মেয়ে?

মায়া একটু হাসে।

আমিও মাঝে মাঝে গদ গদ হই বৈকি।

পড়াশোনা নিয়ে থাকবে অথবা রোজগার করতে নামবে এ বিষয়ে অনিল তার সিদ্ধান্ত পরের দিন জানবে বলেছিল। কে জানে সে মনস্থির করতে পারে না, অথবা সুনীলকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে ভুলে যায়।

দিন তিনেক পরে কল্পনাকে প্রণব নিতে আসে।

কল্পনা সোজাসুজি জানিয়ে দেয়, আমি কদিন বাদে যাব।

ওদিকে অসুবিধা হচ্ছে।

হোক না একটু অসুবিধা।

দু'জনের কথা কাটাকাটি বাইরে থেকে শোনা যায়। প্রণব যে রাগ করেছে, টের পেতে বাকী থাকে না বাড়ীর লোকের! তা, একদিনের জন্য বাপের বাড়ী

বেড়াতে এসে তিন দিন কাটিয়েও ফিরে যেতে না চাইলে অপর পক্ষের রাগ করার অধিকার আছে বৈকি !

কল্পনা গ্রাহ্যও করে না।

বলে, করুকগে রাগ—ঘরের ভাত বেশী করে খাবে।

গৌরী চিন্তিতভাবে বলে, এ কি স্বভাব হল তোর বিয়ের পর? একেবারে যেন মহারাণী বনে গিয়েছিস ! এরকম ব্যবহার করলে তোকে তো দুচোখে দেখতে পারবে না কেউ ? মেয়ে মানুষ, পরের ঘরের বৌ, এটুকু ভুলে গেলে তো তোমার চলবে না বাছা !

ভুলি নি গো, ভুলি নি। পরশু যাব বললাম তো।

প্রণব যে পরশু আসতে পারবে না বললে ?

খুব আসতে পারবে। নিজের গরজেই আসতে পারবে।

অনিল প্রণবের পক্ষ নিয়ে রেগে বলে, এসব ফাজিল মেয়ের বিয়ে দেওয়াই উচিত হয় নি।

দেখা যাবে তোমার কত ভাল বৌ আসে।

খুব সকালেই প্রণব এসেছিল। চা জলখাবার খেয়ে সে চলে যাবে, আপিস আছে। রাত্রে সুনীল কাগজের আপিসেই ঘুমিয়েছিল, প্রণব বিদায় নেবার কয়েক মিনিট আগে সে বাড়ী ফেরে।

প্রণবের মুখ দেখে সে বলে, এখানে খেয়ে আপিস চলে যেও ?

না। আমার কাজ আছে।

সুনীল আর কিছু বলে না।

অনিল ক্রুদ্ধ মুখে বলে, কল্পনাকে তোমার শাসন করে দেওয়া উচিত।

সুনীল শান্তভাবেই বলে, শাসন করা দরকার হলে এবার প্রণব করবে। আমি কি আর শাসন করতে পারি ?

প্রণব গম্ভীর মুখেই বলে, শাসন করে কি আর স্বভাব বদলানো যায় ? আপনার বোনের প্রকৃতিটাই হাল্‌কা।

সুনীল বলে, না, হাল্কা মেয়ে ও নয়। একটা কিছু গোলমাল হচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার কথা রাখতে আজকের মত তুমি ওকে ক্ষমা কর প্রণব। ও কেন এরকম করছে একটু বুঝবার চেষ্টা করে দেখি।

প্রণব চলে যেতেই অনিল হঠাৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে বসে, এ সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী তুমি। তুমিই সকলের মন বিগড়ে দিয়েছ। কারো স্বাভাবিক চালচলন আসে না।

সুনীল আশ্চর্য্য হয় না, রাগও করে না। গম্ভীর শান্ত মুখে বলে, কথাটা আমায় বুঝিয়ে দিতে পারলে সত্যি খুব উপকার হয়। আমার সম্পর্কে এরকম একটা কথা যখন তোমার মনে এসেছে, খোলসা করে বলাই ভাল। আমি যে দাদা, গুরুজন এটা ভুলে গিয়ে তুমি খোলাখুলি কথা বলতে পার। তোমার নালিশ যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, আমি নিশ্চয় প্রতিকারের ব্যবস্থা করব।

অনিল চুপ করে থাকে।

সুনীল আবার বলে, কেন কথাটা মনে হয়েছে বলতে পারছ না?

অনিল বলে, আমার কথা কি তুমি মানবে? তুমি মানুষটাই ভয়ানক নিষ্ঠুর। তোমার কাছে মোটা হিসাব ছাড়া কোন কিছুর দাম নেই। স্নেহ মায়া এসব তুমি ন্যাকামি মনে কর। তোমার কাছে কল্পনা ওই নিষ্ঠুরতা শিখেছে—প্রণবের ভালবাসা ওর ন্যাকামি মনে হয়। শক্ত পাথরের মত মানুষ না হলে তাকে মানুষ বলেই গণ্য করতে পারে না।

এত বড় নিষ্ঠুর অভিযোগ! সুনীল একবার ভাবে খানিকক্ষণ সময় নিয়ে ছোট ভাইটিকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে, নিষ্ঠুর তার দাদা নয়, ভাবাবেগের স্বার্থপরতায় সে-ই বরং নিষ্ঠুরতার চরমে উঠতে পারে, নিজেকে হীন পর্য্যন্ত করতে পারে।

কিন্তু বুঝিয়ে দিলেও বুঝবে কি?

সুনীল তাই শান্তভাবেই প্রশ্ন করে, তোমার নিজের দিক থেকে ধরলে?

আমারও তাই। তোমার কাছে উল্টো নিয়ম শিখেছি। সংসারে হৃদয় নিয়ে কারবার যদি না চলত, তাহলে আলাদা কথা ছিল। আর সকলে হৃদয়টা মানছে,

স্নেহ মায়া দুর্ব্বলতা এসব হিসাব ধরছে। তুমি আমাকে খানিকটা যন্ত্রের মত বানিয়ে দিয়েছ, মানুষের সঙ্গে খাপ খেতে পারি না। কিছু ভাল লাগে না আমার, সব সময় কেমন একটা অস্থিরতা জেগে থাকে। মনে হয়, আমি একেবারে অপদার্থ, এ কাজটা বুঝি অন্যায় করলাম, ও কাজটা বুঝি উচিত হবে না—

আমার জন্য এটা হয়েছে ?

তোমার জন্য। তুমি সব নিয়মে বেঁধে দিতে চাও। জীবনে হাসি আনন্দ ফুর্তির এতটুকু দাম নেই তোমার কাছে। সব সময় সব ব্যাপারে মানুষকে সিরিয়াস হয়ে থাকতে হবে। এদিকে তোমার আবার খুব জোরালো পার্শোন্যালিটি —তার চাপে আমরা কুঁকড়ে গেছি। ভাইবোনদের তুমি স্বাভাবিকভাবে মানুষ করতে পার নি।

সুনীল একটু সময় চুপ করে ভাবে।

শান্তভাবেই বলে, আচ্ছা, কথাটা একটু অন্য ভাবে বিচার করা যাক। আমাদের মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজে চরম ভাঙ্গন ধরেছে, জীবনে বিকার আর অস্বাভাবিকতা এমনিতেই খুব বেশী দেখা যাচ্ছে। আমি তোমাদের ভাবপ্রবণতার পথে সহজে ভেসে যেতে না দিয়ে খানিকটা বাস্তব বুদ্ধি, বাস্তব বিচার এনে দিয়েছি—হৃদয়মন একটু শক্ত করে দিয়েছি। স্রোতে ভেসে যেতে দিলে তুমি হয় তো এই সংঘাতটুকু টের পেতে না—ভেসেই যেতে। তুমি যদি বুঝতে চাও আমি তোমায় অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিতে পারি—আমি একটু শক্ত না হলে সংসারটাই ভেসে যেত! এখনও তুমি যেটুকু ভদ্রভাবে চলতে ফিরতে পারছ, কলেজ যাচ্ছ, এসব কিছুই পারতে না। তোমার যে কিছু ভাল লাগে না, সেটা অবস্থার দোষ, আমার শিক্ষার দোষ নয়। ভাঙনের অবস্থাটা ভাল লাগা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, কেউ কেউ ফাঁকি দিয়ে, এটা ওটা দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারে, এই পর্য্যন্ত। এ অবস্থাটা ভাল লাগছে না, তুমি একটা পরিবর্তন চাইছ, জীবনটা তোমার কাছে সস্তা নয়—এটাই তোমার ভিতরের অস্থিরতার কারণ হতে পারে না ?

অনিল ম্লানভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করে।

তোমার সঙ্গে কথায় পারব না। তুমি আসলে আমার মধ্যে ইনফিরিওরিটি কম্‌প্লেক্স জন্মে দিয়েছ। নিজেকে ছোট মনে হয়, অপদার্থ মনে হয়।

সুনীল এবার গম্ভীর হয়। তার মুখ দেখে অনিলের মনে হয়, এতদিন জন্মেনি, এখন এই মুহূর্তে বুঝি তার ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স জন্মালো!

ইনফিরিওরিটি কম্‌প্লেক্‌স্? সেটা কোত্থেকে আসবে, কেন আসবে? ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সের থিয়োরি তুমি জানো, এ বিষয়ে পড়াশোনা করেছ? না শুধু কথাটাই শিখেছ বন্ধুদের কাছে? তোমার কথাই ধরি,আমার জোরালো প্যার্শোনালিটি আছে—কিন্তু একটা চরিত্রের প্রভাবে অন্যের চরিত্রে তো ওই কম্‌প্লেক্‌স জন্মায় না? তোমায় অসহায় পেয়ে যদি অন্যায় অত্যাচার করতাম, তোমার কাছ থেকে জোর করে সেবা ভক্তি আদায় করতাম, তাহলে তোমার আত্মগ্লানি আসতে পারত। নিরুপায় হয়ে অত্যাচার সইতে হলেই কেবল ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্‌স জন্মাতে পারে —জোরালো চরিত্রের প্রভাবে চরিত্রই গড়ে উঠতে পারে।

একটু থেমে সুনীল বলে, তুমি যেটা নিজের কম্‌প্লেক্‌স ভাবছ, আসলে ওটা তোমার আত্মবিচার। অত অন্যায় অবিচার মেনে নিয়ে একটা বিশ্রী ভাঙ্গন ধরা অবস্থায় আমরা বেঁচে আছি। তুমি ছাত্র—তুমি জানো শিক্ষার নামে কি রকম ফাঁকি চলছে। এ অবস্থাটা মেনে নিতে হচ্ছে বলে নিজেকে ছোট মনে হয়— মনে হয় এভাবে লেখাপড়া শেখাটাই বুঝি অন্যায় কাজ, অপরাধ। এই থেকেই অবশ্য অনেক ছেলে বিগড়ে যায়—ছটফটানি থেকে রেহাই পাবার জন্য হাল্কা ফুর্তি খোঁজে। যারা ভাঙ্গন ধরা অবস্থাটা টিঁকিয়ে রাখতে চায়, ওরকম ফুর্তির ব্যবস্থাও তারাই করে দেয়।

অনিল চুপ করে থাকে।

সুনীল বলে, কল্পনার ব্যাপারটা আমার কি মনে হয় জানো? বোকামি খানিকটা হচ্ছে প্রণবের দিক থেকেই। মেয়েদের সম্বন্ধে একালের ছেলেদের কিছু অভিজ্ঞতা জন্মে যায়—ওর এতটুকু অভিজ্ঞতা নেই। শুধু বই পড়ে সিনেমা দেখে আর বন্ধুদের কাছে শুনে যেটুকু শেখা! ওর ভাবটা তাই খাপছাড়া লাগছে

কল্পনার—এরকম বৌ-পাগলা গদগদ ভাব কি আজকালকার মেয়েদের কাছে রুচিকর হয়?

কল্পনাকে বুঝিয়ে বলবে?

বুঝিয়ে বলার কিছু নেই। নিজেই বুঝবে। প্রণব টের পাবে ওভাবে আজকালকার বৌয়ের মন পাওয়া যায় না, বুঝে নিজেই সামলে নেবে।

সুনীল মাথা তুলে বলে, আমি একটু শক্ত না হলে, এ প্রশ্নগুলিও কি তোমার মনে জাগত অনিল?

অনিল চুপ করে থাকে।

সুনীল বলে, একটু বুঝে দেখবার চেষ্টা কর। সংসারটা বজায় রাখার ব্যাপারে ছাড়া কোন বিষয়ে আমি তোমার ওপরে কর্তালি করি নি। অবস্থা খুব খারাপ, সকলকেই ত্যাগ করতে হবে, কষ্ট করতে হবে। সবারি যে দাবী আছে সেটা ভুলে গিয়ে, তুমি কেবল নিজের কথা ভেবেছো। ধরো, তুমি একটা জামা চাইলে, আল্পনা একটা ব্লাউজ চাইল, মা চাইলো বিশ বছরের পুরাণো পোকায় কাটা শাড়ীটার বদলে একটা নতুন গরদের শাড়ী। তুমি টাকার হিসাব কষে দেখছ—এদের দাবী মেটানো যায় না। এদের আবদার রাখলে রেশন আনা যাবে না—এরাই খিদেয় কাতরাবে। তখন তুমি কি করবে? তোমাকে দেখতেই হবে কোনটা আব্দার, কোনটা দরকার। তুমি সেই বুঝে ব্যবস্থা করবে। সেটা কি নিষ্ঠুরতা? গরদের শাড়ী কিনে দিয়ে মাকে দয়া দেখিয়ে, মাকে খেতে না দেওয়াটাই কি নিষ্ঠুরতা নয়?

অনিল গুম খেয়ে থাকে।

আগেও তো এসব সোজা কথা বুঝিয়ে বলতে পারতে?

আগেও বলেছি, অন্যভাবে বলেছি, তুমি বুঝতে পার নি।

অনিল বলে, অমনভাবে বলবার কি দরকার ছিল, ঠিকভাবে বললেই হত!

ঠিকভাবেই বলেছি। তবে আমার ভাই, তোমাকেই তো একা বলতে হয়নি,

অনেককে বলতে হয়েছে। তুমি তাই মানেই বোঝোনি কি বললাম। এখন দায়ে পড়ে বুঝছ।

অনিলের মুখ ভার দেখে স্থনীল আবার বলে, দায়ে পড়ে বোঝাটা কিন্তু কোন দোষের কথা নয়। মানুষ চিরকাল দায়ে পড়েই বুঝে এসেছে, মানুষের জীবনের ব্যাপারটা।

অনিল অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে।

তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলছ আমরা পুরুষেরাই, আমাদের চালচলন দিয়ে, মেয়েদের চালচলন শিখিয়েছি—তৈরী করেছি? ওরা যাই করুক সেজন্য আমরা দায়ী? ওদের কোন দোষ নেই?

স্থনীল শুধু বলে, ছায়া তোমার চেয়ে অনেক বেশী ছেলেমানুষ।

মায়ার কাছে স্থনীল খবর পায় যে অনিল হঠাৎ গিয়ে গায়ে পড়ে ছায়ার সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নিয়েছে।

বাঁচা গেল। মেয়েটার জন্য সত্যি ভাবনা হচ্ছিল। আমার রসকস নেই বলে আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবনটা রসালো করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। আমি একটা যন্ত্র—ওকে মানুষ হতেই হবে। যন্ত্র না হওয়ার উপায় কি? প্রেম করে করে জীবনটা রসালো করে তোলা!

মায়া হাসে, আবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

এত বাজে বই পড়ে, বাজে সিনেমা দেখেও ভাগ্যে ছেলেমেয়েগুলি মানুষ আছে! একটা মেয়ে এমনি করে এগিয়ে গেলেও ভাগ্যে ছেলেগুলি মাথা ঠিক রাখতে পারে! ললিত বেচারার সঙ্গে যা আরম্ভ করেছিল, কি বলব তোমায়। ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতাম, কবে বোনটি এসে কেঁদে বলে আবার মুস্কিলে পড়ে গেছি। ললিতকে এতটুকু দোষ দিতে পারতাম না। চুড়ি বিক্রী করে যে মেয়ে অনিলকে নিয়ে—

স্থনীল সিগারেট ধরিয়ে বলে, তুমি যে তাজ্জব কথা বলছ।

মায়া বলে, আমিও তাজ্জব বনেই গেছিলাম। কিছু ঘটে নি, নীতির ওপর দিয়েই গেছে তাই রক্ষা। অনিলকে কিন্তু আমি বাহাদুর ছেলে বলব। সিনেমা

দেখে বেরিয়ে, মেয়ে চুড়ি বেচে টেনে নিয়ে গেল, সেদিনটা বেচারা সামলাতে পারে নি। তা পারেও না। কিন্তু নিজেকে ওরকম সস্তা করার জন্য যে ধ্যাতানি অনিল দিয়েছে, একেবারে হাড়ে হাড়ে ব্যাপার টের পেয়ে গিয়েছে মেয়ে। অনিল কি বলেছিল জানো? আজ আমার সঙ্গে খারাপ হবে, তোমাদের মত মেয়েকে বিশ্বাস করা যায় না। অনিল যদি শক্ত না হত, দু'মাস যদি তুচ্ছ করে না রাখত, ও হারামজাদি কি বুঝতে পারত, কত ধানে কত চাল?

সুনীল বলে, ললিতের সঙ্গে সিনেমায় যায় বলে নাকি অনিল রাগ করেছিল?

মায়া বলে, ললিতকে ধরেছিল পরে—অনিলকে একটু কাবু করার আশায়। বাড়ীতে বলে যেত সিনেমায় যাচ্ছি—অনিল যাতে খবর পায়। আসলে ললিতের সঙ্গে মেয়ে যেতেন মিটিং-এ। ললিতের সিনেমা দেখার রোগ নেই।

সুনীল আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে, এসব কথা অ্যাদ্দিন আমায় বলনি যে?

মায়া বলে, ভয় হত। তুমি তলিয়ে বুঝবে কিনা কে জানে? তোমার ভাই আমার ছেলেমানুষ বোনকে নষ্ট করেছে—তুমি হয় তো ধরে নেবে এটাই। খুন করেই হয় তো ফেলবে ভাইকে; আমি তো জানি ছায়াই আসলে দোষী।

সুনীল আরেকটা সিগারেট ধরায়।

তুমিও আমার সম্বন্ধে এরকম ধারণা করে রেখেছ? বিচার বিবেচনা না করেই ভাইকে খুন করে ফেলতে পারি? আমার মায়া-দয়ার বালাই নেই?

মায়া বলে, আগে তাই ভাবতাম।

ব'লে গা ঘেঁষে এসে সুনীলের গলার কাছে ছোট যে ফোঁড়াটা উঠছে, সেটাকে সন্তর্পণে আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করে আবার বলে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তোমার মায়া-দয়াটাই বেশী। একজন দু'জনকে নিয়ে মায়া-দয়া পোষায় না তোমার—মায়া-দয়া কারবারটা তোমার দশজনকে নিয়ে বড় স্কেলে। আমরা ছোট স্বার্থ নিয়ে কারবার করি তো—তোমায় ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। নন্দা খবরের কাগজের অফিসে গভীর রাতে গিয়ে, তোমায় খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আসে শুনে ভেবেছিলাম—বাইরের মেয়েই তোমার ভাল লাগে, যে মেয়ের কোনরকম দায় ঘাড়ে চাপার ভাবনা থাকে না। কিন্তু

বুঝতে পারছি আমার ভুল হয়েছিল। কোন মেয়ের কোনরকম দুঃখ কষ্টের দায়িক হতেই তোমার দারুণ অনিচ্ছা। নিজের হাঙ্গামা এড়ানো নয়, তুমি কষ্ট দিতে চাও না।

১০

নবীন উদ্যোগী হয়ে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলে একটি মাসিকপত্র বার করেছে, —নাম দিয়েছে 'নব-আল্পনা'। প্রথম পাতাতেই একটি কবিতা ছাপিয়েছে আল্পনার, —কাঁচা মেয়েলি কবিতা।

আল্পনা একটু ভয়ে ভয়েই কাগজটা সুনীলকে দেখায়। নাম সম্পর্কে সে আপত্তি করেছিল, নবীন কাণে তোলে নি।

নামটা নিয়ে জানাশোনা ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশ খানিকটা কানাকানি হাসাহাসি সুরু হয়েছে। কেউ কেউ বলছে যে, সঙ্কোচটুকু বাদ দিয়ে 'নব' কথাটার বদলে 'নবীন' বসিয়ে দিলেই চুকে যেত।

সুনীলও সেটা খেয়াল করে জিজ্ঞাসা করে, এটা নবীনের ইয়ার্কি হল, না ছেলেমানুষী? এ বুদ্ধিটুকু নিশ্চয় আছে? নবীন নামে একটা ছেলের, চেনা আছে আল্পনা নামে একটা মেয়ের সঙ্গে; সে যদি হঠাৎ এরকম নাম দিয়ে একটা কাগজ বার করে, লোকে হাসাহাসি করবে না?

আল্পনা মাথা হেঁট করে থাকে।

সুনীল বিরক্ত হয়ে বলে, কি ব্যাপার? নাচতে নেমে ঘোমটা টেনো না, খোলাখুলি কথা বল।

আল্পনা মৃদুস্বরে বলে, নবীন বলছিল, হাসাহাসি বন্ধ করার সহজ :উপায় আছে, আমাদের এনগেজমেণ্ট ঘোষণা করে দেওয়া।

তোমাদের এনগেজমেণ্ট?

নবীন প্রোপোজ করেছিল, আমি রাজী হয়েছি।

আমাদের জানাও নি কেন?

নবীন বাবাকে জানাবে বলেছিল।

বাবাকে জানিয়েছে?

না, জানাতে আসবে।

সুনীল গম্ভীর মুখে বলে, নবীন তাহলে জেনে শুনে ইচ্ছে করেই এই নাম দিয়ে কাগজটা বার করেছে? ওর ভয় ছিল আমি পাছে অন্য কোথাও তোর বিয়ে ঠিক করি, ওর সম্পর্কে আপত্তি করি, তাই আঁটঘাঁট বেঁধে নেমেছে? ওর মাথায় এত চালাকি বুদ্ধি খেলে, তা তো জানতাম না!

আল্পনা চুপ করে থাকে।

তোর সঙ্গেও পরামর্শ করেছে নিশ্চয়?

আমি বারণ করেছিলাম। বলেছিলাম .তুমি যদি অমত কর, এভাবে কাগজ বার করবার পরেও করবে।

সুনীল বলে, আমার অমত নেই। চাকরী করছে, তোর পছন্দ হয়েছে, আমি অমত করব কেন? আমার বরং অনেক ঝন্‌ঝাট বেঁচে গেল। কিন্তু নবীন যে এদিকে প্রতিজ্ঞা করেছে, আমার সঙ্গে জীবনে কথা বলবে না?

আল্পনার মুখ কঠিন দেখায়।

এ প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গতে হবে। আমি পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছি, নিজে এসে তোমার সঙ্গে যেচে কথা না কইলে,.আমার সঙ্গেও কথা কয়ে কাজ নেই। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে তুমি কি মনে করবে, এটাই হয়েছে ওর আসল মুস্কিল। নিজের প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গতে নিজেই লজ্জা পাচ্ছে।

সে তো পাওয়াই উচিত।

মোটেই উচিত নয়। মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে গেছে বলেই সেটা সারা জীবন সত্য করে আঁকড়ে থাকতে হবে, এটা একগুঁয়েমি, বোকামি। অন্য লোকের

ভালমন্দ সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা হয়, প্রতিজ্ঞা পালন না করলে অন্যের ক্ষতি হয়, সে আলাদা ব্যাপার।

স্বনীল একটু আশ্চর্য্য হয়েই শোনে।

তোর আবার এসব বিবেচনা হল কোথা থেকে ?

আল্পনা সোজাসুজি বলে, তুমিই শিখিয়েছ। তুমি নিজের কত কথা পাল্টে নাও। আগে ভাবতাম এটা বুঝি তোমার দুর্বলতা। তারপর দেখলাম যে না, দরকার হলে, অবস্থা পাল্টে গেলে, হিসাব পাল্টে গেলে, কথাও পাল্টাতে হয় মানুষকে।

আল্পনা চলে যাবার পর স্বনীল অনেকক্ষণ 'নব-আল্পনা'র পাতা উল্টাতে উল্টাতে চুপ চাপ ভাবে।

কাগজ বার করার যে উদ্দেশ্যই থাক নবীনের, পক্ষপাতিত্ব করে আল্পনার যত কাঁচা কবিতাকেই একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় সে স্থান দিক, ভিতরে কয়েকটি লেখার হেডিং পড়েই টের পাওয়া যায়, এ কাগজেও বর্তমান সমাজের তাজা তাজা সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়েছে।

এই সমস্ত সমস্যার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হওয়ায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে আপনা থেকে যে বাস্তববোধ জন্ম নেয়, নতুন যে আত্মবিশ্বাসের সূচনা সে দেখতে পাচ্ছে ওদের মধ্যে, তারও জন্ম কি ওইখান থেকে ?

প্রেমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা নেই নবীন বা আল্পনার। তারা ধরেই নিয়েছে যে তারা যখন ব্যাপারটা ঠিক করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে, মিলন তাদের হবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

প্রথমটা স্বনীল ধরতে পারে নি, তার সঙ্গে নবীনের কথা বন্ধের প্রতিজ্ঞাটা তার খেয়াল ছিল না। তাই প্রথমে তার মনে হয়েছিল, নবীন বুঝি অল্পনার নাম জড়িয়ে কাগজ বার করে সম্ভবপর বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে আটঘাঁট বেঁধেছে, আল্পনাকে তার হাতে দিতে তাদের বাধ্য করার জন্য এই চাল চেলেছে।

কিন্তু তারপরেই সে টের পেয়েছে যে তার ওই ধারণাটাই ভুল।

নবীন ওসব হিসাব করে নি। আল্পনাকে পাওয়া সম্পর্কে সে এতখানি সুনিশ্চিত যে, সেই আত্মবিশ্বাস থেকে তার সখ হয়েছে কাগজটার ওই নাম দেওয়ার এবং ওই নামকরণের মধ্যে দোষের বা অসুবিধার কিছুই সে খুঁজে পায় নি।

দরকার হলে সবাইকে জানিয়ে দিলেই হল যে, এর মধ্যে লুকোচুরির ব্যাপার কিছু নেই, তারা সত্যই 'এনগেজ্‌ড্‌'।

এত বাজে বই পড়ে আর সিনেমা দেখেও ছেলেমেয়েরা ভাবালুতা বর্জন করার এত ক্ষমতা কোথা থেকে পায়, ভেবে মায়া আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

আজ সুনীলও আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

একটা কথা মনে পড়ায় আল্পনাকে ডেকে পাঠিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, তুই কি পড়া ছেড়ে দিবি ভাবছিস্?

বাঃ রে, পড়া ছাড়ব কেন? চাকরী করছে, আমার পড়ার খরচটা যোগাতে পারবে না?

এসব পরামর্শও হয়ে গেছে বুঝি? তাহলে আর দেরী করে লাভ কি? নবীনকে বলিস্ তো আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।

বোনের বিয়ের মত এত বড় একটা ব্যাপার নিয়ে মায়ার সঙ্গে কথা না বলে, অন্য কাজে মন দিতে মনটা খুঁত খুঁত করে সুনীলের।

মায়া সব শুনে খুসী হয়ে বলে, এই তো চাই। একালের ছেলেমেয়েরা অত প্রেম প্রেম করে পাগল হয় না—প্রেম ছাড়াও যে অনেক কিছু আছে জীবনে এটা বেশ বোঝে। প্রেমকে হাজার ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুললে কি হবে, ওরা ভুলছে না। নইলে ছায়ার মত আহ্লাদী মেয়ে পর্য্যন্ত এত শক্ত হতে পারে?

সুনীল বলে, দু'জনে খুব মিল হবে না বুঝতে পারছি। ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকবে। কিন্তু তার আর কি করা যাবে?

মায়া বলে, বটেই তো। মেয়ের বুদ্ধি আছে—বিয়ে যখন করবেই একজনকে, তার ঘাড়ে গিয়েই পড়ার খরচটা চাপাই, বাপ-ভাইকে রেহাই দিই!

সুনীল একটু হাসে।

তুমি আমিই বাদ পড়লাম দেখছি।

সত্যি।

কাজে এগোই না এগোই, কারো সঙ্গে একটু পরামর্শ করতেও ইচ্ছা হয় না আমাদের ?

মায়া বলে, ইচ্ছা আমার হয়, পরামর্শ করাটাই হয়ে ওঠে না শেষ পর্য্যন্ত।

আমার কি ইচ্ছা হয় না ? আমারও বোধ হয় ইচ্ছা হয় মাঝে মাঝে, পরে চাপা পড়ে যায়। এসো না দু'জনে বসে পরামর্শ করি এক দিন।

মায়া চোখ তুলে তাকায়।

ভাই বোনদের ভালবাসার ব্যাপার দেখে হিংসা হচ্ছে নাকি ?

সুনীল হাসিমুখে বলে, ছেলেমানুষ নাকি যে হিংসা হবে ? আমি ভাবছিলাম কি, সমস্ত ছোট বড় ব্যাপারে আমরা প্রায় স্বামী-স্ত্রীর মত পরামর্শ করি। এটা খেয়াল করেছ নিশ্চয় ? প্রেম বোধহয় আমাদের আসবে না, ও জিনিষটা বোধহয় আমাদের ধাতেই নেই। কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে যখন আমাদের এত মিল, স্বামী স্ত্রী হয়ে গেলেই বা দোষটা কি ? অন্তত দু'জনে বসে আমরা একটা প্ল্যান তো করতে পারি—স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাকী জীবনটা আমরা কাটাতে পারি কি না ?

মায়া মুখ বাঁকিয়ে বলে, পরামর্শ করার প্ল্যান করার কি আছে ? আমি যে তোমার স্ত্রী হতে পারব না এটা তো জানা কথাই। তোমার বাড়ীতে গিয়ে তো বাস করতে পারব না আমি। আমাকে স্কুলটা চালাতে হবে, বাবার অসুখের চিকিৎসা থেকে ঘর সংসারের সব ব্যবস্থা করতে হবে।

সুনীল বলে, তাতে কি আসবে যাবে ? আমার বাড়ী গিয়ে বাস করতে না পার বাস করবে না! এখনকার মতই যে যখন সময় পাই অন্যের বাড়ী আসব যাব, যে বাড়ীতে সুবিধা হয় একটা ঘরে দু'জনে এক সঙ্গে রাত কাটাব। দু'জনের যেমন সুবিধা হয় সেরকম বন্দোবস্ত করে নেব।

বলে সুনীল একটু হাসে।—আমাদের তো আর ভালবাসার বিয়ে হবে না,

সুবিধার বিয়ে হবে। পরস্পরকে আমরা জানি বুঝি বিশ্বাস করি পছন্দ করি, দুজনে পরামর্শ করে কাজ পর্য্যন্ত করি। সেইজন্য একটা সম্পর্ক গড়ে নেওয়া। আমাদের বোধ হয় ভালই লাগবে মায়া।

মায়া চিন্তিত মুখে বলে, সে তো বুঝলাম। তোমার আমার মধ্যে নয় একটা বোঝাপড়া হল—লোকে কি ভাববে? তোমার বাড়ীতে কি বলবে, আমার বাড়ীতে কি বলবে? মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না বলে মা এখনও দাপড়ায়। মেয়ের বিয়ে হয়েছে অথচ স্বামীর ঘর করে না বলে, মা তখন আরও দাপড়াবে!

সুনীল বলে, অন্যের হিসাব ধরলে আমাদের চলবে না। আমরা আমাদের সুবিধা অসুবিধা হিসাব করব—অন্যদের সেটা মানতে হবে। প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগবে সকলের, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

মায়া বলতে যায়, তা ছাড়া···

তাছাড়া?

সুনীলকে ছেলেপিলের কথা বলতে মায়ার লজ্জা করে! সুনীল বুঝতে পেরে একটু তাজ্জব হয়ে যায় বৈকি!

ছেলেপিলের কথা বলছ? ছেলেপিলে অবশ্য আমাদের দু'তিনটের বেশী হবে না, আমরা হতে দেব না। ছেলেপিলের জন্য আমাদের অসুবিধা হবার তো কোন কারণ আছে মনে হয় না!

মায়া মৃদু হেসে বলে, তোমার না হোক আমার অসুবিধা আছে। আমি যদি ছেলে বিয়োই, ছেলে মানুষ করতে ব্যস্ত থাকি, আমার স্কুল কে চালাবে?

দু'চার মাস দরকার হলে আমি চালিয়ে দেব।

তুমি সময় পাবে? কাগজ চালাবার দায় কেমন টের পাচ্ছ তো?

সময় না পাই আমাদের ছেলেমেয়ে হবে না। সে তো আমাদেরি হাত।

সেটা ভাল লাগবে আমাদের?

পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি? ভাল না লাগে, শেষ পর্য্যন্ত সুবিধে না হয়—বিয়েটা আমরা বাতিল বলে ধরে নিয়ে এখন যেমন আছি তেমনি থাকব।

মায়া হাসিমুখে মাথা নাড়ে।

তা আর হয় না। এখন যেমন আছি তেমন থাকা যায়, কিছুদিন স্বামী স্ত্রীর মত কাটিয়ে আর এ অবস্থায় ফেরা যায় না। সেইজন্য খুব ভাল করে ভেবে চিন্তে দেখা দরকার।

ভাবতে ভাবতে তুমি আমি বুড়ো হয়ে যাব।

মায়া তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, ভেবে চিন্তে দেখা উচিত, মানে কি আমি আরও দু'চার বছর ভাবতে বলছি। আজকেই একটা কিছু ঠিক করে না ফেলে, কয়েকটা দিন ভাবি এসো। আজকে কথাটা উঠল, আজকেই হেস্তনেস্ত করা ঠিক হবে না।

১১

একেবারে সাদামাটাভাবে মুখে মুখে মোটামুটি একটু বিচার বিবেচনা করা যে, তাদের নিজের নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে যেতে যেতে, তাদের মধ্যে স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কটা স্থাপন করা সম্ভব এবং স্থবিধাজনক কি না! স্থনীল ভালবাসা জানায় নি বরং এই কথাটার উপরেই জোর দিয়েছে যে, তার ধাতে বোধ হয় ওসব আসে না।

মায়ার জন্য এতটুকু ব্যাকুলতা প্রকাশ করে নি, একটিও সরস কথা বলে নি। অত্যন্ত নীরসভাবে মোটা কথায় শুধু বিচার করেছে বাস্তব স্থবিধা অস্থবিধা এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে তাদের বিয়ে হলে নেহাৎ মন্দ হয় না!

যেমন আছে সেভাবে দিন কাটাতে তার খুব বেশী কষ্ট নেই। তবে বুড়ো হতে চলেছে, কোন মেয়ের সঙ্গে ভাব হওয়া দূরে থাক, তার গোড়াপত্তনটুকুও

আজ পর্যন্ত ঘটে নি। একমাত্র মায়ার সঙ্গে তার যা একটু সহজ বোঝাপড়া আছে।

বিবাহিত জীবনটা কেমন হয় একটু চেখে দেখলে দোষ কি ?

অন্য মেয়ে হলে, সুনীলের প্রস্তাবে রীতিমত অপমান বোধ করত। কোন পুরুষের কাছ থেকে এরকম হৃদয়হীন বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার চেয়ে বড অপমান অনেক মেয়ে কল্পনা করতে পারে না।

কিন্তু সুনীলের সঙ্গে তার কিনা বিশেষ একটা সহজ বোঝাপড়া হয়ে আছে বহুদিন থেকে, সে নিজেও কিনা সুনীলকে অনায়াসে জানিয়ে দিতে পারে যে তার কাছেও ভালবাসা আশা করা মিছে ; সুনীলের বন্ধুভাবে ওরকম স্থূল বাস্তব প্রস্তাব তোলায় অপমান বোধ করার কথাটা তার খেয়ালেও আসে না।

বরং তার সমস্ত বিশেষ দাবীদাওয়া অধিকার মেনে নিয়ে, সুনীল তাকে বিয়ে করতে চায় ভেবে জীবনটা হঠাৎ যেন বড়ই রসালো হয়ে ওঠে মায়ার।

তার এতটুকু অসুবিধা না ঘটিয়েই সুনীল তাকে চায়। দরকার হলে তার মুখ চেয়ে তার গর্ভে সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষাও সুনীল ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

প্রাণটা যেন গান গেয়ে ওঠে মায়ার।

সে ভাবে, রাজী হলেই চুকে যেত। কি দরকার ছিল ভেবে দেখবার জন্য আরও কিছুদিন সিদ্ধান্তটা পিছিয়ে দেবার ?

আর কোন পুরুষমানুষের সঙ্গে ওরকম সম্পর্ক সে তো কল্পনাও করতে পারে না, ভাবতে গেলেও ঘৃণায় সর্বাঙ্গ যেন কুঁকড়ে যেতে চায়।

এক বিছানায় সুনীলের পাশে শুয়ে রাত কাটাবার কল্পনা সেরকম রোমাঞ্চকর না ঠেকলেও খারাপ লাগে না। ভালবাসা হলে হয় তো কল্পনা করেই রোমাঞ্চ শিহরণ ইত্যাদি অনুভব করত, কিন্তু ভালবাসা যখন নেই তখন আর সেজন্য মাথা ঘামিয়ে লাভ কি ?

ভালবাসা ছাড়াই যখন সুনীলের স্ত্রী হবার কল্পনা, তার সন্তানের মা হবার

কল্পনা মন্দ লাগে না, বরং আশা জাগে যে জীবনটা আনন্দময় হবে, সার্থক হবে—কি আসত যেত সেদিন সুনীলের কথায় সায় দিয়ে সব ঠিকঠাক করে ফেললে ?

মায়া স্পষ্ট অনুভব করে, নিজে থেকে সে কথাটা কোনদিন তুলতে পারবে না সুনীলের কাছে।

সুনীল আবার কবে কথা তোলে, সে জন্যই ধৈর্য্য ধরে তাকে প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে ।

কথাটা যদি মনের তলায় চাপা পড়ে যায় সুনীলের ? খবরের কাগজটা নিয়ে সে যেভাবে দিনরাত মেতে আছে, তাতে সে যদি ভুলে যায় যে মায়ার কাছে সে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করেছিল এবং কয়েকদিন পরে আবার ওবিষয়ে মায়ার সঙ্গে তার আলোচনা ও পরামর্শ করার কথা আছে ?

এমনও তো হতে পারে যে তার সেদিনের কথাবার্তা থেকে সুনীল ধরে নিয়েছে যে তার তেমন ইচ্ছা নেই, নেহাৎ সুনীলের খাতিরে কথাটা সে বিবেচনা করে দেখতে রাজী হয়েছে ? ধরে নিয়ে সুনীল যদি তার উপর কোনরকম চাপ না দেওয়া ঠিক করে ?

তাকে রেহাই দেবার জন্যই কথাটা আর না তোলে ?

ছায়া বলে, তোমার কি হয়েছে দিদি ? শরীর ভাল নেই ?

কেন ?

ঠিকমত খাচ্ছ দাচ্ছ না, কি যেন ভাবছ সারাদিন। আমার জন্যে ? আমি তো বলেছি আমার জন্যে আর ভাবতে হবে না তোমাকে। এবার থেকে আমি নিজেই সবদিক সামলে চলব।

মায়া হেসে বলে, সে তো চলবিই। মেয়েরা কি একেবারে বেশী ভুল করে, না ভুল করলে পোষায় ? কিন্তু তোরা খালি নিজের কথা ভাবিস্। আমি যে বুড়ী হয়ে গেলাম ? আমার আর বিয়ে টিয়ে দরকার নেই, না ?

ছায়া গদগদ হয়ে বলে, সত্যি বিয়ের কথা ভাবছ ?

তারপরেই তার মুখে ছায়া ঘনিয়ে আসে।

ছি ছি, ভারি বিশ্রী হবে কিন্তু। তোমার বিয়ে হবে বড় ভায়ের সঙ্গে, আমার বিয়ে হবে ছোটভায়ের সঙ্গে—

মায়া একেবারে চমকে যায়।

বড় ভায়ের সঙ্গে মানে?

আহা, আমরা যেন জানিনে কেউ।

তোরা কি জানিস্ বলনা শুনি?

সুনীলদার সঙ্গে তোমার ভালবাসা আছে সবাই জানে।

জানে নাকি?

জানবে না? তোমাদের ভাব দেখলেই টের পাওয়া যায়। ঘর সংসারের দায়ের জন্য তোমরা বিয়ে পিছিয়ে রেখেছো, তাও সবাই জানে। তাই তো সবাই এত প্রশংসা করে তোমাদের।

প্রশংসাও করে নাকি!

করবে না? বুড়ো মা-বাপ ভাইবোনদের কথা কোন ছেলেমেয়ে ভাবে আজকাল? নিজের নিজেরটা গুছিয়ে নিতে পারলেই হল। তোমাদের ভালবাসা হয়েছে, বাড়ীর লোকের জন্য বিয়ে পিছিয়ে রেখেছো—প্রশংসা করবে না?

মায়া খানিকক্ষণ বোনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

তারপর মায়া ভাবে, এই সুযোগটা কাজে লাগানো যেতে পারে।

ছায়ার সঙ্গে তার কি কথা হয়েছে, সে গল্প করার ছলে সুনীলের কাছে সে-ই তুলতে পারে কথাটা।

কিন্তু—

কথা তুললে যদি বিব্রত হয় সুনীল? বড় কাজে মেতে গেছে, তার কথা ভাববার সময় পায় না, জোর করে এখন সুনীলকে তার কথা ভাবতে বাধ্য করলে কাজের যদি ক্ষতি হয় তার?

তার চেয়ে কিছুদিন চুপচাপ থাকাই ভাল!

সুনীল একটু সামলে নিক !

প্রাণটা ছটফট করে মায়ার। সুনীলকে জানিয়ে দিতে বড়ই সাধ জাগে যে তারা যাই ভাবুক আর যেমন হিসাবই করুক, জগৎসংসারে সকলে জেনে গিয়েছে যে তাদের ভালবাসা হয়েছে !

তারা ধরে নিয়েছে যে ভালবাসা তাদের জন্য নয়, সংসারে ভালবাসা বলতে আর দশটা মেয়ে পুরুষ যা বোঝে সেটা ধাতেই আসে না তাদের।

অথচ সংসারের ওই দশজনেই জেনে গিয়েছে যে তাদের মধ্যেই জন্মেছে খাঁটি ভালবাসা, আসল ভালবাসা !

সেদিন সুনীল ওইভাবে বিয়ের প্রস্তাবটা না করলে মায়া হয় তো সব কাজ ফেলে ছুটে গিয়ে সুনীলকে কথাটা শুনিয়ে দিত। এক মূহূর্তের জন্য তার দ্বিধা বা সংকোচ জাগত না।

সেদিন বিয়ে করতে চেয়ে কি ফাঁদেই তাকে ফেলেছে সুনীল। এত বড় একটা গুরুতর কথা শোনাবার জন্য প্রাণটা ছটফট করে তবু মায়া ছুটে যেতে পারে না। কিসে যেন তাকে আটকে রাখে !

মনে হয়, যতই সহজ আর অকপট হোক তাদের সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত খোলাখুলিভাবেই তারা আলোচনা করতে পারুক নিজেদের বিয়ের সুবিধা অসুবিধার কথা—আত্মসম্মান বজায় রেখে যেচে গিয়ে সুনীলকে এ কথাটা সে শোনাতে পারে না।

সুনীলকে কোন কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করবে এটা এতদিন অভাবনীয় ছিল, প্রথমে ব্যাপারটা ভারি বিস্ময়কর মনে হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে সে টের পায়, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, এটাই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

এবার মুখ খোলার পালা সুনীলের।

সুনীল মুখ না খুললে, আত্মসম্মান বজায় রেখে এবিষয়ে তার পক্ষে একটু ইঙ্গিত করাও সম্ভব নয়। সেটা হবে নিজেকে অপমান করা, ছোট করা।

১২

অন্যায় আর অবিচারের সমালোচনা এবং প্রতিবাদ করা। জনসাধারণের স্বার্থটা সমস্ত কিছুর চেয়ে বড় করে তুলে ধরা। নন্দার মৃত স্বামী প্রমোদের নির্ধারিত এই মূল নীতিটাই অনুসরণ করা হয় তার প্রবর্তিত কাগজে।

শুধু এই নীতিটুকুর জন্যই কত মানুষের সমর্থন আর সহানুভূতি যে ভিড় করে এসে জমা হতে থাকে কাগজটার পিছনে!

লেখা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, টাকা ধার দিয়ে লোকে সাহায্য করতে চায়, চালু রাখতে চায় কাগজটা।

বিভূতি একটা নাম-করা বড় কাগজে চাকরী করত। লেখক হিসাবেও তার খানিকটা নাম হয়েছে। সে যেচে এসে প্রস্তাব করে যে ওই কাগজটা ছেড়ে এসে কম মাইনেতে সে নন্দার কাগজে আরও বেশী খাটতে রাজী আছে।

কারণ, এ কাগজের সুরে সুর মিলিয়ে সে কাজ করতে আনন্দ পাবে, মাছ ভাতের বদলে শাক ভাত খেতে হলেও দেহ-মনে সে বাঁচার আনন্দ ভোগ করতে পারবে।

সুনীল প্রশ্ন করে, বিয়ে করেছেন?

করেছি। নইলে চাকরীর-ধান্ধায় ঘুরি? ঘরে বসে লিখতাম, আপনারা গিয়ে ধন্না দিতেন একটা লেখার জন্য।

ছেলেমেয়ে?

দুটি ছেলেমেয়ে। বিয়ে করলে দুটো একটা ছেলেমেয়ে হওয়া উচিত।

সুনীল হেসে বলে, উচিত কি অনুচিত তা জিজ্ঞাসা করি নি, এমনি জানতে চাইছিলাম।

বিভূতি বলে, আপনি জিজ্ঞাসা না করলেও অল্প আয়ে ছেলেমেয়ে হওয়া অনেকে অন্যায় মনে করে। ছেলেমেয়ে একেবারে বাদ দিলে বিয়ে করার কোন মানে আছে? মেয়েদের তো মোটেই নেই।

সুনীল তাকে সংবাদ-বিভাগের সম্পাদক করে দিয়েছে—মাইনে কামায় নি। ঠিক এই রকম একজন লোকের তার বড়ই প্রয়োজন ছিল। কেবল যোগ্যতা নয়, নিজের কাজের জন্য যার দরদও থাকবে।

বলেছে, অন্যেরা ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে টাকায় ওকে কিনেছে, সে টাকাটা ওকে দিতেই হবে।

বিভূতির মতই আরও কয়েকজন এসে জুটেছে তাদের কাগজে।

এ কাগজে কাজ করতে তারা উৎসুক, উদ্‌গ্রীব। ভবিষ্যৎ অজানা কাগজটার, কবে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক নেই, সময়মত নিয়মিত বেতনের পূরো টাকাটা পাবে কিনা সন্দেহ আছে, তবু তারা মহোৎসাহে এই কাগজে যেচে এসে খাটতে চায়!

এবং সুযোগ দিলেই প্রমাণ দেয় যে তারা শুধু কথার মানুষ নয়, কাজের মানুষও বটে।

সুনীলের তাই মনে হয়, সকলকে নিয়ে ঘরোয়াভাবে তার একদিন বসা উচিত, কাগজের অবস্থাটা সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।

কাগজের নীতিটা পছন্দ হয়েছে বলেই সকলে কাগজটার জন্য প্রাণপাত করতে চাইবে এবং সেও কাগজের বাস্তব অবস্থা গোপন করে রেখে তাদের সহযোগিতার সুযোগ গ্রহণ করবে—এটা উচিত নয়। সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে দু'তিন মাস পরে কাগজটা একেবারে বন্ধ পর্য্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

এরকম কাগজের ভবিষ্যৎ আছে ভেবেই হয় তো ওরা এ কাগজে এত আগ্রহ নিয়ে কাজ করতে এসেছে—কাগজের অবস্থা যে অত্যন্ত কাহিল সেটা ওদের জানিয়ে না দিলে ওদের ঘাড় ভাঙ্গার দায়ে সে দায়িক হবে।

বিভূতিকে সে বলে, কাগজটা ঠিকমত চালাতে পারছি না। সকলকে ডেকে নিয়ে একদিন বসলে হত।

বিভূতি সংবাদের প্রুফ থেকে চোখ তুলে বলে, তাতে কি লাভ হবে? সকলে বলবে যে আমাদের মাইনে আরও দশ পনের টাকা কমিয়ে দিতে চান কমিয়ে দিন—আমরা কাজ করে যাব। এর বেশী আর কিছুই জানতে পারবেন না।

তবু স্থনীল একদিন সকলকে ডেকে বৈঠক বসায়। দপ্তরী ইয়াকুবও বাদ যায় না।

স্থনীল বলে, খোলাখুলি একটা আলোচনার জন্য আপনাদের ডেকেছি। আপনারা জানেন তো যে কাগজের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ?

সকলেই সায় দেয়।

সাব-এডিটর অল্পবয়সী শিশির বলে, এসব কাগজের আর্থিক অবস্থা খারাপ হবেই।

নরেশ বলে, আমরা সেটা জেনেই এসেছি।

স্থনীল বলে, আপনাদের জানানো উচিত মনে করি, কাগজের আর্থিক অবস্থা শুধু খারাপ নয়—খুবই খারাপ। আমরা নানাভাবে চেষ্টা করছি, দু'তিন মাসের মধ্যে কোন ব্যবস্থা না হলে হয়তো কাগজ বন্ধ করে দিতে হবে। অমি অবশ্য যদির কথা বলছি, কাগজ যে বন্ধ হবেই এমন কোন কথা নেই—তবে সম্ভাবনার কথাটা মনে রাখবেন।

বিভূতি বলে, এ কাগজ বন্ধ হবে না। আপনারা না চালান, অন্যেরা চালাবে।

কাগজটা চালাতেই হবে, কেমন?

নিশ্চয়!

প্রত্যেক মাসে লোকসান দিয়েও চালাতে হবে?

বিভূতি তাড়াতাড়ি নিজেদের মধ্যে কথা চালিয়ে নেয়। নীচু গলায় নয়, কারণ

সুনীলের কাছে গোপন করার কিছু ছিল না, একটা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পরস্পরের মতামত জেনে নেয়।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে যেন সভায় বক্তৃতা দিচ্ছে এমনিভাবে বিভূতি তার বক্তব্য জানায়। এভাবে বলার মানে সুনীল অবশ্য বুঝতে পারে। বিভূতি তার বক্তব্য কেবল তাকেই শোনাচ্ছে না, সকলের কাছে পেশ করছে। কারো যদি কিছু বলবার থাকে বলবে। বিভূতি বলে, লোকসানটা তারা সবাই ভাগাভাগি করে নিতে রাজী আছে। মাসিক খরচের একটা হিসাব যদি তাদের দেওয়া হয়, এলোমেলো মাথাভারি বেহিসাবী খরচ যদি না হয়, সহকারী সম্পাদক থেকে পিয়ন পর্য্যন্ত তারা সকলে মাইনের অনুপাতে মাসিক লোকসানটা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবে।

বিভূতি এই বলে তার বক্তব্য শেষ করে : আপনারা বোধহয় বুঝতে পারছেন অন্য কাগজে ভাল চাকরী পাব জেনেও কেন আমরা এ কাগজে লেগে থাকতে চাই ? আজ এই যে বৈঠক ডাকলেন, খোলাখুলিভাবে জানালেন কাগজ চালাতে লোকসান দিতে হচ্ছে, অন্য কাগজে এঁটা করত না, সে কাগজে ভাঁওতা দেওয়া হত যে কাগজের অবস্থা খুব ভাল, তবে বাবু বাইরে যাবার আগে চেক সই করে যান নি, তাই এ মাসের মাইনেটা সময় মত পাচ্ছ না। বাবুর সই-করা চেকটা ডাকে আসছে, এলেই তোমরা মাইনে পাবে।

সুনীল বলে, কাগজটা আপনারা যে নিজের ভাবেন আপনারা তারই আরেকটা পরিচয় দিলেন। লোকসান ভাগ করে দিলে খানিকটা সুবিধা হতে পারে কিন্তু কত আর লোকসান ভাগ করে নেবেন নিজেরা ? বিনা মাইনেতে খাটলেও সামাল দেওয়া যাবে না, আয় বাড়াতেই হবে।

সকলে চুপ করে থাকে।

সুনীল বলে, আরেকটা কথা বলি। কিছুটা লোকসান আপনারা আজ ভাগাভাগি করে নিলে, কোনদিন লাভ হলে তার ভাগও আপনারা পাবেন।

অঘোরের চাকরীটা হাতে রেখে আর লাভ নেই। কাগজের সঙ্গে যেভাবে জড়িয়ে গেছে সুনীল, তাতে আর রেহাই পাবার কথা সে ভাবতেও পারে না। রেহাই পাওয়াটাই এখন দাঁড়িয়ে গেছে পরম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

কাগজ আর বন্ধ করা যাবে না।

কাগজটা যাতে বন্ধ না হয়ে যায় সেই চেষ্টাতেই এবার তার জীবনপাত করতে হবে।

এদিকে রয়েছে সংসার চালাবার দায়।

কাগজ থেকে সে যে টাকা নেয় তাতে সংসার খরচ চালানো সম্ভব নয়। অঘোরের আপিসে সে যত টাকা বেতন পেত কাগজ থেকে তার অবশ্য তত টাকাই নেওয়ার কথা কিন্তু এখন সে তো আর চাকরী করে না কাগজে—সে এখন কাগজের লাভ লোকসানের ভাগীদার।

বেতন নিয়ে যারা খাটছে তারা পর্য্যন্ত যখন কম টাকায় কাজ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত, বাড়ীর জন্য প্রয়োজন বলেই কোন মুখে সে বেশী করে টাকা নেবে?

অনিলকে সে বলে, তোমার তো পড়ায় মন নেই, গায়ের জোরে টেনে টেনে পড়ছ।

অনিল স্বীকার করে।—উৎসাহ পাই না। পড়ে কি লাভ হবে তাই ভাবি। চাকরীর যা বাজার!

তা হলে কাগজেই কাজে লেগে যাও।

নন্দা শুনে হেসে বলে, স্বজন-শোষণ নীতি গ্রহণ করলেন নাকি?

সুনীল বলে, উপায় কি? নিজের ভাইকে যত কম টাকায় খাটাতে পারব অন্যকে তো তা পারব না।

নন্দা বলে, আমিও তাই বলছি। অন্য লোকে দেশের লোকের টাকায় করে স্বজনপোষণ, আপনি নিজের কাগজে আরম্ভ করলেন ভাইকে শোষণ করা।

সুনীল বলে, তাও নয়। ও অনর্থক আমাকে শোষণ করছিল, পড়ায় মন নেই,

পড়াবার খরচটা যাচ্ছিল লোকসান। এখানে কাজও শিখবে, কিছু উপার্জনও করবে।

দেখা যায় সত্যই তাই। পড়াশোনা ভাল লাগছিল না কিন্তু কাগজে অনিল মহোৎসাহে কাজ আরম্ভ করে। মনে হয় কলেজে পড়া ছেড়ে দিয়ে সে যেন মুক্তি পেয়েছে। পরীক্ষা পাশের দুশ্চিন্তা যেন সত্যই একটা স্থায়ী কালো আবরণের মত তার মুখে আঁটা হয়ে ছিল, কাগজে বেশী খাটুনি আরম্ভ করলেও কয়েকদিনের মধ্যে তার মুখ থেকে কালো পর্দাটা সরে যেতে দেখা যায়।

ভূপেশ কিন্তু রাগারাগি করে।

বলে, নিজে তুমি অনিশ্চিতের আশায় ভাল চাকরী ছেড়ে দিলে, বাড়ীর লোকের কথা একবার খেয়ালও করলে না। ভাইটিকেও কলেজ ছাড়িয়ে তোমার কাগজে ঢোকাচ্ছ। কাগজ যদি তোমার না চলে তখন ও বেচারার কি উপায় হবে? তুমি নিজে ডুববে, ওকেও ডুবিয়ে ছাড়বে।

সুনীল বলে, ভবিষ্যতের জন্য সে রিস্ক নিতেই হবে। পড়া ছেড়ে বসে থাকলে আলাদা কথা ছিল।

কিন্তু তোমার কাগজ যে চলবে তার ভরসা কি? কতটাকা আছে তোমাদের? কদ্দিন লোকসান টানবে?

এ কাগজ বন্ধ হবে না। কাগজ থেকে একদিন শুধু লাভ করাটাই যদি উদ্দেশ্য হত তাহলে সে ভয় ছিল। সাধারণ লোকের স্বার্থের জন্য লড়াই করা এ কাগজের মূলনীতি, এ নীতির বদল হতে আমি দেব না। আমরা চালাতে না পারি, অন্যেরা এ কাগজ চালিয়ে যাবে।

তাতে তোমাদের কি লাভ?

কাগজটা চলবে এটাই সবচেয়ে বড় লাভ। তাছাড়া, কাগজ যদি এখনকার নীতি বজায় রেখে চালানো হয়, আমাদের দু'ভাইকে নিশ্চয় তাড়িয়ে দেবে না। টাকার অভাবে কষ্ট হয় তো পেতে হবে কিন্তু সেই ভয়ে তো হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না!

এসব কথা পছন্দ হয় না ভূপেশের, তার হিসাবে কোন মানেই হয় না এসব যুক্তি তর্কের। তর্ক বন্ধ করে সে গজর গজর করতে থাকে।

অঘোরের আপিসে চাকরী করার সময়েও নানাদিকে টানাটানি ছিল কিন্তু সেই আয়টা বন্ধ হবার পর এখন ভাল করেই টের পাওয়া যাচ্ছে অনটন কাকে বলে।

ছেলের খামখেয়ালে এই বয়সে এমন কঠিন অবস্থায় পড়ায় গা জ্বালা করে ভূপেশ এবং গৌরীর। গৌরী উঠতে বসতে নিজের পোড়া অদৃষ্টকে অভিশাপ দেয়।

আল্পনা মাঝে মাঝে বুঝিয়ে তার গায়ের জ্বালা কমাবার চেষ্টা করে। অভাবের জ্বালা তার নিজের যদিও মোটেই কম নয়। বলে, তুমি এই সোজা কথাটা বুঝতে পার না মা? পরে অনেক উন্নতি করবে বলেই তো দুভাই দু'দিন একটু কষ্ট করছে। একটা ইংরাজী খবরের কাগজ ভাল করে চললে কত লাভ হয় হিসেব আছে তোমার?

সাময়িকভাবে কথাটা মনে লাগে না গৌরীর এমন নয়, কিন্তু বেশীক্ষণ কথাটা তার মনে থাকে না।

আবার সে অদৃষ্টকে অভিশাপ দিতে সুরু করে। বলে, কপাল পোড়া না হলে কারো গর্ভে এমন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ছেলে জন্ম নেয়! খেয়ালের বশে ছেলে চাকরী ছাড়ে, বাড়ীতে মাছটুকু দুধটুকু আসা বন্ধ হয়, ছেঁড়া কাপড় পরে দিন কাটাতে হয় মা বোনকে!

কল্পনা মাঝখানে আরেকদিন এসেছিল। সেও সংসারের অবস্থা দেখে সুনীলকে অনেক অনুযোগ দিয়ে গেছে।

সুনীল বলেছে, তুই নিজেকে সামলা তো, আমাদের জন্য তোর মাথা ঘামাতে হবে না। প্রণবের সঙ্গে ঝগড়া কমিয়েছিস তো?

তোমার ওই এক কথা!

বেশীরভাগ দিন, রাত্রে সুনীলের বাড়ী ফেরা হয় না, সকালে বাড়ী আসে।

অনিলও সপ্তাহে তিন চার রাত্রি ডিউটি করে। মুখে শ্রান্তি বা উদ্বেগের ছাপ না পড়ুক দেখেই বুঝা যায় দু'জনে তারা রোগা হয়ে গেছে।

মায়া বলে, নিজেদের আপিসের এই এক জ্বালা—অতিরিক্ত খাটতে হয়।

সুনীল বলে, টাকা থাকলে লোক রেখে খাটানো যায়।

মায়া জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, কদ্দিন লাগবে কাগজটার দাঁড়াতে?

সার্কুলেশন বাড়ছে হু-হু করে। সেজন্য আবার টাকার দরকার। টাকা থাকলে এক বছরেই দাঁড় করিয়ে দিতে পারতাম। কিছু টাকা ধার করার ফিকিরে আছি।

কত?

হাজার কয়েক।

ও বাবা! তুমি এখন কাগজের মালিক, হাজার ছাড়া কথা কও না।

১৩

জরিমানার মোটা টাকা দিতে নন্দা প্রায় ফতুর হয়ে গিয়েছিল। প্রদ্যোৎ জেল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তার টাকা শেষ হয়ে যায়।

অথচ এদিকে কাগজটার চাহিদা বেড়েছে প্রচুর, বেরোনো মাত্র হু-হু করে বিক্রী হয়ে যায়। বেশী সংখ্যায় কাগজ ছাপাবার জন্য আবার বেশী টাকা ঢালা দরকার।

সুনীল অনেক চেষ্টা করে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে হাজার আষ্টেক টাকা ধার সংগ্রহ করেছে। বাঁধা রাখতে হয়েছে কাগজটিরই গুডউইল।

ভদ্রলোকের নাম হেমন্ত বাবু। পয়সাওলা লোক, একটি বড় প্রেস এবং একটি সাপ্তাহিক কাগজ আছে। তার একটি চালু দৈনিক কাগজের মালিক হবার সাধ। ওই আশা মনে রেখেই সে ঋণের টাকাটা যুগিয়েছে।

টাকা ফেরত পাওয়ার বদলে স্বনীলরা কাগজটা তার হাতে তুলে দিক, এটাই হেমন্ত আশা করে।

বিভূতি যে জোর গলায় বলে কাগজটা কখনও বন্ধ হবে না, তারা না চালালে অন্যেরা কাগজ চালাবে, সেটা মিথ্যা নয়। স্বনীলের পরিচালনাধীনে আসবার পর অল্পদিনের মধ্যে যে রকম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কাগজটা, তাতে অনেকেরই টনক নড়েছে।

ভবিষ্যৎ আছে কাগজটার।

বেশী দূর ভবিষ্যতও নয়। যথেষ্ট টাকা নেই বলেই কাগজটার উন্নতি ঠেকে আছে—টাকা থাকলে অবিলম্বে সার্কুলেশন দ্বিগুণ করে দেওয়া যেত।

লোকে টাকা দিতে চায়। অঘোরের মত আরও অনেকেই কাগজটার পিছনে টাকা ঢালতে উৎসুক।

প্রস্তাবও পাঠিয়েছে কয়েকজন।

কিন্তু মুস্কিল এই, প্রতিদানে তারা মালিকানার বড় অংশ চায়, কাগজটার উপর সম্পূর্ণ কণ্ট্রোল চায়।

নন্দা বলে, না। আপনাকে অংশ দিয়েছি কাগজটা চালাবার জন্য। কাগজ আমি মরে গেলেও অন্য লোককে বিক্রী করতে পারব না।

স্বনীল বলে, কিন্তু সামনে যে বিপদ দেখতে পাচ্ছি? হেমন্ত বাবুর টাকা শোধ দেবার সময় এগিয়ে আসতে আসতে আরও কিছু টাকা ঢালার দরকার হবে—ওদিকে হেমন্তবাবুর টাকাও শোধ করে ফেলতে হবে।

নন্দা নির্ব্বিকার ভাবে বলে, সে ব্যবস্থা আপনি করবেন। এমনিই আপনাকে মালিকানা দিয়েছি নাকি কাগজটার?

স্বনীল শান্তভাবেই বলে, সহজে ছাড়ব ভাববেন না। সর্ব্বদা ওই চিন্তাই করছি। লম্বা মেয়াদে মোটা একটা টাকা জোগাড় করতে পারলে আর ভাবনা থাকে না। সে কথা ভেবেই হেমন্তবাবুর কাছে এত অল্প মেয়াদে টাকাটা নিয়েছি—

ঠেক্‌নো দেওয়ার জন্য। লম্বা মেয়াদে টাকা পেলেই ওর টাকাটা ফেলে দেব। লম্বা মেয়াদে টাকা পাওয়াটাই এখন সমস্যা।

প্রদ্যোৎ বলে, পাওয়া যাবে মনে হয়। খুব নাম হয়েছে কাগজটার।

সুনীল বলে, ওটাই তো আমাদের আসল মূলধন। এতদিন ওটাই বাড়াবার চেষ্টা করেছি। আমি জানতাম ওই মূলধনটি আগে বাড়িয়ে না নিলে টাকার মূলধনও যোগাড় করা কঠিন কাজ হবে।

মায়া একদিন সন্ধ্যার পর একটু রাত করেই কাগজের আপিস ঘুরে দেখে যায়।

কর্মব্যস্ত মানুষগুলির মধ্যে সুনীলের কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করে সে আজ অনুভব করে, সুনীল কেন সেদিন অতবড় একটা গুরুতর কথা তুলেও একেবারে চুপ হয়ে গেছে।

অন্য সকলে কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সুনীল যেন একেবারে মশগুল হয়ে ডুবে গিয়েছে তার কাজের মধ্যে। তার কাছে যেন ছোট কাজ বড় কাজ নেই, সাধারণ সংবাদ ও বিশেষ সংবাদ বা সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পার্থক্য নেই গুরুত্বের হিসাবে, তার কাগজে যা ছাপা হবে তার প্রতিটি লাইন তার কাছে মহা মূল্যবান।

ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখ আশা আনন্দ সব কিছু তার আশ্রয় করেছে কাগজটিকে। কাগজের চিন্তার তলে তার মধ্যে চাপা পড়ে গেছে মায়ার চিন্তা।

বিভূতি, শিশির আর প্রদ্যোতের সঙ্গে সুনীল পরদিনের সম্পাদকীয় নিয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা করে আর মায়া তাদের কথা শুনতে শুনতে সুনীলের মুখের দিকে চেয়ে ভাবে, সত্যই কি মানুষটার হৃদয় নেই ?

কিন্তু যার হৃদয় নেই একটা কাগজকে সে এমনভাবে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে কি করে ?

আলোচনা শেষ করে বিভূতিরা নিজের নিজের আসনে ফিরে চলে গেলে মায়া বলে, এলাম যখন, আপনাদের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে যাই।

সুনীল বলে, পয়সা লাগবে কিন্তু।

মায়া বলে, তা জানি। তুমি কি আর আমাকে রেয়াৎ করবে!

সুনীল বলে রেয়াৎ করতে পারি। একটা কাজ করবে?

কি কাজ?

তোমার স্কুলের বিষয়ে সংক্ষেপে একটা আর্টিকল লিখে দাও—রবিবারের কাগজে ছাপব। কি ভাবে স্কুলটা আরম্ভ হল, কি ধরণের ছেলেমেয়ে শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং, শেখে—ইংরাজীতে লিখতে পারবে তো?

মায়া হেসে বলে, তা কলমটলম ভেঙ্গে চেষ্টা করলে পারব বৈকি।

এমনি বিজ্ঞাপনের চেয়ে এই আর্টিকেলটা ঢের বেশী এফেক্‌টিভ বিজ্ঞাপন হবে। আর্টিকেলটার পারিশ্রমিক বাবদ তোমার স্কুলের বিজ্ঞাপন আমরা এক হপ্তা বিনা পয়সায় ছেপে দেব। খুব ছোট বিজ্ঞাপন কিন্তু, দু'ইঞ্চির বেশী নয়।

মায়ার বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা করে না।

মানুষ ও জীবনের কি বিচিত্র সমাবেশ ঘটে একটা খবরের কাগজের আপিসে!

সুনীলের সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা হয় না তার, কথা বলার সময়ও নেই সুনীলের। কিন্তু নানা শ্রেণীর নানা প্রকৃতির নানা অবস্থার মানুষেরা যে ভিড় করে আসছে সুনীলের কাছে, কেউ দাপটে কথা কইছে কারো কথা বিনয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে এবং সুনীল সকলকেই সামলে চলছে—জীবনের এক বিস্ময়কর নতুন নাটকের মত মনে হয় মায়ার কাছে ব্যাপারটা।

রাত ন'টার সময় মায়া উঠবে উঠবে ভাবছে অঘোর পর্য্যন্ত হাজির হয় কাগজটার আপিসে, সুনীলের সম্পাদনা পরিচালনার ছোটখাট আপিস ঘরে গিয়ে বসে। দেখেই টের পাওয়া যায় মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে অঘোরের। সুনীল তার আপিসের সাড়ে তিনশ টাকার চাকরী ছেড়েছে, তার কাছে আর্থিক সাহায্য পাবার আশা ছেড়েছে, নিজে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করার বদলে তাকে তার আপিসে আসতে বাধ্য করেছে। একি সোজা অপমান অঘোরের? মুস্কিল এই যে, সময় সময় মান অপমানের হিসাব রাখলে তার চলে না।

কারবারটা তো চালিয়ে যেতে হবে তাকে।

এ বাজারে কারবারে লাভ তুলতে হলে মান অপমানের হিসাব ভুলে যেতেই হয়।

ভাবের আবেগে একজন জুতো মারবে। জুতো খেয়ে তাকে দিয়ে যদি হাজার খানেক মুনাফার ব্যবস্থা সম্ভব হয়, জুতো না খেয়ে অঘোরের উপায় কি?

অঘোর জাঁকিয়ে বসে। সুনীল বর্মা চুরুট এগিয়ে দিলে সেই চুরুট একটা ধরিয়ে কয়েকবার কেসে সে জিজ্ঞাসা করে, কাগজ তো ভালই চলছে শুনলাম?

সুনীল বলে, সুনাম আর সার্কুলেশনের হিসাবে খুব ভালই চলছে।

অঘোর বলে, প্রতিভা নিজের রাস্তা খুঁজে নেবেই। প্রতিভাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। কিন্তু আবার সস্তা কাজেও লাগানো হয় কিনা, সেইজন্য আমার গা জ্বালা করে।

সুনীল জিজ্ঞাসা করে সস্তা কাজে? কি রকম সস্তা কাজ?

অঘোর বলে, ব্যবসাতেই দেশের সম্পদ বাড়ে, তুমি দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ঘায়েল করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছ। আমি তোমাদের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপি, আজকের কাগজে আমার ব্যবসাকে গাল দিয়েছ।

সুনীল এই প্রথমবার সকাল থেকে সেজে রাখা পান থেকে একটা মুখে দিয়ে, সিগারেটের একটা প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে হাতে নিয়ে শান্তভাবে বলে, আপনি এটা গায়ের জোরে বানিয়ে কথা বললেন। আপনাকে সেদিনও স্পষ্ট বলেছি, গাল দেওয়াটাই আমাদের কাগজের নীতিবিরুদ্ধ। গাল দিয়ে সমাজের রাষ্ট্রের রোগ সারানো যায় না, বরং নিজেদের খেলো হতে হয়। আমরা সমালোচনা করি। তাছাড়া, বিশেষভাবে আপনার ব্যবসার বিরুদ্ধে তো কোন কথা লেখা হয় নি? আপনার বক্তিগত ব্যবসার সঙ্গে নয়, আপনাদের ব্যবসা করার সীস্টেমটার সঙ্গেই আমাদের বিবাদ বেধেছে। আমরা সীস্টেমটার সমালোচনা করেছি, আপনার মনে হয়েছে আপনাকে বেছে নিয়ে গাল দিয়েছে।

বটে নাকি?

নিশ্চয়। আপনি তো শুনবেন না, বুঝবেন না।

তোমার মুখে একটু শুনি, বুঝবার চেষ্টা করি। কাল হয় তো কাগজে আমার নামে যাচ্ছেতাই গালাগালি ছাপিয়ে দেবে।

স্নীল ফস্ করে সিগারেটটা এবার ধরিয়ে ফেলে।

বলে, অত সস্তা কাগজ নয় আমাদের। ধরুন, আপনার সঙ্গে বিজনেস প্রতিযোগিতায় নেমেছে আরেকজন, তাকে গাল দিয়ে আপনার কাছে কিছু টাকা পয়সার আশা আমরা করব না।

সিগারেটে জোরে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে স্নীল বলে, দরকার হলে আমরা আপনার সমালোচনাও করব। কাগজে চোরাবাজারের বিবরণ দেব তিন কলম, চারের কলমে দেখিয়ে দেব আপনি কেমন ধরণের চোরাকারবার করেন।

স্নীল আবার জোরে সিগারেট টেনে বলে, আমি জেনে গেছি, এ কাগজটা বন্ধ করার জন্য আপনি কোথায় কোথায় কার কার কাছে ছুটোছুটি করেছেন। আমার কিছুই জানতে বাকী নেই। টাকা দিয়ে কাগজটা কিনতে না পারার রাগে আপনি আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছেন। শত্রুতা আমিও করতে পারি, কিন্তু আপনার অপিসে কাজ করে যে সব সিক্রেট জেনেছি, সে সব কাজে লাগানো হীনতা হবে, তাই চুপ করে আছি। ক্ষতি আমাদের বিশেষ কিছু করতে পারবেন না, গায়ের জ্বালায় আপনি বাঁদর নাচছেন খেলোয়ারদের হাতে।

বাঁদর নাচছে! অঘোর বাঁদর নাচছে! এই সেদিন পর্যন্ত অঘোরের নীতি-বর্জিত মুনাফা নীতির চোরা প্রক্রিয়ার ব্যবসায়ে সক্রিয় অংশ নেবার জন্য মাসিক সাড়ে তিনশ টাকা পেয়ে এসেছে স্নীল, আজ সে সেই ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে ছাঁকা দেড় কলম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখছে।

টেবিলের এক কোণে পিছনে বসে মায়ার কিন্তু মনে হয় একটু বোকামি করছে স্নীল, সস্তা বাহাদুরী করার ঝোঁকে অঘোরের মধ্যে অকারণে শত্রুতা সৃষ্টি করছে। অঘোরের মত খেলোয়াড় খেলোয়াড়দের হাতে বাঁদর নাচছে, একথাও মুখের উপর বলছে জোর গলায়।

আরও বেশী ব্যক্তিগত আক্রোশ জাগবে অঘোরের।

অঘোরের কথাবার্তা শুনলেই বুঝতে পারা যায় যে সে খবরের কাগজটা সম্পর্কে দাও মারার ফিকিরে এসেছে। আজ কাজ হাসিল না হলেও কিছু আসে যায় না। নিজের আপিসের বেতনভোগী কর্মচারী স্থনীলের কাছে এভাবে তার নত হয়ে আসার মানেই হল এই যে সে জানে স্থনীলের ব্যবসা-বুদ্ধির মধ্যে ছেলেমানুষীর ভেজাল আছে অনেকখানি।

নীতির জন্য আদর্শের জন্য সে অনেক কিছু বাস্তব স্থবিধা বলি দিয়ে মনে করতে পারে যে খুব লাভ করলাম, জিতে গেলাম।

ছেলেমানুষ আদর্শবাদীদের ঘাড় ভাঙ্গবার জন্য অনেক পাকা পাকা লোক যে চারিদিকে ওৎ পেতে থাকে, তাও অঘোরের অজানা নেই। এইটাই তার আসল ভয় স্থনীল সম্পর্কে। তার আপিসে চাকরী না করুক, দেনাপাওনার সম্পর্ক তাদের মধ্যে স্থগিত হয়ে গিয়ে থাক, একটা ঘনিষ্টতা তো স্থনীলের সঙ্গে তার সৃষ্টি হয়ে আছে। অনেক কাল ধরে অনেক ধৈর্য্য আর ক্ষমা দিয়ে তাকেই তো গড়ে তুলতে হয়েছে এই ঘনিষ্টতার সম্পর্ক।

আজ তাকে ডিঙ্গিয়ে যদি অন্য কেউ স্থনীলের আদর্শবাদিতার স্থযোগ নিয়ে তাকে বাগিয়ে বসে, নিজেকে অঘোর কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না।

স্থনীল কাত হবেই। শেষ পর্য্যন্ত ভেঙ্গে যাবেই তার আদর্শবাদিতার এই চরম প্রচেষ্টা। কাগজটা তার বাগিয়ে নেবেই কোন একজন পয়সাওলা বাস্তববাদী ব্যবসায়ী মানুষ।

একটু নত হয়ে নিজেই স্থনীলের আপিসে এসে তার সঙ্গে আগেকার গড়ে তোলা আত্মীয়তার স্থযোগ নিয়ে কাগজটা বাগাবার পথ সাফ করে রাখলে দোষটা কি ?

স্থনীল নিজেই তো জানে না কি ভাবে কোন ফাঁদে সে ধরা দেবে। কোন মুখোস পরে কে আসবে তার কাছে, কি ভাবে তার বিশ্বাস জন্মাবে যে ইনি একজন খাঁটি মানুষ, নিরুপায় হয়ে অগত্যা এর কাছে আত্মসমর্পন করাই ভালো।

না। তা হতে পারে না। অঘোর তা হতে দিতে পারে না। সুনীলের আদর্শবাদী প্রতিভাও তারই সম্পত্তি! নিজের আপিসে দায়িত্বপূর্ণ চাকরী দিয়ে সে-ই সাহায্য করেছে বাঁচিয়ে রেখেছে তার এই প্রতিভাকে।

একমাত্র তারই অধিকার আছে তার প্রতিভার বিকশিত ফুলটিকে ফলটিকে গ্রাস করার।

সুনীলের মন্তব্যে অঘোর রাগে না দেখে মায়া তাই অবাক হয়ে যায়!

অঘোর মুখ গম্ভীর করে বলে, এটা তুমি অত্যন্ত অন্যায় কথা বললে, আমাকে অপমান করার জন্য বললে। আমি কি কাগজটা বন্ধ করতে চাই? না, এমনি বোকা-হাবা মানুষ আমি যে সে চেষ্টা করতে গিয়ে অন্যের হাতে বাঁদর নাচব?

সুনীল বলে, কাগজটা আপনি কিনে নিয়ে কণ্ট্রোল করতে চান। আপনি অন্যায়ভাবে সে চেষ্টা করছেন—আমাদের কাবু করে বাগে আনতে চাইছেন।

অঘোর টেবিলে চাপড় মেরে বলে, তবেই দ্যাখো তোমাদের আদর্শের মধ্যে কত গলদ। দরকার হলে তোমরা আমাকে খোঁচা দেবে, আমি টাকা দিতে চাইলেও আমাকে ডিঙিয়ে হেমন্তের কাছে টাকা ধার করবে, আর আমি ব্যবসায়ী মানুষ, আমার মেথডে কাগজটা কিনবার চেষ্টা করলে তোমরা বলবে সেটা আমার অন্যায়! তোমরা আমায় কাগজটা বেচবে না, আমি কাগজটা কিনবার জন্য ফন্দি ফিকির খাটাবো, এতো ক্লিন কম্পিটিশন! কেউ যাতে তোমাদের টাকা ধার না দেয়, হেমন্ত যাতে টাকার জন্য চাপ দেয়—সে চেষ্টা করার মরাল রাইট আমার পুরোমাত্রায় আছে!

এবার সুনীল একটু হাসে। আর তর্ক করে না।

মায়া এবার মুখ খোলে, বলে, আমার একটা নালিশ আছে অঘোরবাবু।

নালিশ?

মায়া বলে, একটা স্কুল চালিয়ে সংসার চালাচ্ছি, সেটাও কি চালাতে দেবেন না আমাকে ?

অঘোর চমকে ওঠে।

অঘোরের হৃদপিণ্ডের পুরাণো রোগটা যেন সুযোগ পেয়ে তাকে অবশ করে রাখে কয়েক মুহূর্তের জন্য।

মায়া বলে, স্কুলের ক'জন ছেলে নালিশ করেছে, আপনার আপিসে নাকি চাকরী করা দায়—আপনি ছ'মাস এপ্রেন্টিস খাটিয়ে ওদের বিদায় করে দিচ্ছেন। স্কুলটা তাহলে বন্ধ করে দি' ?

অঘোর বিব্রতভাবে বলে, কাজ করতে পারলে আমি কি সহজে কাউকে ছাঁটাই করি ?

মায়া বলে, আপনি কি করেন না করেন আমি কি করে জানব বলুন ? ছোটখাট স্কুল—বছরে মোটে কয়েক জন ছেলেকে সার্টিফিকেট দিতে পারি যে হ্যাঁ, তুমি যে কোন আপিসে কাজকর্ম করতে পারবে। আপনি আমার স্কুলের পাঁচ ছ'টি ছাত্রকে ছ'মাস ধরে এপ্রেন্টিস খাটিয়ে বিদায় করেছেন। ছ'মাস এপ্রেন্টিস খাটার জন্য কে কার গরজে আমার স্কুলে শিখতে আসবে বলুন ?

সুনীল ডাকে, অভয়।

অভয় দরজার কাছেই ছিল, ভিতরে এসে সে বলে, কি বলছেন ?

সুনীল বলে বিভূতি শিশির প্রদ্যোত বাবুদের আসতে বলো। আজ এডিটোরিয়েলটা বদলে যাবে।

অঘোর নিশ্বাস ফেলে বলে, শেষ পর্যন্ত আমাকে গাল দেওয়াই ঠিক করলে ? সুনীল আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, আপনাকে গাল দেব ? কেন ? আপনাকে গাল দিয়ে লাভ কি হবে ? আপনি বরং খানিকটা পাবলিসিটি পেয়ে যাবেন। আমরা আজ আবোল তাবোল ছাঁটাই করার প্রতিবাদ করব। যে কোন ইয়ং-ম্যানকে ছ'মাস এপ্রেন্টিস খাটিয়ে আপনারা তাড়িয়ে দিতে পারেন, পুরাণো পাকা লোককে যখন খুসী যে কোন অজুহাতে তাড়াতে, পারেন, শক্ত

আইন করে আপনাদের এ অধিকার কেড়ে নিতে হবে। অন্য আপিসে অন্যায় ছাটাই-এর আরও কয়েকটা উদাহরণ জানি, সেই সঙ্গে আপনার আপিসের ছাটাইটারও উল্লেখ করব।

অঘোর রেগে বেরিয়ে যায়।

অঘোর চলে যাবার পর স্থনীলকে প্রথমবার একা পেয়ে প্রায় মায়া ধমকের স্বরে বলে, এখনো তোমার ছেলেমানুষি গেল না? ছি!

মায়ার গলায় এমন কড়া আওয়াজ স্থনীল অনেকদিন শোনে নি। সে আশ্চর্য্য হয়ে বলে, কি বলছ?

বলছি লোকের সঙ্গে এত বাহাদুরি করা কেন? নিজের রীতিনীতি, কাগজটার রীতিনীতি, সব ফাঁস করে দেওয়া হল মানুষটার কাছে। অত কথা বলার কি দরকার ছিল তোমার? তোমার কথার আসল মানে বুঝবে ও মানুষটা? ভদ্রলোক যেচে তোমার কাছে এসেছে নিজের স্বার্থে, তোমার অবস্থাটা নিজে যাচাই করাই ওর উদ্দেশ্য। কি দরকার ছিল তোমার অত বড় বড় কথা বলে বড়াই করার, নিজেকে জাহির করার? ঠিক যেন কচি খোকার মত করলে, ঘরের কথা শত্রুর কাছে ফাঁস করে দিলে। ভদ্রলোক তোমাকে এতটুকু বাহাদুর ভাববে মনে করেছ?

স্থনীল মন দিয়ে তার কথাগুলি শোনে। তার তিরস্কার যেন মাথা পেতে নিয়েছে এমনিভাবে বলে, উনি আমার কি করবেন?

মায়া বলে, এটাই তোমার ছেলেমানুষী। কিছু করতে পারুন না পারুন, শত্রু বাড়াবে কেন তুমি মিছিমিছি? উনি কিছু করতে পারবেন না, তাই বা কি করে জানলে তুমি? আমার তো মনে হয় উনি আজকালের মধ্যেই উঠে পড়ে শত্রুতা আরম্ভ করবেন, দু'চার দিনের মধ্যে দেখতে পাবে কাগজ চালাতে যাদের সঙ্গে কারবার করতে হয় তাদের ব্যবহার কেমন বদলে যাচ্ছে! চাপ দেবার ব্যবস্থা করবেন। আমি বলে রাখছি, কাগজওলা, ছাপাখানার মালিক, যারা বিজ্ঞাপন দেয়, পাওনাদার সবাই হঠাৎ অভদ্রতা আরম্ভ করে দেবে। তুমি যখন চোখে সর্ষেফুল

দেখতে আরম্ভ করবে, উনি এসে কাগজটা কিনে নিয়ে তোমায় বাঁচিয়ে দিতে চাইবেন !

সুনীল বলে, সে তো বুঝলাম, ওটা উনি অনেকদিন থেকেই চাইছেন। কিন্তু আমি তো আজ নতুন কথা কিছুই বলি নি ? কয়েকদিন আমাদের কাগজ পড়লেই বোঝা যায় আমরা কি নীতি ধরেছি। সেটাই আমি সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলেছি অঘোরবাবুকে।

মায়া বলে, কাগজ পড়ে জানা আর তোমার মুখে শোনার মধ্যে অনেক তফাৎ। কাগজে তুমি কি উদ্দেশ্যে কি নীতি খাটাচ্ছ তাতো সব লোকে জানবে না ? অঘোরবাবুর মত লোকেরা ধরেই নেবে একটা কোন মতলব হাঁসিল করার জন্য তুমি একটা নীতি ধরেছ, দরকার হলে অদল বদল করবে। কিন্তু তোমার মুখ থেকে শোনা মানেই উনি জেনে গেলেন ওই নীতিটা আঁকড়ে থাকাই তোমার উদ্দেশ্য।

সুনীল ভুরু কুঁচকে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মায়া আবার বলে, এই নীতি তুমি কিছুতে ছাড়বে না, ওঁর সঙ্গে কোনমতেই আপোষ করবে না, এটা আজ উনি পরিষ্কার স্পষ্টভাবে জেনে গেলেন। তুমি কতটা শক্ত হবে এটা ওর ধারণা ছিল না। তুমি আজ ভেতরের কথা ওর কাছে ফাঁস করে দিলে।

সুনীল বলে, তোমার কথাটা মানতে হচ্ছে।

কাজেই ছেলেমানুষী করলে না ? ওর নানা রকম খটকা ছিল, কতটা চাপ দিতে হবে জানতেন না, আজ জেনে গেলেন আপোষে কিছু হবে না, তোমাকে ভাঙ্গতেই হবে।

তোমার তো খুব ধারাল বুদ্ধি !

ধারাল বুদ্ধি নয়। এসব সাধারণ সাংসারিক জ্ঞান ছাড়া মেয়েমানুষের চলে না। বাড়ী ফিরবে না আজ ?

ফিরব। চলো তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি। আজ বাড়া গিয়ে একচোট ঘুমোব। টাকার চিন্তাটাকে বড় বেশী প্রশ্রয় দিচ্ছি।

ট্রামে বাসে তখন ভিড় কমেছে। মায়ার পাশে বসে সুনীল বলে, ছ'মাসের মধ্যে মোটর গাড়ীতে বাড়ী ফিরব।

তাই নাকি!

নিশ্চয়। তার মানে কিন্তু ধরে নিও না যে খুব বড় লোক হয়ে যাব বলছি। কাগজ চালাবার জন্যই গাড়ী দরকার হবে। হবে কেন—হয়েছে। সময়ের দাম সম্পর্কে আমার নতুন জ্ঞান জন্মে গেছে।

সময়ের দাম সম্পর্কে নতুন জ্ঞান?

আগে ধারণা ছিল, যে খুব কাজ করে, প্রাণপাত করে খাটে, তার কাছেই সময় হয় দামী। এখন দেখছি ও ধারণাটা ভুল। সময়ের দামটাও কাজের দামের ওপর নির্ভর করে। খাটুনিটা আসল নয়, কাজের কোয়ালিটিটাই আসল কথা। যার দায়িত্ব যত বেশী, যার কাজের ওপর যত বেশী লোকের কাজ নির্ভর করে, তার সময়ের দাম তত বেশী।

মায়া একটু হেসে বলে, এতদিনে জানলে এটা? কাজ তো ছোট-বড়, উঁচুনীচু হয় না—একমাত্র দায়িত্ব দিয়েই কাজের বিচার চলে।

মায়া কি আশা করছিল, বাস থেকে নেমে বাড়ীর পথটুকু একসঙ্গে হেঁটে যাবার সময়, তাদের নিজেদের কথাটা খেয়াল হবে সুনীলের?

কিন্তু আশা করে সে এমন অশ্বস্তি বোধ করে কেন! কেন তার মনে হয় যে এই সুযোগে আজ সুনীল কথাটা পাকাপাকিভাবে ঠিক করে ফেলতে চাইলে সে মুস্কিলে পড়ে যাবে?

এখনও সে সব দ্বিধা কাটিয়ে অতখানি মনস্থির করে ফেলতে পারে নি।

সেদিনের আলোচনার পর সে ভেবেচিন্তে দেখেছে বিয়ের পর যতই তারা চেষ্টা করুক—যে যেমন আছে তেমনি থাকতে, সেটা সম্ভব নয়।

১৪

বাড়ী গিয়ে এতরাত্রে নবীনকে দেখে স্নুনীল একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। আল্পনার সঙ্গে সেদিন নবীনকে নিয়ে তার কথা হবার পর কেটে গেছে অনেকগুলি দিন, নবীন তার সঙ্গে কথা বলতে আসে নি।

ক্রমে ক্রমে ক্রুদ্ধ ও গম্ভীর হয়ে উঠছিল আল্পনার মুখ।

স্নুনীলের সামনে মাঝে মাঝে তার মুখ লাল হয়ে যায়। দাদার কাছে লজ্জা আর অপমানেই নিশ্চয়! সেদিন সে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিয়েছিল নবীনের প্রতিজ্ঞা, বড়াই করে বলেছিল, নবীনকে দিয়ে সে দাদার সঙ্গে কথা বলাবে।

এবং স্নুনীল অনুমান করছিল শীঘ্রই নবীনের একদিন তার কাছে আবির্ভাব ঘটবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্য। কিন্তু রাত্রে সে আজকাল সব দিন বাড়ী ফেরে না জেনেও এতরাত্রে নবীন এসে তার জন্য অপেক্ষা করবে এটা সে ভাবতে পারে নি।

কথা সে নিজেই আরম্ভ করে।

কি খবর নবীন?

বিভাদি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। কখন বাড়ী থাকেন জানতে এসেছিলাম। কাল সকালে আসতে বলব?

নবীন সহজভাবেই কথা বলে। জীবনে কোনদিন কথা বলবে না ঘোষণা করে কয়েক মাস সত্যই সে যে বাক্যালাপ বন্ধ রেখেছিল স্নুনীলের সঙ্গে, সেটা টেরও পাওয়া যায় না। আজ প্রথম নতুন করে কথা আরম্ভ করবার সময় একটু সঙ্কোচ বোধ করা তার পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তার ভাব দেখে মনে হয় কথা বলাটা স্নুনীলের উপর যেন তার অনুগ্রহ!

সুনীল বলে, বিভার আসতে হবে না। কাল আমি ওদের বাড়ী যাব।

নবীন বলে, বিভাদি আপনাকে জানাতে বলেছে যে আপনি যদি যান এগারোটার পরে যাবেন।—অঘোরবাবু আপিস চলে যাবার পর।

কেন?

তা কিছু বলে নি।

আল্পনার সঙ্গে দেখা না করেই নবীন বিদায় নেয়।

ভেতরে গিয়ে আল্পনা শুয়ে পড়েছে শুনে সুনীল ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আরও আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

তার খাতিরে নবীন আজ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে এসেছে, তাকে বাইরে বসিয়ে রেখে আল্পনা শুয়ে পড়েছে।

আল্পনা বোধ হয় জানে না নবীন আজ তার মান রাখবার জন্য এসেছে, তার কাছে বোধ হয় নবীন প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গতে রাজী হয় নি, পরে ভেবে চিন্তে মত পরিবর্তন করেছে।

রাগে অভিমানে আল্পনা হয় তো নবীনের সঙ্গে দেখাও করেনি, নবীন তার মান রাখতে এসেছে না জানায়, কথাও বলে নি।

সে খেতে বসলে আল্পনা উঠে আসে।

নবীন নিজে থেকে কথা বলেছে নাকি তোমার সঙ্গে?

বলেছে। নিজে থেকে নয়, আমিই আগে বলেছি। সেটা কিন্তু ওর দোষ নয়, আগে কথা বলার সুযোগটাই বেচারা পায় নি। তোদের কি হল? ঝগড়া হয়েছে নাকি?

আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করেছে।

কেন?

তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে জোর করেছি যে।

বাঃ! চমৎকার ব্যাপার তো তোদের!

আল্পনা মুখ বাঁকায়।

সুনীল হেসে বলে, দাদার বদলে বোনের সঙ্গে কথা বন্ধ করে ও নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে চায় নাকি ? প্রতিজ্ঞার ব্যাপারেও প্রক্সী চলে ?

আল্পনা বলে, কথা আমাদের বন্ধ হতই।

কেন ?

তোমার সঙ্গে কথা না বললে আমি ওর সঙ্গে কথা বন্ধ করতাম—করতাম কি, করেছিলাম।

পরদিন বারটা নাগাদ অঘোরের বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে সুনীল ভাবে, কাল অঘোরের সঙ্গে সংঘর্ষের পর আজ বোধ হয় তার বাড়ীতে তার না যাওয়াই উচিত ছিল। অঘোরের বাঁকা মন কি ভেবে বসবে কে জানে !

বিভা তার বাড়ীতে গেলেও অঘোর অবশ্য খবর পেত কিন্তু সেটা হত আলাদা ব্যাপার। তার সঙ্গে বিভার তো বিবাদ হয় নি !

বিভার মুখখানা এত বেশী ম্লান দেখায় যে সুনীলের মনে হয় তার বুঝি জ্বর এসেছে।

জ্বর গায়ে বসে আছ কেন ?

জ্বর কে বললে ?

মুখ দেখে মনে হচ্ছে।

বিভা মাথা নেড়ে বলে, জ্বরটর হয় নি। খুব জরুরী কথা আছে তোমার সঙ্গে।

সুনীল সিগারেট ধরিয়ে নীরবে প্রতীক্ষা করে।

বিভা বলে, তোমাকে নিয়ে বাবার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেল।

ব্যাপার কি ?

কাল বাবা বাড়ী এসে যা-তা বলতে লাগলেন তোমার নামে। তোমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তুমি নাকি উচ্ছন্নে যেতে বসেছ, কাগজটা খুব ভাল দাঁড় করানো যেত কিন্তু তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেছে বলে তুমি কাগজটার ভবিষ্যতও নষ্ট করছ, নিজেরও সর্ব্বনাশ ডেকে আনছ। শুনতে শুনতে এমন রাগ হয়ে গেল

আমার। আমি তোমার দিকে টেনে বলতে গেলাম যে, টাকা টাকা করে পাগল হওয়ার চেয়ে তোমার মত মাথা খারাপ হওয়া ঢের ভাল। বাবা চটে লাল হয়ে চলে গেলেন। তোমার সঙ্গে বুঝি একচোট বেধেছিল কাল?

বেশী বাধে নি, উনি কাগজটার জন্য টাকা দিতে চান আমি টাকা নেব না, এই হল ওঁর আক্রোশের কারণ। উনি আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। আমি কাগজটার আসল মালিক নই, অংশীদার। কাগজটার যিনি মালিক তিনি মালিকানা বিক্রী করবেন না—কাগজ বরং বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু অন্যের হাতে যাবে না। কাগজটা আরম্ভ করে তার স্বামী মারা যান। অঘোরবাবু ধরে নিয়েছেন আমি নিজের স্বার্থে ওর সাধে বাদ সাধছি।

বিভা বলে, বাদ সাধলেই বা? তোমার কাগজের জন্য বাবা লোভ করবে কেন? সখ হয়ে থাকলে একটা কাগজ বার করলেই হয়, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে কি করবে এদিকে তো ভেবে পায় না।

তুমি ভারি চটেছ দেখছি।

চটব না? নিজের বাপ এরকম ছোটলোক হলে কেমন লাগে তুমি কি বুঝবে!

রাঁধুনী প্লেটে খাবার দিয়ে যায়।

বিভা বলে, আমি তৈরী করেছি, যেমন হয়ে থাক, খেতে হবে। বসে বসে একটু একটু রাঁধাবাড়া খাবার করা এসব কাজ করছি আজকাল। ভাত খেয়ে বেরিয়েছ বললে শুনব না।

আমি তা বলবও না। তোমার বাড়ী এলে পেটে যায়গা নিয়েই আসি। না খেলে যে ছাড়বে না এটা আমার জানাই আছে।

বিভা খুসী হয়। তার ম্লান মুখে সানন্দ হাসির আভায পর্য্যন্ত দেখা যায়।

কিন্তু অল্পক্ষণেই মিলিয়ে যায় তার হাসিখুসী ভাব। বলে, তোমায় সাবধান করে দিতে ডেকেছি। বাবা তোমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।

মায়ার ভবিষ্যদ্বাণী স্থনীলের মনে পড়ে যায়। মায়া ঠিকই ধরেছিল যে তার

সঙ্গে কথা বলে অঘোর যেহেতু টের পেয়েছে যে, এ কাগজে মাথা গলাবার সুযোগ সে পাবে না, সেই হেতু এবার থেকে অঘোর তাকে মুস্কিলে ফেলবার চেষ্টা বিশেষ ভাবে আরম্ভ করবে।

বিভা বলে, টাকা টাকা করে নাকি পাগল হয়েছো অথচ বাবা টাকা দিলে নেবে না, এইভাবে তুমি শত্রুতা করছ বাবার সঙ্গে। বাবাও তাই শত্রুতা করবে।

পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাবার খেতে খেতে সুনীল নিশ্চন্তভাবেই বলে, বুঝতে পারছি। কি আর করা যাবে!

তোমার সত্যি খুব টাকার দরকার?

টাকার চিন্তায় পাগল হতে বসেছি। টাকা যোগাড় করতে না পারলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। টাকার চেষ্টা করতে নেমে সব যায়গায় ওই একরকম ব্যাপার দেখছি। টাকা দিয়ে কাগজটা বাগানোর উদ্দেশ্যে ছাড়া কেউ টাকা দিতে রাজী নয়।

সুনীল ক্ষোভের হাসি হাসে।

সমস্যাটা দাঁড়িয়ে গেছে খুব সোজা। কাগজটার জন্য যাদের দরদ আছে, তাদের নেই টাকা, আর যাদের টাকা আছে কাগজটার নীতির জন্য তাদের নেই মাথা ব্যথা।

বিভা বলে, তোমায় বলতে সাহস হয় না—আমি লুকিয়ে হাজার পঁচিশেক টাকা দিলে নেবে?

অত টাকা কোথায় পাবে?

টাকা আমার নামে জমা আছে।

অঘোরবাবু টের পেয়ে যাবেন।

পরে টের পেলে আর কি হবে? একটু রাগারাগি করবে—বাস্। মেরে তো আর ফেলতে পারবে না নিজের একটা মেয়েকে।

সুনীল স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে।

বিভা প্রশ্ন করে, কি ভাবছ?

ভাবছি তোমার টাকা আর তোমার বাবার টাকায় তফৎ কি

তফাৎ নেই? এটা আমার নিজের টাকা।

তোমার বাবাই তো তোমাকে দিয়েছেন।

দিয়েছেন বলেই তো ওটা আমার টাকা। নইলে দেওয়ার কি মানে হয়? ও টাকায় কেবল আমার অধিকার।

সুনীল একটু হেসে বলে, সে তো বুঝলাম, মেয়ে বলেই তোমার অধিকার। আমি কোন অধিকারে তোমার টাকা নেব?

বিভা সঙ্গে সঙ্গে বলে, তুমি তো নিচ্ছ না! আমি তোমাকে টাকা দেব বলছি নাকি? তোমায় কেন টাকা দিতে চাইব! তোমার সংসারে কত টানাটানি, কোনদিন বলেছি পাঁচটা টাকা নাও?

সুনীল বলে, বললে আমাকে অপমান করা হবে তাই বলনি, নইলে মনে মনে ইচ্ছা কি আর হত না। বড়লোকের মেয়ে হবার জ্বালা আমিও খানিক বুঝি। কোনদিন সাহস করে একটা জিনিষ কখনো আমার ভাইবোনকে প্রেজেণ্ট দিতে পার নি।

বিভাও হাসে, অনেককে প্রেজেণ্ট দিই—টাকাও দিই। নিজে না দিলে চেয়ে নেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তুমি সঙ্কোচ বোধ করছ কেন? টাকাটা সত্যিই তো আমি তোমায় দিচ্ছি না! আদর্শের জন্য জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য কাগজটা চালাচ্ছ—এ একটা খুব বড় কাজ, ভাল কাজ। কাগজটার জন্য আমি টাকা দিচ্ছি, কোন লোককে নয়।

সুনীল বলে, ভাল কাজের জন্যও সব অবস্থায় সকলের টাকা নেওয়া যায় না—বিপরীত ফল হয়।

বিভা বলে, আচ্ছা, টাকাটা তো আমি দান করছি না, তোমরাও একেবারে নিয়ে নিচ্ছ না। অন্য লোকের কাছে ঋণ নিতে, আমার কাছ থেকেও ঋণ হিসাবেই টাকা নেবে। কাগজ দাঁড়ালে, লাভ হলে আমার টাকা ফিরিয়ে দিও—মিটে গেল।

সুনীল একটু ভেবে বলে, এ যুক্তিটা তুমি ভাল দিয়েছে। টাকার এমন

দরকার যে ভেতর থেকে তাগিদ আসছে তোমার যুক্তিটা চোখ কান বুজে মেনে নিই।

মেনে নাও না?

সুনীল এবার গম্ভীর হয়ে যায়।

কিন্তু ভাববার কথাও আছে! অনেক গুরুতর দিক ভাববার আছে। অন্যেরা যে টাকা ধার দেবে, তারা দেবে লাভের আশায়, অনেক কঠোর সর্ত থাকবে। কাগজের নীতিনিয়ম কণ্ট্রোল না করুক, কাগজ চালানোর ব্যবসার দিকটা খানিক কণ্ট্রোল করবে—আমাদের দোষে তার টাকা না মারা যায়। আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা লোকের বুঝতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু তোমার কাছে টাকা নিলে—

সুনীল থেমে যায়।

বিভা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

সুনীল, বলে, বুঝতে পারছ না? খবরটা অজানা থাকবে না, একটা খবরের কাগজের ব্যাপার। আমি নিজে নিলে হয় তো গোপন রাখা যেত। লোকে শুনেই জিজ্ঞাসা করবে বিভা কেন এতগুলি টাকা দেয়? চেনা তো এক সুনীলবাবুর সঙ্গে, তার কাগজটার জন্য ওর অত মাথাব্যাথা কেন? দরদটা কাগজের জন্য না লোকটার জন্য? কিছু নিশ্চয় তাহলে আছে দুজনের মধ্যে!

বিভা খানিকক্ষণ ঠোঁট কামড়ে থাকে।

তাই বটে! কেবল আমার নয়, তোমারও বদনাম হবে।

সুনীল হাসিমুখে বলে, তোমার একার হলে বুঝি উড়িয়ে দেওয়া যেত? টাকা দিয়ে তুমি বদনাম কিনবে সেটা তুচ্ছ কথা নাকি?

যাওয়ার আগে সুনীল বলে, টাকাটা নেব না বলি নি কিন্তু। ভাববার জন্য সময় নিচ্ছি। কেবল বদনামের দিকটা নয়। আরও ভাববার দিক আছে। যেমন ধরো, ঠিক এই সময় কাগজটা বাঁচাতে তুমি টাকা দিলে অঘোরবাবু ক্ষেপে যাবেন। মেয়েকে মেরে ফেলতে না পারলেও অশান্তির সীমা রাখবেন

না মেয়ের জীবনে। শুধু এটাও নয়—আরও ভাববার কথা আছে! কদিন ভেবে দেখা যাক।

সবকিছুই যেন দাঁড়িয়ে যেতে চায় জটিল সমস্যায়! অনিল আর ছায়ার সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এটাই তাদের ধারণা ছিল। দুজনে যোগ্যতার পরিচয় দিলে ভবিষ্যতে বিয়ের কথা ভাবা যাবে, এখন ও বিষয়ে চিন্তা করারও প্রয়োজন নেই।

কিন্তু দেখা যায় এত সহজে সমস্যা এড়ানো যায় না।

মায়া বলে, এতো আরেক বিপদ হল!

কি বিপদ?

ছায়াকে সব বুঝিয়ে বললাম। ওর বিষয়ে ব্যবস্থার কথাও বললাম। মেয়ে বলছে তা হবে না।

সুনীল আশ্চর্য হয়ে বলে, বিয়ে হবে না জেনেও বলছে?

মায়া বিব্রতভাবে বলে, বলছে বৈকি! সোজা স্পষ্ট—না। বলছে, ও ভুল করেছে, বোকামি করেছে, কিন্তু এমন কোন পাপ করে নি যে, সেজন্য আরেকটা অন্যায় করতে হবে। মেয়ে আমাকে পট পট করে কত কথা শুনিয়ে দিলে! কোন মুখে আমরা বলছি এটা বিজ্ঞানের যুগ—আবার আমরাই সেকেলে অসভ্য ব্যবস্থা ধরছি। বিজ্ঞানের যুগে বুঝি অকারণে ভবিষ্যৎ একটা মানুষকে খুন করা হয়! আমরা সেকেলে তাই আমরা কথাটা ভাবতে পেরেছি। অনায়াসে বলেছে, খুসী হলে ওকে তাড়িয়ে দিতে পারি, ও নিজের ব্যবস্থা করে নেবে।

বটে!

কি বললে শুনবে? বললে, মরব তো আর না, কত নিরাশ্রয় উদ্বাস্তু মেয়ে চাল বেচে গতর খাটিয়ে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

সুনীল বলে, এসব অনিলের শেখানো কথা। আমাদের ওপরে চাপ দিচ্ছে।

মায়া বলে, নরম হতে হবে নাকি আমাদের? মেয়ে কিন্তু গোঁ ছাড়বে না মনে হচ্ছে!

ভালই তো। দু'জনে পরামর্শ করে যদি এটা ঠিক করে থাকে, শুধু আমাদের চাপ দিয়ে কাবু করার জন্য না করে থাকে, তার চেয়ে আনন্দের কথা কি হতে পারে বলো? যারা বিগড়ে গেল বলে আপশোষ করছিলাম, যাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলাম, তারা প্রমাণ দিচ্ছে মনুষ্যত্বের। কোন অন্যায় তারা করে নি, কোন জোড়াতালি ব্যবস্থা মানবে না। এতটা মনের জোর যদি ওরা দেখাতে পারে তবে তো কোন ভাবনাই থাকে না ওদের সম্পর্কে।

একটু থেমে বলে, আমরা নরম হব না। ওদের দায়—আমরা উদ্ধার করে দেব না। তা হলেই সব কেঁচে যাবে। আমরা সাহায্য করব, যত রকমে পারি করব—কিন্তু লড়াই করে উঠতে হবে ওদের। সে জন্য দু'তিন বছর সময়ও যদি লাগে, কি এসে যায়?

মায়া নিশ্বাস ফেলে বলে, মা বাবাকে নিয়েই সমস্যা! ওরা না হার্টফেল করে!

সুনীল বলে, আজ আশা হচ্ছে অতদূর গড়াবে না। অনিল যা হোক কিছু রোজগার করছে। আমি ওকে জানিয়ে দেব যে ওই টাকায় ছায়াকে নিয়ে বস্তির ঘরে যদি চালাতে পারে, আমি সংসারের জন্য কিছু চাইব না।

কল্পনার সমস্যা সহজ মনে হলেও মোটেই সেটা সহজ নয়।

এমন কোন জটিল মানসিক বিকার প্রণবের সঙ্গে তার বনিবনা না হবার কারণ নয় যে, সেটা বুঝবার জন্য সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব ঘাঁটা দরকার হয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে রুচির পরবর্তনটাই তার অসুখী হওয়ার জন্য দায়ী।

সিধা পথে বাঁধা নিয়মে তো ঘটে না পরিবর্তন—না বাস্তবতার না মানুষের রুচি প্রকৃতির।

ভাসা ভাসা বিচার করলে মনে হবে বুঝি একটা বিরাট এলোমেলো

বিশৃঙ্খল ব্যাপার—কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলেই ধরা পড়ে যায় মোট গতিটা সামনের দিকেই।

কিন্তু পরিবর্তনের খানিকটা এলোমেলো এগোনো পিছানো প্রকৃতির দরুণ সমস্যা ও সংঘাত সৃষ্টি হবেই। শেষ পর্যন্ত ক্ষতি অবশ্য তাতে নেই—সংঘাতেই সৃষ্টি হয় জীবনের গতি।

কয়েকটা দিকে কল্পনার রুচি গেছে বদলে, হয় তো সুনীলের জন্যই গেছে, ন্যাকামি ভাবালুতা তার পছন্দ হয় না। সে ভুলে গেছে যে তার ভাবপ্রবণতা নিয়ে সুনীলকে সে বিব্রত করে তুলে'ছিল বিয়ের আগে, এখনো করছে।

ভাবালুতা সে নিজেই কাটিয়ে উঠতে পারে নি, শুধু কয়েকটা দিকে কয়েকটা বিষয়ে বিশেষ ধরণের ভাবালুতা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

প্রণব বরং তার চেয়ে অনেক বেশী কম ন্যাকা, কম ভাবালু। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই, ঠিক যে বিশেষ ধরণের ন্যাকামি কল্পনার অত্যন্ত অপছন্দ সেই ন্যাকামির হিসাবেই প্রণব রয়ে গেছে পিছিয়ে!

তার জানাই ছিল না কল্পনাকে কিভাবে ভালবাসা উচিত। তার ধারণা, ভাবোচ্ছল গদ গদ প্রেম, দেহি পদ পল্লব মার্কা প্রেমই সব যুগে, সব মেয়ের কাম্য। ওই ভাবে ভালবাসতে গিয়ে একেবারে সে বিগড়ে দিয়েছে কল্পনার মন।

উপদেশ দিয়ে লাভ নেই। তবে কয়েকটা কথা জানিয়ে রাখা ভাল, পরে হয়তো কাজে লাগবে।

কল্পনাকে সে বলে, একেবারে বাজে বখাটে ছেলেমেয়েদের কথা বাদ, ওদের সংখ্যাটাও সব ছেলেমেয়ের হিসাবে নগন্য। যে সব ছেলেমেয়ে খুব তেজী সাহসী আর অনেকদূর এগিয়ে গেছে তাদেরও আমি হিসাবে ধরছি না। সাধারণ সমস্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে কি রকম একটা নতুন তেজ আর আত্মবিশ্বাস এসেছে, নানা ব্যাপারে জড়িয়ে থেকে নিজে না দেখলে আমি ধারণাও করতে পারতাম না। একটি ছেলের মধ্যে হয়তো অনেক দুর্বলতা আছে সেকেলে ভাব আছে, কিন্তু সেও যে কিভাবে নিজেকে নতুন দিনের নতুন জীবনের জন্য তৈরী করছে সে এক আশ্চর্য

ব্যাপার! সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই, সে এটা পেরেছে অবস্থার জন্য, অনেক দিকে পিছিয়ে থেকে অনেক দুর্বলতা বজায় রেখেও। আমি আজকাল আর নেগেটিভ দিক ধরে কোন ছেলেমেয়ের বিচার করি না। সব সময় পজিটিভ দিকটা দেখি।

কল্পনা মন দিয়ে শোনে। বলে, আরেক হাতা ডাল দেব? ডাল কমিয়ে তুমি বরং দু'একটা ডিম আর খানিকটা দুধ বাড়িয়ে দাও। আমরা ডাল ভাত চচ্চরি খাব—তুমি বুঝি তাই লজ্জা পাও ডিম দুধ খেতে? কিন্তু লজ্জা তুমি আমাদেরি দাও। আমরা যেন সেকেলে ভূত, আমরা যেন জানিনে এত খেটে শরীরটা বিগড়ে গেলে তুমি আর খাটতে পারবে না, আমরাই পড়ব বিপাকে। দুধ আর ডিম খেতে যা লাগে তার পঞ্চাশগুণ তুমি তখন ডাক্তার আর ওষুধে ঢালবে, আমরা কথাটি কইতে পারব না।

দুর্গন্ধ ভাত, সুনীল কষ্টে গ্রাসটা গিলে বলে, এ সংসারে তোর তো কথা কওয়ার কথা নয়!

এ সংসারেই থাকব ভাবছি।

সুনীল আর ভাতের থালার হাত দেয় না।

বলে, কাল পরশু প্রণব নিতে আসবে। এবার যদি না যাও আর কোনদিন সে আসবে না। তারপর নিজেকে মাথা নীচু করে যেতে হবে।

সুরমা বলে, তোমার বোনের মাথা অত সহজে নীচু হয না।

সুনীল ভাত ফেলে উঠে যায়।

পরের শনিবার প্রণব আসে। মুখখানা তার গম্ভীর নয়, একটা কঠিন প্রতিজ্ঞার চাপে কঠিন, অস্বাভাবিক।

কারো সঙ্গে ভালভাবে কথা কয় না, শ্বশুর বাড়ীর আদর আপ্যায়ন সম্পর্কে তার গভীর বিতৃষ্ণা দেখা যায়, খাবার ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শুধু চা-টুকু গিলে সে খবরের কাজগটা তুলে নিয়ে চেয়ারে পা তুলে বসে একমনে কাগজ পড়তে সুরু করে।

আল্পনা বলে, দাদা এই চিঠিটা রেখে গেছে আপনার জন্য।

প্রণব চিঠি লিখেই এসেছিল। শনিবার বিকালে এসে বিকালেই কল্পনাকে নিয়ে সে ফিরে যাবে।

স্থনীল তাকে চিঠিতে জানিয়েছে যে—সময় অসময় বিবেচনা না করে এমন আচমকা বাঙালী ঘরের মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠান যায়? মেয়ের বাপ মা ভাই বোনরা নিশ্চয় এত তুচ্ছ নয় তার কাছে যে, রাতটা এখানে কাটিয়ে সকাল বেলা কল্পনাকে নিয়ে গেলে তার চলবে না।

চিঠি পড়ে প্রণব বলে, স্থনীলদা যখন বলছেন, থাকতেই হবে।

আল্পনা বলে, স্থনীলদা বলছেন বলেই?

প্রণব বলে, না, স্থনীলদা ঠিক কথা বলেছেন বলে! এরকম হৈ-চৈ করে এসে সন্ধ্যাবেলা তোমার বোনকে নিয়ে যাওয়া সত্যি ঠিক নয়।

আধঘণ্টার মধ্যে কল্পনার সঙ্গে তার কথা বলার স্থযোগটা স্থষ্টি করে দেং বাড়ীর লোকেই।

কল্পনা বলে, আমি এখন যেতে পারব না। দু'একমাস পরে যাব।

প্রণব বলে, তাহলে তোমার আর গিয়ে কাজ নেই। বাপের বাড়ীতেই থাকো। কই, বাপের বাড়ীতে থেকেও তো চেহারা ফেরেনি? বরং আরও যেন কাক-ঠুকরোনো লাগছে!

তুমি শান্তিতে থাকতে দেবে না, কি করব!

প্রণব খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থাকে। তারপর বলে, আচ্ছা বেশ, আমি আর তোমার অশান্তি করব না, চেহারাটি ভাল করে প্রমাণ দিও যে আমার জন্যেই তোমার শরীরের এই অবস্থা। প্রমাণ দিলে আমি কাণ ধরে তোমার পায়ে নাকে খৎ দেব।

কল্পনা একটু আশ্চর্য্য হয়েই তার দিকে চেয়ে থাকে। তার সঙ্গে এরকম তেজের সঙ্গে কথা বলা নতুন বটে প্রণবের।

প্রণব বলে, আমি এখুনি চলে যেতাম, তোমার অশান্তি করতাম না। কিন্তু

সুনীলদা থাকতে বলেছেন, চলে যাওয়াটা উচিত হবে না। আমাদের একসঙ্গে শুয়ে আর কাজ নেই, অশান্তিই বাড়বে তো। আমি খেয়ে দেয়ে অনিলের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ব, তুমি সকলকে বলে দিও, ঘুম থেকে ডাকলে আমার শরীর ভীষণ খারাপ হয়, আমাকে ডেকে কাজ নেই।

কল্পনা একটু বিহ্বল ভাবেই তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

বাড়ীর সকলের অনেক অসুবিধা ঘটিয়ে চিরদিনের মত অর্থাৎ তাদের বিয়ের এই দশমাসের মধ্যে অনেকবার ছোট ঘরখানা থেকে জিনিষ আর মানুষ সরিয়ে তাদের দুজনের শয্যা পাতা হয়।

দশটা বাজতে না বাজতে বাইরের ঘরে অনিলের বিছানায় শুয়ে প্রণব ঘুমিয়ে পড়ে।

কল্পনা বলে, কেউ ডেকোনা কিন্তু। ঘুমিয়েছে ঘুমোক—ঘুম ভাঙলে বিষম ব্যাপার হবে।

আল্পনা হেসে ফেলে।

এতকাল তো কিছুই হত না ঘুম ভাঙ্গালে? এ একটা নতুন রোগ হল নাকি?

আল্পনা হাসতে পারে, সে ছেলেমানুষ। অন্য সকলের মনে নানা আশঙ্কা উঁকি মেরে যায়। এসব কি ব্যাপার? সন্ধ্যাবেলাই কল্পনাকে নিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল, নেহাৎ সুনীলের খাতিরে রাতটা এখানে থাকতে রাজী হয়েছে। শ্রান্ত হয়েছিল বলে নয় অসময়ে অস্থানে শুয়ে সে ঘুমিয়েই পড়েছে, কল্পনা এভাবে তাকে ডাকতে বারণ করে কেন?

কি বিষম ব্যাপার হবে ডেকে তুলে ছোট ঘরে গিয়ে শুতে বললে?

কল্পনা বলে, ঘুম ভাঙ্গালে ঘুম আসে না, শরীর খারাপ হয়—রেগে যায়।

তবে কাজ নেই তাকে ডেকে। এ ঘরটাই আজ ওদের ছেড়ে দেওয়া যাক। অনিলের বিছানাটা এতটুকু, ভুপেশ ও খোকার মেঝের বিছানাতেই কল্পনা শোবে।

কল্পনা রেগে বলে, তোমাদের যত উদ্ভট কাণ্ড। খোকা ঘুমিয়ে গেছে, আবার ওকে টানাটানি কর! যেমন আছে থাক। ছোড়দা ছোট ঘরে শোবে, আমার একটা ব্যবস্থা করে নেব।

মা ধমক দিয়ে বলে, আবোল তাবোল বকিস না তো তুই। দিন দিন মাথা খারাপ হচ্ছে মেয়ের।

কল্পনা ভাবে, যাক গে, ভিন্ন বিছানায় তো শোব, তাতে আমার অপমান নেই।

স্থনীল চিঠিতেই জানিয়েছিল সে আজ সাড়ে দশটা এগারটার মধ্যেই বাড়ী ফিরবে। সে দশটার আগেই ফিরে আসে।

প্রণব ঘুমিয়ে পড়েছে শুনে সেও একটু আশ্চর্য্য হয়ে যায়। তার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলার স্থযোগ অবহেলা করে প্রণব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে!

শরীর খারাপ? কিন্তু শরীর খারাপ হলে আচমকা আজ ওর আসবার কি দরকার ছিল? দু'একদিন পরে এলেই হত।

কল্পনার থমথমে মুখ দেখে স্থনীলও অস্বস্তি বোধ করে।

বাড়ীর সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। নন্দার ব্যবস্থায় বেশী রাত্রে বাড়ী ফিরে খাওয়ার হাঙ্গামা স্থনীলকে করতে হয় না।

একে একে সকলে শুয়ে পড়েছে, স্থনীলও শোয়ার কথা ভাবছে, বিভা এসে হাজির হয়। শুধু হাজির হয় না, গাড়ী থেকে নেমে ড্রাইভারকে হুকুম দেয়, গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাও, গাড়ী আনবার দরকার নেই।

ড্রাইভার বলে, আজ্ঞে, আপনি এখানে থাকবেন?

তা দিয়ে তোমার দরকার কি?

কল্পনা বাইরের দরজা খুলে বেরিয়েছিল, গাড়ী চলে গেলে সে বলে, ব্যাপার কি বিভাদি?

তা দিয়ে তোমার দরকার কি ? বাড়ীতে অতিথি এসেছে ধরে নাও

প্রণবেরও ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাকে অনিলের বিছানায় বসে হাই তুলতে দেখে, মেঝেতে আরেকটা বিছানা দেখে এবং কল্পনাকে ভিতরের দিকের দরজা খুলতে দেখে বিভা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে চেয়ে থাকে।

তারপর হেসে বলে, আগেই আরেকজন অতিথি হাজির হয়েছেন!

এ বাড়ীতেই বিভার সঙ্গে প্রণবের পরিচয়। সে জিজ্ঞাসা করে, আপনি এত রাত্রে হঠাৎ ?

বিভা হেসে বলে, রাত বেশী হয় নি, এখনো অনেকটা রাত বাকী আছে। ভয় নেই, তোমাদের অসুবিধা করব না।

আগে এরকম পরিহাস করলে কল্পনা মন্তব্য করত, আহা!

আজ সে কিছুই বলে না। প্রণব একটু শুকনো হাসি হাসে।

বিভা বাড়ীর ভিতরে যায়।

সুনীল বলে, ব্যাপার গুরুতর নিশ্চয়!

বিভা বলে, গুরুতর বৈকি। কাল সকালে আমার আশীর্ব্বাদ। তোমার উপদেশ পালন করতে এলাম। নিজে শিখিয়েছো, তাড়াতে পারবে না কিন্তু। বাবা এসে হাঙ্গামা করলে সইতে হবে।

সুনীল বলে, হঠাৎ আবার—?

বলছি। প্রণব এসেছে, তোমাদের অসুবিধা হবে জানলেও আমি কিন্তু এখানেই আসতাম। আত্মীয় বন্ধু অনেকের বাড়ী যেতে পারতাম—কিন্তু বাবা গিয়ে হাজির হলেই তারা বাবার পক্ষ নিত, আমার বিরুদ্ধে যেত। তাই এখানেই এলাম।

বেশ করেছ।

অনিল আজ এ ঘরে শুয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়ে নি। তাকে বলতে হয় নি, বিভা সুনীলের সঙ্গে জরুরী কথা বলতে এসেছে বুঝে নিজেই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

তাদের কথা বাড়ীর কেউ শুনতে পায় না, কিন্তু একনজর তাকিয়েই টের পায় বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই হচ্ছে দুজনের মধ্যে।

বিভা ম্লানমুখে বলে, আরেকটা খারাপ খবর আছে। তোমায় যে টাকা দেব বলেছিলাম, নেবে কিনা ভেবে আর দরকার নেই। বাবা আমার অ্যাকাউণ্ট বন্ধ করে দিয়েছে। আমার চেনা একটি মেয়ের স্বামীর টি. বি. হয়েছে, একটা চেক দিলাম, চেকটা ব্যাঙ্ক ফেরত দিয়েছে। বাবার সই ছাড়া চেক ভাঙ্গানো যাবে না।

স্নীল বলে, এবার বুঝতে পারছ, তোমার টাকা নিতে কেন ইতস্তত করেছি? টাকা যে আসলে তোমার বাবার এটা কিছুতে ভুলতে পারছিলাম না। অ্যাকাউণ্ট ওর নিজের নামে, ব্যাঙ্ককে হুকুম দিয়েছিলেন তুমি চেক কাটলেও যেন টাকা দেয়, এখন হুকুমটা বাতিল করে দিয়েছেন।

স্নীল একটা সিগারেট ধরায়। – কিন্তু হঠাৎ তোমার আশীর্ব্বাদ কেন?

পরশু তোমার পক্ষ নিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করলাম না? তারপর থেকে বাবা কেমন বিগড়ে গেছে! কিছু ভেবে নিয়ে যেমন রেগেছে তেমনি ভয় পেয়ে গেছে। আমার টাকার জোর কেড়ে নিয়ে, জোর করে বিয়ে দিয়ে আমায় বেঁধে ফেলতে চাইছে।

স্নীল হেসে বলে, বাড়ী ছেড়ে তুমি তবু আমার বাড়ীতেই এলে! তোমার বাবা ক্ষেপে যাবেন।

বিভা বলে, আসব না? আমি কি কচি খুকী যে বাবার ভয়ে কাঁপব? আমার পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে, আশ্বিনে ছাব্বিশ হবে। আমার যেখানে স্ববিধা সেখানে যাব।

একটু থেমে বলে, তোমার সঙ্গে একচোট হয়ে গেছে, হাঙ্গামা করতে বাবা নাও আসতে পারে তোমার বাড়ীতে!

সেই আশাতেই থাকো! নিজের বাবাকে চেনো না তুমি?

অঘোরের দামী গাড়ীটি আস্তে চালালেও তার বাড়ী আর স্নীলদের বাড়ীর

মধ্যে একবার পাড়ি দিতে বিশ মিনিটের বেশী লাগে না। ড্রাইভার নিশ্চয় আজকের বিশেষ অবস্থায় আস্তে গাড়ী চালিয়ে ফিরে যায় নি, অঘোরকে নিয়ে আসবার সময় আরও বেশী জোরেই চালাতে হয়েছে অঘোরের হুকুমে।

আধঘণ্টার মধ্যে অঘোর এসে পড়ে। তখনো সবাই জাগা।

গাড়ীতে বসে সে মেয়েকে কথা বলার জন্য ডেকে পাঠায় না। অত বোকা সে নয়। ড্রাইভার মেয়ের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি শুনুক আর কাল চারিদিকে ছড়িয়ে যাক তার মেয়ের পাগলামির গল্প!

গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে সে বাইরের ঘরে গিয়ে বসে।

ভেতর থেকে বিভা ধীর পদে ঘরে এলে আগে অঘোর তার মুখটা ভাল করে দেখে নেয়।

তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, একি পাগলামি জুড়েছ?

বিভা বলে, কি করব? তুমি পাগলামি জুড়লে আমাকেও করতে হয়।

অঘোর ক্ষুব্ধস্বরে বলে, আমি তোর ভাল না করে মন্দ করব এটা তুই ভাবতে পারলি? তুই জানিস না—

অঘোরের মুখে কথা আটকে যায়!

বিভা শান্ত স্বরে বলে, তুমি আমার ভালই চাইবে মন্দ চাইবে না, তা আমি ভাল করেই জানি। আমার ভাল হবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস কর বলেই তুমি এরকম করছ এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি আমার আছে। না বুঝে ভাল করতে চেয়ে আমার সর্ব্বনাশ করতে চাইছ জানলে কি আর তুমি জবরদস্তি করতে!

টের পাওয়া যায় বিভার কান্না এসে গেছে।

কিন্তু সে কাঁদে না।

এই যদি তোমার ইচ্ছা ছিল, আটদশ বছর আগে যাকে হোক কিনে নিয়ে ঢুকিয়ে দিলেই পারতে। আমিও খুসী হতাম।

অঘোর নীরবে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কান্না এসে যায় কিন্তু তার সামনে কাঁদেনা, মেয়ে তো সত্যিই তার কচিখুকী নেই!

অঘোর নিশ্বাস ফেলে বলে, ভগবান ফাঁদে ফেলেছেন, কি আর করি। কেন যে তোকে নিজের হাতে মানুষ করার সখ হয়েছিল, আজ তাহলে এই মায়ার ফাঁদে পড়তে হত না। তোর জন্যে দু'তিনটে নার্স রেখে দিয়ে নিজের কাজকর্ম নিয়ে থাকতাম—

বিভা কান্না পেলে কাঁদেনি। কিন্তু এবার হাসি পাওয়ায় হঠাৎ সে হেসে ফেলে।

বলে, এটা কি বলছ বাবা? তিন চারটে নার্স রেখে দিতে! আমি যখন বাচ্চা ছিলাম, কজন নার্সের মাইনে তোমার রোজগার ছিল ভুলে গেছ একেবারে?

অঘোর বিব্রত হয়ে বলে, তখনকার কথা বলছি নাকি? অবস্থা ফিরবার পর—

বিভা বলে, অবস্থা তো তোমার ফিরল এই সেদিনের যুদ্ধের বাজারে। তখনি তো আমি প্রায় বুড়িয়ে গেছি! দু'তিনজন নার্স আমার কি করত?

বলতে বলতে হাসি উপে গিয়ে তার মুখ ম্লান হয়ে যায়!—তা বটে, তুমি ঠিক বলেছ। নার্স না হোক, এখন দু'তিন জন ঝি রাঁধুনী তো রেখেছ খোঁড়া মেয়েব সেবার জন্য। তার আগে পর্য্যন্ত তুমিই করতে।

অঘোর বলে, সেটাই ভুল হয়েছিল।

বিভা হেসে বলে, ভুল হয়নি। তখনও তুমি কম খাটতে নাকি? শুধু টাকাই আসত না। শুধু কাজ আর টাকার ভাবনা নিয়ে থাকলে মানুষের চলে? দু'একজনকে একটু মায়া করতে হবে না? সেটাও খুব দরকার। ভগবানকে টেনে এনো না, তোমাব মায়া করা দরকার ছিল বলেই তুমি আমাকে মায়া করেছ।

স্বার্থপরের মত?

না না, অন্য সব কিছুর সঙ্গে সবার যেটা চাই নিজের খোঁড়া মেয়েকে দিয়ে সেটা মেটালে স্বার্থপর হবে কেন? বাপ ছেলেমেয়েকে ভালবাসবে না?

তুমি যদি আমায় এতখানি না ভালবাসতে পারতে বাবা, তুমি যে আজ কী দাঁড়াতে—

তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস ?

অনেকটা।

অঘোর হেন লোক এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে বলে, তোদের কথা হেঁয়ালির মত লাগে, তবে খানিকটা সত্যি বৈকি তোর কথা। তুই একটা নেশা দাঁড়িয়েছিলি আমার। বুড়ো বয়সে আরও কাবু করেছিস। নইলে এভাবে হার মেনে ছুটে আসি ?

বিভা বলে, আমিও কি সাধে যার তার হাতে পড়ে নেশা ছুটিয়ে তোমায় মারতে চাই না ? তুমি খালি আমার কথা ভাব, টাকা পাগল জামাই আনলে তোমার দশা কি দাঁড়াবে তা তো ভাবো না। দু'দিনে পাগল করে দেবে না তোমাকে ?

অঘোর ক্লিষ্ট স্বরে বলে, ভাবি নি ? এতো জানা কথাই। আমি ভাবছিলাম, আমায় নয় টাকার জন্য পাগল করুক, তুই যদি সুখী হোস। ভাবছিলাম, বাঁচব তো আর দশ কি পনের বছর বড় জোর। দশ বছরের বেশী আশা করতেও সাহস হয় না। হয়তো দু'এক বছরেই কাত হতে পারি। তারপর তোর কি দশা হবে ভেবে—

অঘোর যেন গা-ঝাড়া দিয়ে সিধে হয়ে বসে বলে, যাকগে। আমি মরলে যা হবার হবে, আমি তো আর দেখতে আসব না! চল্ যাই এবার, আমার ঘুম পেয়েছে।

চলো।

অঘোর অবাক হয়ে বলে, ওদের বলে আয় ?

কিছু বলতে হবে না, তুমি চলো। বাড়ী গিয়ে আর ঝগড়া করবে না। সটান শুয়ে পড়ে ঘুমোবে।

তারা গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসতে বসতে, সিগারেট নিভিয়ে ড্রাইভার

নিজের সিটে বসে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে দিতে সুনীলেরা কয়েকজন অবশ্য বাইরে বেরিয়ে এসে প্রমাণ দেয় যে বিভার বিদায় না নিয়েই চলে যাওয়াটা তারা অভদ্রতা মনে করে নি।

সুনীল বলে, কাল বারটা নাগাদ আমি আসছি বিভা। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

অঘোর বলতে যায়, আমি তখন বাড়ী থাকব না—

সুনীল বলে, বিভার সঙ্গে কথা সেরে আমি কাগজের কয়েকটা জরুরী কাজে বেরোব। কাজগুলি সেরে চারটে সাড়ে চারটের সময় আমি আপিসে আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনার সঙ্গেও আমার জরুরী কথা আছে।

কল্পনার দিকে চোখ পড়ায় বিভা ড্রাইভারকে বলে, দাঁড়াও, গাড়ী ছেড়ো না।

অঘোরকে বলে, তোমার ঘুম পেয়েছে কিন্তু আমি একটা জরুরী কথা ভুলে গেলাম। পাঁচদশ মিনিট একটু বোসো গাড়ীতে।

আবার নামবি ? কি এমন জরুরী কথা ?

বাড়ী গিয়ে বলব।

মেয়ের অতি কষ্টে গাড়ী থেকে নামার প্রক্রিয়া চেয়ে দেখতে দেখতে অঘোরের মনে হয় বুকে পিঠে করে মানুষ করা পঙ্গু কুৎসিৎ মেয়েটা তার যেন রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।

তাকে আবার নামতে দেখে বাড়ীর সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কল্পনাকে ডেকে নিয়ে আড়ালে যেতে তারা আরও বেশী অবাক হয়ে যায়।

বিভা ভিতরের বারান্দায় গিয়ে রেলিংহীন ফাঁকা ছাদে উঠবার সিঁড়িতে বসে বলে, চটপট মন দিয়ে কথা শুনবি, বাবার ওদিকে ঘুম পেয়েছে। আমার কাছে হার মেনে আরও বেশী ঘুম পেয়েছে—বুঝছিস তো ? ন্যাকামি করবি না।

কল্পনা বলে, তোমার কি হল বিভাদি।

বিভা বলে, আমার কিছু হয় নি, হয়েছে তোর। আমি কি তোর মত বোকা? দেখলি না খোঁড়া অচল মেয়ে বাবাকে কি ভাবে বাগে আনলাম?

কল্পনা বলে, সে তুমি খোঁড়া বলেই পারলে। আমাদের মত হলে পারতে না।

বিভা বলে, তুই ভারি বোকা। আমি খোঁড়া বলে? বাবার আর একটাও ছেলেমেয়ে নেই বলে। তোর মত আরেকটা মেয়েও যদি থাকত, বাবা আমার দিকে ফিরেও তাকাত না। নিজে মানুষ করত তোকে, আমার জন্যে কিছুই করত না। ছেলেবেলাতেই অক্কা পেয়ে যেতাম।

কল্পনা চুপ করে থাকে।

বাড়ীর সকলে বাইরের রোয়াকে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ীতে অঘোর চুপচাপ অপেক্ষা করছে, ষ্টার্ট দেওয়া ইঞ্জিনটাকেও ড্রাইভার চুপ করিয়ে দিয়েছে। পাড়ার অনেকগুলি বাড়ীর আধ-ঘুমন্ত কিছু কিছু চোখ এ বাড়ীর দিকে উঁকি দিচ্ছে।

বিভা বলে, আমি খোঁড়া, চলে ফিরে দেখে বেড়াতে পারিনা! এক যায়গায় বসে চারিদিকে চোখ পেতে রাখি। চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব তন্ন তন্ন করে দেখি শুনি।

কল্পনা চুপ করে থাকে।

বিভা বলে, তোকে দেখেই টের পেয়েছি ছেলে হোক মেয়ে হোক একটা তোর হবে। এটাও টের পেয়েছি তুই বোকার মত তোর ছেলে বা মেয়ের যে বাপ হবে তাকে মিছিমিছি নস্যাৎ করেছিস। তুই সত্যি বোকা। ছেলে হোক মেয়ে হোক, তোর পেটে যা জন্মাবে তার বাপ ছাড়া তাকে কেউ বেশী ভালবাসতে পারবে না, এই সোজা কথাটা তুই বুঝিস না।

কল্পনা এবার ঝেঁঝে ওঠে, বাপ বলেই তো নয়, ছেলেমেয়ের মানুষের ভালবাসা চাই-তো। বাপ হোক যে হোক অমানুষের ভালবাসা ছেলেমেয়েদের নষ্ট করে দেয়।

অমানুষ? তোর হৃদয় নেই বলে, ভালবাসা বুঝিসনে বলে তোকে যে চিরদিনের জন্য ছেড়ে দেবে ভাবছিল, শুধু ছেলে বা মেয়ের মা হবি বলে সে যেচে যেচে তোর কাছে এসে অপমান হচ্ছে। অমানুষ এটা পারে?

কল্পনা নিশ্বাস ফেলে বলে, তুমি কাব্যি করছ বিভাদি। ও জানে না।

জানে না? না জেনে শুধু তোমার রূপযৌবনের খাতিরে এরকম অপমান হতে এসেছে? কি বোকা তুই, রূপযৌবন বাজারেও তো কিনতে পাওয়া যায় রে! সাদা চোখে খানিকটা কম মনে হলেও মদের চোখে তুলনা মেলে না। তুই এত অপমান করেছিস যে ওবেচারার চোখে তোকে কুৎসিৎ লাগে। শুধু ও বেচারার কাছেই কি তোর নারীত্বের মর্য্যাদা দাবী? আর কারো কাছে দাবী করতে ভরসা পাস না? সাহস পাস না? ও বেচারা শুধু একা তোর জন্য না খেটে তোর মত আরও অনেকের জন্য খাটছে বলে, ন্যাকা ন্যাকা ভালবাসা জানে না বলে, ওকে তুই বাতিল করবি! তোর মত বোকা মেয়ে আমি খুব দেখছি ভাই।

কল্পনা ঠোঁট কামড়ে চুপ করে থাকে।

বিভা বলে, ঢের বোকামি করেছ, আর নয়। আমি মিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছি—বলে' বিভা ডাকে, আল্পনা?

আল্পনাকে বলে, এ ঘরের চৌকী থেকে অনিলের বিছানাটা সরিয়ে নিয়ে যা তো।

প্রণবের দিকে চেয়ে হাসিমুখে সে বলে, বোকা মেয়েকে চালাক করে দিয়ে গেলাম, তুমি যেন আবার বোকার মত কোরো না।

পরদিন যেতেই বিভা অনুযোগ দেয়, অমনভাবে না বলে কয়ে এলেই হত। তুমি কি জানো না খোঁড়া মেয়ে বাড়ীতেই থাকে? সারারাত ঘুমোতে পারি নি। বাবাও ছটফট করেছে—তোমার কি মতলব বুঝতে না পেরে।

সুনীল বলে, বড় ব্যাপারে একরাত না ঘুমোলে ছটফট করলে কি আসে যায়? খিদেয় রোগে কত লোক কত রাত ঘুমোতে না পেরে ছটফট করছে।

বিভা বলে, বুঝেছি। নানা ভাবনার মধ্যে মাঝে মাঝে আমি যা ভাবছিলাম সেটা সত্যি নয়। তুমি এলোমেলো কথা বলে টাকা যোগারের ব্যবস্থার জন্য আসো নি।

টাকার জন্যই এসেছি।

তা জানি। সেই জন্যই তো আমাদের এত ভাবনা যে ব্যাপারটা কি? এলোমেলো ধাপ্পাবাজি উপায় তোমার ধাতে আসে না। টাকাও তোমার নিজের জন্য চাও না। তাই তো বাপ বেটি আমরা দুজনে সারা রাত ঘুমিয়েছি আর ছটফট করেছি আর ভেবেছি। তুমি আমাদের ক্ষতি করবে না জানি, কিন্তু কি করতে চাইছ তা তো জানিনে।

সুনীল বলে, রাত্রে না ঘুমিয়েও মুখ তো বেশ তাজা দেখাচ্ছে!

বিভা বলে, আমার মুখে এত লোম, প্রথম বয়সে পুরুষ ছেলের যেমন গোঁপদাড়ি গজায়। তবু তুমি বুঝতে পার আমার মনের ভাব?

সুনীল বলে, তা খানিকটা বুঝতে পারি বৈকি। অনেকদিন থেকে দেখে আসছি তো, খোঁড়া পা, মুখের লোম, বাপের টাকার অভিশাপ নিয়েও তুমি মানুষের মত বাঁচার জন্য লড়াই করছ। যারা এরকম লড়াই করে তাদের বিশেষ এক ধরণের সরলতা থাকে, মনে কোন ভাব জোরালো হলে মুখে তার ছাপ পড়ে। রাতে না ঘুমোলে কি হবে মনে খুব উৎসাহ বোধ করছ, মুখখানা তাই তাজা দেখাচ্ছে।

বিভা হেসে বলে, তা ঠিক। শুধু দুশ্চিন্তায় তো নয়, বেশী আনন্দেও মানুষের ঘুম আসে না। আমার এত উৎসাহ কেন, আনন্দ কেন জানো?

জানি।

সত্যি জানো?

জানি বৈকি। তোমার সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা শেষ হয়েছে। অঘোরবাবু

আর) তোমার বিয়ের চেষ্টাও করবেন না, আমার পিছনেও লাগবেন না। মনে মনে তুমি খালি নিশ্বাস ফেলছ আর ভাবছ, বাব্বা, বেঁচেছি!

বিভা যেন হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বলে, বাবার চেয়ে তোমার অনেক বেশী বুদ্ধি—গভীর বল, চোখা বল, সব দিক দিয়ে। কিন্তু বাবা আর তোমার শত্রুতা করবে না এটা কি করে বুঝলে?

সুনীল বলে, ওঁর সঙ্গে ঠোক্কর লাগলেই তুমি আমার কাছে ছুটে যাও, পরামর্শ চাও। সেদিন আমার পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করলে, বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করতেই বাড়ী ছেড়ে আমার ওখানে গিয়ে উঠলে। অঘোরবাবুর কি আর বুঝতে বাকী আছে যে আমায় ঘা দিলে সেটা তোমার গায়ে লাগবে?

বিভা খুসীর হাসি হাসে।

বলে, বাবার চেয়ে তোমার বুদ্ধিই বেশী নয়, তুমি ঢের বেশী চালাক। বাবা সোজাসুজি তোমাকে বাগে আনতে চেয়েছিল, তুমি আমাকে দিয়ে বাবাকে কাবু করেছ। আমার টাকা ধাব নেবে তো?

সুনীল অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, জবাব দেয় না।

কি ভাবছ?

সুনীল বলে, ভাবছি খুব গুরুতর কথা। টাকার জন্য আমি যদি তোমায় বিয়ে করতে চাই, তুমি রাজী হবে?

বিভা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

সুনীল বলে, তামাসা করছি না। কদিন ধরে কথাটা ভাবছিলাম। সোজাসুজি বলি, প্রেম আমার কাছে তুমি পাবে না, ওটা আমার ধাতেই আসে না। তবে অন্য স্ত্রীরা যেমন আদর যত্ন পায় স্নেহ মমতা পায় সে সব তেমনি পাবে।

তুমি টাকার জন্য বিয়ে করবে?

দোষ কি? অন্যে তোমায় বিয়ে করলে টাকা পেত, আমিও পাব। তুমি

এমনিই টাকা দিতে চাইছিলে, কিন্তু এমনি তো টাকা নিতে পারি না। বিয়ে হলে তোমার টাকায় আমার অধিকার জন্মাবে।

ক্ষণে ক্ষণে কতরকম ভাব যে খেলে যায় বিভার মুখে। একবার বোধহয় লজ্জাতেই লাল হয়ে যায় সমস্ত মুখখানা। যা ছিল তার কল্পনাতীত অভাবনীয় ব্যাপার তাই আজ এমন আচমকা বাস্তব সত্যের বাস্তব সম্ভাবনার রূপ নিয়ে সামনে হাজির হয়ে বিচলিত অভিভূত করে দিয়েছে তাকে।

হঠাৎ সে বলে, কিন্তু খোঁড়া বৌ বলে তোমার খারাপ লাগবে না?

সুনীল বলে, না। অন্য মেয়ে হলে হয় তো লাগত, তুমি বলে লাগবে না। তোমায় খোঁড়া দেখে দেখেই আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি সমস্ত দিক তলিয়ে ভেবে দেখেছি। খারাপ লাগার সম্ভাবনা থাকলে আমি তোমায় বিয়ের কথা বলতাম না। কারণ তোমায় আমার খারাপ লাগা মানেই দাঁড়াবে তোমাকে অসুখী করা। আমার দিক থেকে ওসব কোন খুঁতখুঁতানি নেই। খোঁড়া মেয়ে হয়েও টাকার দামে নিজেকে বিক্রী কর নি—তোমার বাবা টাকা দিয়ে রাজপুত্র কিনে আনলেও আসলে কিন্তু তোমার নিজেকেই বিক্রী করা হত। তুমি এভাবে ধর নি, সোজাসুজি হিসেব করেছ—টাকার জন্য যে তোমায় চাইবে সে অমানুষ। নিজেকে বিক্রী কর নি বলেই কিন্তু আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি।

শ্রদ্ধা!

তুমি দেখছি আকাশ থেকে পড়লে! শ্রদ্ধা বুঝি শুধু পুরুষের পাওনা?

সুনীল হঠাৎ সুর পালটে বলে, যাকগে, বেশী বলে তোমার মাথা গুলিয়ে দেব না। এখন তুমি নিজের মন বুঝে ছাখো। তোমাকে আমার খারাপ লাগবে না এটা সত্যি কথা, তোমার জন্য স্নেহও আছে কিন্তু বিয়ে আমি তোমাকে করছি টাকার জন্য। এটা অস্বীকার করব না। টাকার দরকার না পড়লে কথাটা হয় তো আমার মনেও আসত না।

বিভা মুখ নীচু করে।

একটা বড় কাজে টাকার দরকার পড়ায় করছ, নিজের জন্য টাকার লোভে তো নয়।

তুমি তা হলে রাজী ?

বিভা মুখ তোলে না।

রাজী না হয়ে পারি ? তুমি জানো না, তোমার জন্যেই তো কারো বেলা মন উঠছিল না।

সুনীল তার মাথায় একটা হাত রাখে।

সত্যি ? আমি তো টের পাইনি। আমায় খুব শ্রদ্ধাভক্তি কর এটুকু জানতাম।

শ্রদ্ধা ভক্তির নীচে মেয়েরা ওসব চাপা রাখতে পারে। কোন মুখে তোমাকে জানতে দিতাম ? আজ তুমি নিজের দরকারে এসে বলেছ, তবু আমার মনটা খুঁত খুঁত করছে, তোমার উপযুক্ত বৌ পাবে না, একটা বাজে মেয়ে জুটবে।

এ খুঁতখুঁতানি মন থেকে মুছে ফেল। খুব সুন্দরী হবে, নাচবে বেড়াবে সেবা করবে—এরকম বৌয়ের লোভ থাকলে টাকার লোভে তোমায় বিয়ে করতাম না। ওসব আলগা হিসাব আমার আসে না। তোমার দিকের হিসাবটাই এখন সবচেয়ে গুরুতর দাঁড়াচ্ছে কিন্তু। যাদের তুমি অমানুষ বলে বাতিল করেছ তাদের মতই আমি কিন্তু টাকার জন্য এগিয়ে এসেছি,—আমায় শ্রদ্ধা করতে পারবে তো ?

পারব না ? নিজের জন্য তো টাকা চাইছ না। আমার শ্রদ্ধা বরং বেড়ে গেছে।

দু'জনে নানা কথা বলে। অঘোরের সম্মতির প্রশ্ন নিয়ে আগে মাথা ঘামাবার কোন দরকার হত না কিন্তু সুনীলের উপর তার বর্তমান বিরাগের জন্য কথাটা নিয়ে একটু আলোচনা দরকার হয়।

বিভা জানায় যে ওই বিরাগের জন্য কিছু আসবে যাবে না।

খোঁড়া মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য অঘোর পাগল। সুনীল তাকে বিয়ে করবে

শুনলে সব বিরাগ জল হয়ে যাবে। শত্রুতা না করলেও কাগজটা বাগাবার মতলব সে ছাড়ে নি, সেটাও ছেড়ে দেবে।

স্থনীল নিজেই যাতে কাগজটা দাঁড় করাতে পারে সেজন্য নানা ভাবে বরং সাহায্যই করবে।

বিভা হাসে।—তুমি সত্যি ভারি চালাক। এক ঢিলে কটা পাখী মারছ ভাব দিকি ?

স্থনীলও হাসে, উপায় কি ? ঢিল যে আমার মোটে একটা !

বিভা একটু ভেবে বলে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মায়ার সঙ্গে তোমার নাকি ভাব আছে শুনেছিলাম ?

মনে বুঝি খটকা লাগল ? ভাব আছেই তো।

তবে ?

স্থনীল হেসে পাল্টা প্রশ্ন করে, .একজনের সঙ্গে ভাব থাকলেই বুঝি ভালবাসা থাকতে হবে ?

লোকে তাই ধরে নেয়।

লোকে অমন কত কিছু ধরে নেয়। তোমায় তো বলেছি কোন মেয়ের জন্যই আমার ভালবাসা আসে না। ওটা আমার ধাতে নেই।

তাই বল। আমার সত্যি মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি কাগজটার ভবিষ্যতের জন্য দু'দিক দিয়ে মস্ত মস্ত দুটো ত্যাগ স্বীকার করতে চলেছ।

ওরকম ত্যাগে আমি বিশ্বাস করি না।

স্থনীলের চলে যাবার সময় আজ বিভা তাকে প্রণাম করে বলে, এত বড় হৃদয় তুমি কোথায় পেলে ?

স্থনীল হাসিমুখে বলে, আজ বুঝি ভক্তি বেড়ে গেছে ?

বিভা খুসীর সঙ্গে বলে, সত্যি বেড়ে গেছে। সবাই বলে তোমার নাকি হৃদয় নেই, তুমি রসকষহীন নিষ্ঠুর মানুষ। সব মিছে কথা! তোমার হৃদয়টা মস্ত কিনা তাই লোকে ভুল করে, চিনতে পারে না।

সুনীল তাকে আদর করে বলে, কি জানো, আমার হৃদয় ভাবলে হৃদয়টা ছোট হয়ে যায়, হাল্কা হয়ে যায়। দশজনের হৃদয়ের সঙ্গে কারবার করার জন্য হৃদয়— এরকম ভাবলেই হৃদয়টা ছোট না বড় সে চিন্তা চুকে যায়, অনেক মিথ্যা যন্ত্রণা থেকে হৃদয় বেচারা রেহাই পায়!

খবর শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় আত্মীয় বন্ধু।

অঘোরের খোঁড়া মেয়েটাকে শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করবে সুনীল!

টাকার লোভের কাছে শেষ পর্য্যন্ত সুনীলের মত শক্ত আদর্শবাদী মানুষকেও মাথা নত করতে হয়!

এ যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

খবর শুনে প্রথমে ফ্যাকাসে হয়ে যায় মায়ার মুখ, তারপর সে মুখে ঘটে অসহ্য ক্রোধের কালো মেঘের সঞ্চার।

অপমানে লজ্জায় ঘৃণায় তার যেন মরে যেতে ইচ্ছা হয়। নিজেকে সে বারংবার ধিক্কার দেয়! তাকে নরম পেয়েছে ভালমানুষ পেয়েছে বলেই না তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার সাহস হয় সুনীলের।

এতখানি তুচ্ছ সে সুনীলের কাছে?

সব ব্যাপারে তবে তার পরামর্শ দরকার হয় কেন?

সুনীলের সঙ্গে তার তখন সামনাসামনি দেখা হলে বিশ্রী একটা কাণ্ড হয়ে যেত সন্দেহ নেই।

মায়া তাই ঘটনাচক্রকে ধন্যবাদ দেয় যে রাত জেগে কাজ করতে হওয়ায় বাড়ী ফিরে সকালবেলা সুনীল ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সুনীলের ঘুম ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে মন শান্ত হয়ে যায় মায়ার।

না, এতে তার কোন অপমান নেই।

তাকে কোন কথাই তো দেয় নি সুনীল। কথা দেওয়ার মত কোন কথাই তো তার সঙ্গে হয় নি সুনীলের। তার নারীত্বের বদলে তার বন্ধুত্বকে বড় করে সমানভাবে তার সঙ্গে বাস্তব সুখ সুবিধার দিকটা খোলাখুলি আলোচনা

করেছিল—ওভাবে কথা বলে কথাটা বাতিল করে দিলে তার কোন অপমান হয় না, এটা স্থনীল জানে।

নিজের মনটা তার নরম হয়ে গিয়েছে বলে, সেদিনের পর থেকে একটা প্রত্যাশা নিয়ে স্বপ্ন ও কল্পনার জাল বুনতে স্বরু করেছিল বলে স্থনীলের স্বাভাবিক ও সঙ্গত ব্যবহারে এতখানি আঘাত লেগেছে, নিজেকে অপমানিতা মনে হয়েছে।

স্থনীল কি করে জানবে যে সম্প্রতি তার মধ্যে এই দুর্বলতা এসেছে ?

সে নিজেই সেদিন স্থনীলের প্রস্তাবকে আমল দেয় নি। কিছু দিন ভেবে দেখার কথা বলেছিল।

স্থনীল যদি ধরে নিয়ে থাকে যে, কথাটা তারপর আপনা থেকেই বাতিল হয়ে গেছে, তাকে তো দোষ দেওয়া যায় না।

তা ছাড়া এটা তার সখের বিয়ে নয়।

কাগজটার জন্য টাকা দরকার বলে জীবনে সে একটা ঝনঝাট বাড়াচ্ছে।

মায়া এসব কথা তলিয়ে ভাববার স্থযোগ পায় বলে অতি অল্পের জন্য তাদের ঝগড়াটা বেঁচে যায়। বেলা হলে মায়া সহজভাবে শান্ত মনে নিজেই স্থনীলের সঙ্গে কথা বলতে যেতে পারে।

আল্পনা বলে, খবর শুনেছ মায়াদি ?

শুনলাম তো।

দাদার শেষে এই মতি হল ?

কেন, দোষ কি ? বড়লোকের মেয়ে, অনেক টাকা পাবে।

আল্পনা গম্ভীর হয়ে বলে, তা ঠিক বলেছ। দাদাকে দিয়েই এরকম কাণ্ড সম্ভব। হৃদয় বলে তো কিছু নেই, শুধু দরকারের হিসাব। টাকার দরকার হয়েছে, একজনকে বিয়ে করলে টাকা পাওয়া যাবে, কর তাকে বিয়ে। বৌ কেমন হবে না হবে, তাতে কি এসে যায় ?

মায়া বলে, সব সময় সব মানুষকে এরকম সোজাস্থজি বিচার কোরো না বোন। তুমি কি করে জানলে মেয়েটার কথাও তোমার দাদা ভাবে নি ?

আল্পনা ভড়কে যায়।

তার মানে?

দাদার মনের মধ্যে ঢুকেছ কি? বড়লোকের খোঁড়া মেয়েকে টাকার লোভে বিয়ে করবে শুধু বাজে মার্কা মানুষ—হয় বাজে লোকের হাতে সারা জীবন কষ্ট পাবে নয় জীবনে কোন সাধ আহ্লাদ মিটবে না। এটা হিসেব ধরেও হয় তো তোমার দাদা বিভাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। কেবল টাকার জন্যেই নয়।

আল্পনা মায়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মায়া বলে, নিজের সখের কথা তোর দাদা কত কম ভাবে জানিস না তুই? তোরাই বলিস মানুষটার হৃদয় নেই!

সুনীল স্নান করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

মায়া যতদূর সম্ভব মুখ গম্ভীর করে বলে, এসব কি শুনছি? তুমি নাকি বিভাকে বিয়ে করবে? তা হবে না। তুমি আগে আমায় কথা দিয়েছ, আমি ছাড়ব না।

সুনীল বলে, তুমিই তো রাজী হলে না তখন। ভাগ্যে রাজী হওনি মায়া! আমার এতগুলি টাকা পাবার সুযোগ ফসকে যেত।

মায়া ভাবে, ঠিক যা সে ভেবেছে! সেদিন সে রাজী হয় নি বলে কথাটা একেবারে বাতিল ধরে নিয়েছে সুনীল। নইলে একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা বলে নিলে জগৎসংসার উল্টে গেলেও কি এ মানুষটার কথার নড়চড় হত!

মুখে সে বলে, কে বললে রাজী হই নি? আমি তো রাজীই হয়ে গেলাম। তোমার মত বদলানো দরকার হতে পারে মনে করে কয়েকদিন কথাটা তোমায় ভেবে দেখবার সুযোগ দিয়েছিলাম।

সুনীল হেসে বলে, সেই এক কথাই দাঁড়াল। আমি ভেবে চিন্তে মত বদলেছি—তুমি যে সুযোগ দিয়েছিলে সেটা কাজে লাগিয়েছি। কাজেই আমার কোন দোষ নেই।

মায়া এবার হাসে।

তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বল? আমি কিন্তু সত্যি রাগ করতে

পারি। আমায় একবার জানানোও দরকার মনে করলে না? অন্য সব বিষয়ে তো আমার সঙ্গে পরামর্শ কর! কাগজের জন্য টাকার দরকারের কথাটা আমায় জানাতে পারলে, টাকা যোগাড়ের এ রকম উপায়ের কথাটা একেবারে চেপে গেলে।

স্নীল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের ভাব লক্ষ্য করে। কয়েক মূহূর্তের জন্য তাকে সত্যই বিব্রত মনে হয়।

তারপর সহজভাবেই সে বলে, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করার কথা ভেবেছিলাম মায়া। কিন্তু ভেবেচিন্তে দেখলাম এ ব্যাপারে তোমার পরামর্শ না নেওয়াই ভাল। পরামর্শ তুমি দিতে পারবে না, আমার মাথা গুলিয়ে দেবে। এ এমন একটা ব্যাপার যে আমার একার বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

মায়া চুপচাপ তার কথাটা বুঝবার চেষ্টা করে।

স্নীল আবার বলে, তুমি আমার ভালই চাইতে তাতে আমার সন্দেহ নেই। তোমার ঈর্ষা হবে, তুমি চোখ কান বুজে আমাকে ঠেকাবার চেষ্টা করবে, এ ভয় আমি করি নি। আমার মঙ্গল চেয়েই তুমি আমায় ভুল পরামর্শ দিতে। কারণ হাজার মঙ্গল চেয়ে হাজার চেষ্টা করেও ঠিক আমার অবস্থায় নিজেকে ভাবা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়াও একটা বড় প্রশ্ন, আরেকজনের সারা জীবনের সুখ দুঃখের দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। এ প্রশ্নটা ঠিকভাবে বিবেচনা করাও অসম্ভব তোমার পক্ষে।

মায়া অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

তুমি সুখী হতে পারবে তো?

স্নীল তার ব্যাকুল প্রশ্নের জবাবে হেসে বলে, ঠিক এই কথাটাই বললাম এতক্ষণ। একটি মেয়ের সারাজীবনের সুখ দুঃখের দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে—আমার সুখ দুঃখের প্রশ্নটাও যে তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তুমি সেটা ধরতে পারবে না। এই কথাটাই আমাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়েছে। এ তো শুধু একটা নীতি বা আদর্শের কথা নয়। তোমার মনে কেবল প্রশ্ন জাগছে,—আমি সুখী হব তো? আমাকেও ঠিক এই কথাটা বিবেচনা করতে হয়েছে।

কারণ আমি যদি সুখী না হতে পারি, আমার যদি মনে হয় জীবনটা এদিক দিয়ে আমার ব্যর্থ হয়ে গেল—বিভাকে সুখী করার সাধ্য আমার হবে না। যতই সংকল্প করি আর প্রতিজ্ঞা করি যে ওকে সুখী করবই—আমি নিজে অসুখী হলে শেষ পর্য্যন্ত বেচারাকে চোখের জলে ভাসতে হবেই। আমি নিজে সুখী না হলে আরেকজনকে সুখী করার দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতাও আমার থাকবে না।

মায়া বলে, এবার বুঝেছি। সাধে কি এত বড় হৃদয় থাকতেও লোকে তোমায় হৃদয়হীন ভাবে? সুখ দুঃখের হিসাব নিকাশটা পর্য্যন্ত তুমি অঙ্ক কষার হিসাবে দাঁড় করিয়েছ।

অঙ্কশাস্ত্র বিজ্ঞান। বিজ্ঞান ভুল করে না।

বেশ তো। আমি বোকাহাবা মেয়েমানুষ, আমার একটা কথার সোজাসুজি জবাব দাও। হিসাব কষে দেখলে তুমি সুখী হবে?

বিভাকে নিয়ে সুখী হব কিনা জানি না। দেখলাম, ওটা হিসাব করে বার করা যায় না—অন্ততঃ আমার সে ক্ষমতা নেই। কারণ ওইরকম সুখী হওয়াটা ঠিক কি ব্যাপার আমার কোন ধারণাই নেই। তবে এটা জেনেছি যে অসুখী হব না। তা ছাড়া অন্য দিকে সত্যই সুখ পাব—কাগজটা দাঁড় করাবার জন্য লড়াই করার সুখ। আরেকটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি—বিভাকে অসুখী করব না। নইলে ও-বেচারাকে সুখী করার দায়িত্ব নিতে পারতাম?

মায়া একগাল হেসে বলে, তার মানেই তুমি বরাবর ওই মেয়েটাকে ভালবেসে এসেছো।

সুনীলও হাসে।

মুস্কিল হল কি জানো? ভালবাসা কাকে বলে আমি জানি না। আমার এই মনোভাবটা, এই বিচার বিবেচনা হিসাব নিকাশটা তোমার মতে যদি ভালবাসা হয়, আমার কিছুই বলার থাকবে না। কিন্তু একটা কথা ভুলে যেও না। কাগজের জন্য টাকার দরকার না হলে ওকে বিয়ে করার কথা আমার মনেও আসত না। ভালবাসা কি এরকম বাস্তব প্রয়োজন দাঁড়াবার পর জন্মায়?

মায়া বলে, যাক গে, ভালবাসা থাক না থাক যাকে খুশী তোমার বিয়ে কর, আমার বয়ে গেল। আমার একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দাও, তাহলেই আমি খুসী হব।

তোমার কিসের চিকিৎসা?

আমি তো মেয়েমানুষ? আমার কেন বৌ হতে, মা হতে, সাধ যায় না? তুমি বৌ করতে চাইলে, মা হবার সুযোগ দিতে চাইলে, তবু আমি রাজী হতে পারলাম না!

সুনীল বলে, এই ব্যাপার! স্পেসালিষ্ট দেখিয়ে মতামত নিতে হবে না, আমিই বলে দিচ্ছি তোমার কি হয়েছে। মা হয়েছ বৈকি। বাবা বিছানায় পড়ে আছে, মা আর ভাইবোনেরা নিরুপায়—ওদের মা হতে হয়েছে তোমাকে। এদেশে অন্যরকম মা হতে গেলে আর ওদের মা থাকা যাবে না, কাজেই তোমাকে বৌ হয়ে ছেলেমেয়ে বিইয়ে মা হবার আশা ছাড়তে হয়েছে।

শুধু দায়িত্ব পালন?

দায়িত্ব পালন। এসব অস্বাভাবিক দায়িত্ব, কিন্তু সমাজ আর রাষ্ট্র দুই-ই অস্বাভাবিক কাজেই এ দায়িত্ব না নিয়ে উপায় নেই। তুমি হিসাব নিকাশ করে ছাখোনি কিন্তু টের পেয়ে গেছ যে একজন পুরুষের বৌ আর ছেলেমেয়ের মা হতে গেলে এদের ভাসিয়ে দিতেই হবে। তোমার তাই বৌ হতে, মা হতে, এত বিতৃষ্ণা। অনেকে ভাবে দায়িত্ব মানেই নীরস কঠোর কর্তব্য করা, নিজেকে বঞ্চিত করা। তুমি হাতে-নাতে দায়িত্ব পালন করে দেখেছ, এতেও কম রস নেই, এভাবেও জীবনে কম রং আসে না।

মায়া খুসী হয়ে জিজ্ঞাসা করে, এটা তাহলে আমার রোগ নয়?

সুনীল বলে, রোগ বৈকি। তবে রোগটার জন্য তুমি দায়ী নও। যারা দায়ী আমার কাগজটায় তাদের মুখোস খুলে দিচ্ছি।

মায়া বলে, এবার বুঝেছি। তুমি আমার কাছে একটা লেখা চেয়েছিলে না? স্কুলটার বিষয়ে? কি ভাবে স্কুল চালাই, কি ধরনের ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ে, পাশ করে চাকরী বাকরী কিরকম পায়? কালকেই লেখাটা দিয়ে আসব।

মায়া চলে যাবার পর নবীন আসে।

সুনীল তখন স্নান করে খেতে বসেছে।

নবীন চটের আসনটা টেনে বিছিয়ে জাঁকিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করে, কথাটা কি সত্যি সুনীলদা? আপনি বিভাদিকে বিয়ে করছেন?

সত্যি বৈকি। তুমি যথাসময়ে দু'পক্ষের নেমন্তন্ন পাবে।

নবীন বলে, সে তো পাবই। অঘোর-বাবুর কাছে খবরটা যাচাই করতে গিয়েছিলাম, বিভাদি অঘোরবাবুকে দুধ খই খাওয়াচ্ছিল। আমাকে সন্দেশ দিল। অঘোরবাবুর নাকি সন্দেশ সয় না, মিষ্টি জিনিষ খাওয়া বারণ। বিভাদির সামনে অঘোরবাবু আমার পঁচিশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেন।

ভালই তো।

আমি রিজাইন দেব ভাবছি।

ভেবেচিন্তে যদি রিজাইন দেওয়া ভাল মনে কর, রিজাইন দেবে।

আল্পনা চা এনে দেয় কিন্তু নবীনের সঙ্গে কথা বলা চলে না।

নবীন গরম চায়ে চুমুক দিয়ে জিভ পুড়িয়ে খানিকক্ষণ মুখ বাঁকিয়ে থেকে বলে, আপনি বিভাদিকে বিয়ে করছেন বলেই আমার মাইনে বাড়াল। অঘোরবাবু নিশ্চয় ধরে নিয়েছেন আমি ঘটকালি করে বিয়েটা ঘটিয়েছি। অঘোরবাবু জানেন যে বিভাদি দরকার হলেই আমাকে আপনার কাছে পাঠাত—গাড়ীর ড্রাইভার থেকে সুরু করে অঘোরবাবুর অনেকগুলি স্পাই আছে।

সুনীল চিচিঙ্গার ছেঁচকি দিয়ে শক্ত মোটা ভাত মাখতে মাখতে বলে, ভালই তো হয়েছে।

নবীন বলে, আপনি তো বলবেন ভালই হয়েছে। আমার মন যে উল্টো কথা বলছে? আপনি অঘোরবাবুর মেয়েকে বিয়ে করবেন, আমার পঁচিশ টাকা মাইনে বাড়ল—আপনার বোন আগেই বলেছিল কাজে রিজাইন দিয়ে আপনার কাগজে যোগ দেওয়া উচিত ছিল। আমি তা করিনি বলে আপনার বোন আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করেছে।

সুনীল বলে, এটা আবার কি রকম কথা শুনছি? আল্পনা যে আমায় বললে, তুমি প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গানোর জন্য কথা বন্ধ করেছ?

নবীন জোর দিয়ে বলে, না, ওটা মিছে কথা। আমি নই, আপনার বোন কথা বন্ধ করেছে। কথা বন্ধ করার পর আমি ভেবেচিন্তে দেখলাম যে সত্যই তো, আপনার সঙ্গে আমার কথা বন্ধ থাকলে ও আমার সঙ্গে ভাব বাধে কি করে? তাছাড়া আমিই ছেলেমানুষের মত ব্যবহার করেছিলাম আপনার সঙ্গে।

সেটা বুঝতে পেরেছ?

পেরেছি বৈকি! নইলে আমি মরে গেলেও আপনার সঙ্গে যেচে এসে ভাব করতাম ভেবেছেন? আমি প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গলাম কিন্তু আপনার বোনের রাগ ভাঙ্গল না।

কি করে জানলে রাগ ভাঙ্গেনি, তোমার সঙ্গে কথা বলবে না? ডেকে যাহোক কোন কথা জিজ্ঞাসা করেই দ্যাখো না!

নবীন বলে, আমি কেন যেচে কথা বলতে যাব? যে আগে কথা বন্ধ করেছে সেই আগে কথা বলবে। আমার যা করার ছিল আমি করেছি, এখনো রেগে থাকবে কেন?

সুনীল হেসে বলে, বেশ করেছে। তোমাদের মত খোসামুদে মতববাজ ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের কথা বন্ধ করাই উচিত।

নবীন বলে, বটেই তো। বোনের দিকে টানবেন বৈকি।

ভাই বোনের দিকে টানবে এটা তোমার কাছে বুঝি খুব খাপছাড়া ব্যাপার?

এ ছেলেমানুষী রাগ অভিমান ওদের মিটে যাবে, সে জন্য সুনীল ভাবে না। কিন্তু ছেলেমানুষ নবীন, সুনীলকে বড়ই দমিয়ে দিয়ে যায়। তার মনে হয় যে তার সমস্ত হিসাব নিকাশের মধ্যে কোথাও যেন মস্ত একটা ছেলেমানুষী গলদ রয়ে গেছে। তাকে আর নন্দার কাগজটাকে বেদখল করার জন্য চারিদিকে যে ষড়যন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার ফাঁদে সে ধরা দিয়েছে নিজে। তাকে সোজাসুজি বশ করা যায় না, সাধারণ স্বার্থ আর সুবিধার হিসাবটা তার খাপছাড়া, তাই

তার নিজের পছন্দমত পথে চলার ব্যবস্থা করে দিয়ে তাকে বাগাবার কৌশল করা হয়েছে।

বিভা না জানুক তাকে জয় করার খেলায় বিভা অঘোরদের হাতের একটি ঘুঁটিমাত্র।

কাগজটা বাঁচাবার জন্যও অঘোরের কাছে সে টাকা নেবে না জানা কথা, তাই এমন ভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে সে যেন স্বেচ্ছায় খুসী মনে অঘোরের মেয়েকে বিয়ে করে অঘোরের টাকা নিতে এগিয়ে যায়, নিজে বিচার বিবেচনা করে সমস্যা সমাধানের উপায় আবিষ্কার করার আত্মপ্রসাদ নিয়ে সে যেন ধরা দেয় অঘোরেরই ফাঁদে।

সে মনে করুক না যে তারই জয় হয়েছে। এই ছেলেমানুষী অহঙ্কার নিয়ে সে যত খুসী তৃপ্তি পাক না। কি তাতে আসে যায় অঘোরের!

সে তো নিজের মতলব হাঁসিল করে নিচ্ছে তাকে দিয়েই।

দারুণ অস্বস্তির মধ্যে তার সময় কাটে। নিজেকে তার আজ অসহায় মনে হয় বিশেষভাবে এইজন্য যে সে এমন এক যায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, নিজের বিচার বিবেচনার উপর নির্ভর করে এতদূর এগিয়েছে যে এখন নিরপেক্ষভাবে সমস্ত বিষয়টা তলিয়ে যাচাই করে দেখা তার পক্ষেও সম্ভব নয়, অন্যের বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করাও সম্ভব নয়।

কাগজের আপিসে যাওয়ার আগে সে নন্দাদের বাড়ী যায়। বেলা তখন তিনটে বাজে, নন্দা অবেলায় খেয়ে নিশ্চিন্তমনে আরাম করে ঘুম দিচ্ছিল। চোখে মুখে জল দিয়ে উঠে এসে সুনীলের সামনে আঁচলের আড়ালে মস্ত একটা হাই তুলে সে লজ্জা পেয়ে হাসে।

সুনীল রীতিমত ঈর্ষা বোধ করে।

কে জানে নন্দাও তার সঙ্গে কি খেলা খেলছে। উদারতার ভান করে কাগজের মালিকানার অংশের সঙ্গে কাগজটার সমস্ত দায় তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

নন্দা বলে, আপনার মুখ যে শুকনো দেখাচ্ছে? শরীর ভাল নেই? বড় বেশী খাটছেন আপনি।

স্থনীল বলে, খাটলে কি শরীর খারাপ হয়? যে বোঝা চাপিয়েছেন, ভাবনায় চিন্তায় ঘুম হয় না।

নন্দা নালিশের স্থরে বলে, আমায় দোষ দেবেন না, আমি হাল্কা বোঝাই চাপিয়েছিলাম। সেরকম রাখলে ঠুকঠাক করে জোড়াতালি দিয়ে অনায়াসে কাগজটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। বোঝা ভারি করেছেন আপনি নিজে। কাগজের ভার বাড়াবেন, কাগজ নিয়ে চারিদিকে হৈ-চৈ লাগিয়ে দেবেন, হাঙ্গামা পোয়াবেন, না?

স্থনীল একটু ভাবে।

খানিকটা বাড়াবাড়ি করছি, না?

মোটেই না। কাজটা যদি সহজ হত তবে আপনার মত লোকের দরকার পড়ত নাকি! তবে টাকার জন্য যে ব্যবস্থা করছেন সেটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিনা বলতে পারব না। আমরা সবাই থ' বনে গেছি।

কেন? বিয়ে করাটা এমন কি অদ্ভুত ব্যাপার?

টাকার জন্য আপনার এভাবে বিয়ে করাটা অদ্ভুত ব্যাপার বৈকি। তাও অঘোরবাবুর মেয়েকে বিয়ে করেছেন। কাগজের সকলের মুখে আর কোন কথাই নেই। মত হয়েছে দু'রকম—আপনার পক্ষে আর বিপক্ষে।

স্থনীল কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, কি বলছে দু'পক্ষ?

নন্দা বলে, শিশিররা কয়েকজন বলছে এভাবে টাকা সংগ্রহ করা উচিত নয়, এতে নৈতিক জোর কমে যায়। আপনি খাঁটি থাকলেও কেবল এভাবে টাকা যোগাড় করার জন্যই শেষপর্য্যন্ত ফলটা খারাপ দাঁড়াবে। এর চেয়ে পাবলিকের কাছে চাঁদা চেয়ে সাহায্য চেয়ে টাকা তোলা ভাল ছিল, জনসাধারণের উপর নির্ভর করাই সব সময় উচিত।

অন্য পক্ষ কি বলছে?

বিভূতিবাবু নরেশ এরা আপনার প্রশংসা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

কাগজের এই সংকটের সময় কাগজটার জন্য আপনি যে স্বার্থ ত্যাগ করছেন তার নাকি তুলনা হয় না।

স্থনীল এবার হাসে।

আপনি নিজে কি ভাবছেন ?

ওই যে বললাম, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আমি অবশ্য আপনার কোন কাজেই বাধা দেব না, আগেই সেটা আপনাকে বলে দিয়েছি। এটুকু স্বাধীনতা না দিলে দায়িত্ব দেওয়ার কোন মানে হয় না। যেভাবেই যোগাড় করুন, কাগজটার পিছনে শেষ পর্য্যন্ত আপনিই টাকা ঢালবেন বেশী। আমার মন কিন্তু খুঁতখুঁত করছে, তা জানিয়ে রাখি। দাদা অবশ্য আপনার পক্ষ নিয়ে খুব লাফাচ্ছে।

প্রদ্যোৎ বাবু বাড়ী নেই ?

নাইতে গেছে।

তার স্বপক্ষে প্রদ্যোতের কি বলার আছে শুনবার জন্য স্থনীল অপেক্ষা করে। নিখিলের ষড়যন্ত্র করে ছাপিয়ে দেওয়া সম্পাদকীয় প্রত্যাহার করলে কাগজের প্রেষ্টিজ নষ্ট হবে বলে সে যে জেলে গিয়েছিল, তারপর থেকে তার বিচার বিবেচনাকে স্থনীল বিশেষ মূল্য দেয়।

স্নান করে এসে প্রদ্যোৎ খুসীর সঙ্গে বলে, এই যে স্থনীলবাবু! এদেশে অনেক রকম ত্যাগের কম্পিটিশন চলে আসছে বহুকাল ধরে, আপনি নতুনরকম ত্যাগের নমুনা দেখালেন।

ত্যাগ কি রকম ? বিয়ে করছি, টাকা পাচ্ছি—

বিয়ে না করাটা আর এভাবে টাকা না পাওয়াটা অনেক দামী ছিল আপনার কাছে। কাজেই এটা ত্যাগ বৈকি !

নন্দাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্থনীল কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে। তারপর কাগজের আপিসে যাওয়ার বদলে রওনা দেয় অঘোরের আপিসের দিকে।

ধীরে ধীরে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তার মনে। তার অস্বস্তি বোধ করার

কারণ হল অঘোর। বিভাকে সামনে রেখে অঘোর মতলব হাঁসিল করছে এই খাপছাড়া চিন্তা সে বাতিল করে দিয়েছে।

তাকে জামাই করার পর অঘোর কোন মতলব আঁটবে কিনা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে না পারলে তার অস্বস্তি যাবে না।

আগে যে ঘরে সে নিজে কাজ করত সেখানে ঢুকতেই চেনা কর্মচারীদের মধ্যে একটা সোরগোল পড়ে যায়। নানা প্রশ্ন আর মন্তব্যে সুনীলকে যেন ঝাঁঝরা করে ফেলার চেষ্টা চলে।

এ অপিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে একটা খবরের কাগজ চালিয়ে চারদিকে হৈ-চৈ পড়িয়ে দিয়েছে, তারা কি ধারণাও করতে পেরেছিল, সুনীল একদিন এই লাইন ধরবে!

সনৎ বলে, কার মধ্যে যে কি প্রতিভা গোপন থাকে জানা যায় না। আপনি তার প্রমাণ দেখালেন।

সুধীর জিজ্ঞাসা করে, এডিটোরিয়ালগুলি কি আপনিই লেখেন? তর্ক করার সময় আপনি যেভাবে যুক্তি দিতেন কাগজের লেখায় তেমনিভাবে যুক্তি সাজানো দেখতে পাই কিনা!

ভূপেন বলে, খুব জোরালো লেখা হচ্ছে। শত্রু বাড়াচ্ছেন খেয়াল রাখবেন কিন্তু।

বুড়ো নরেশ বলে, শত্রু তো বাড়বেই।। খাঁটি কথা বললে খাঁটি কথা লিখলে মতলববাজদের স্বার্থে ঘা লাগে। শত্রু যত বাড়ছে তার চেয়ে বন্ধু ঢের বাড়ছে এটাও ভুলবেন না যেন।

অঘোরের মেয়েকে সে যে বিয়ে করবে এ কথাটা কেউ উল্লেখও করে না। সুনীল টের পায়, এরা তাকে লজ্জা দিতে চায় না তাই কথাটা সকলে চেপে যাচ্ছে।

অঘোরের ঘরে ঢুকতে সে হাসিমুখে সানন্দে তাকে অভ্যর্থনা জানায়।

তার সামনে টেবিলে খান চারেক ইংরাজী বাংলা দৈনিক কাগজ পড়েছিল, সুনীলদের কাগজও তার মধ্যে ছিল। কাগজটা তুলে নিয়ে অঘোর বলে, তোমাদের

এডিটোরিয়ালটা পড়ছিলাম। তোমাদের লেখার আসল কায়দাটা বেশ ধরা যায়—তোমরা কোনরকম কায়দা করার চেষ্টা কর না। বিভাও তাই বলছিল—কায়দা না করার কায়দা দিয়ে তোমরা পাবলিককে বশ করছ।

তাদের সেদিনকার কাগজে প্রধান সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল চোরাবাজারকে আক্রমণ করে। খুব কড়া লেখাটা পড়ে যেন খুসীই হয়েছে অঘোর। ভাবী জামায়ের দিকে সে স্মিত মুখে চেয়ে থাকে।

যেন জানাতে চায় যে তুমি যা কর তাতেই আমার সমর্থন আছে।

সুনীল দেখা করতে আসার কারণ হিসাবে বলে, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম নবীনের ব্যাপারটা জানতে।

অঘোর বলে, নবীন? নবীন ভাল কাজ করছে। ওর মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছি।

সুনীল বলে, আপনি জানেন তো আমার বোনের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হয়েছে? ওর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিরকম?

ছেলে খুব বুদ্ধিমান তবে একটু খেয়ালী। কাজ করলে বেশ মন দিয়েই করে কিন্তু দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। বয়সের সঙ্গে এটা কমে যাবে আশা করছি। বিভা ওকে খুব স্নেহ করে। মেয়ের খাতিরে ওর খামখেয়ালী খানিকটা সয়ে যেতে হয়, উপায় কি।

মাসিকটাকে সাপ্তাহিক করে চালাবে শুনছিলাম? আপনি নাকি ফাইন্যান্স করবেন?

হ্যাঁ। একটা বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ চালিয়ে দেখা যাক কিছুদিন! তারপর দৈনিকের কথা ভাবা যাবে। তোমরা তো তোমাদের কাগজে মাথা গলাতে দিলে না।

সুনীল বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে অঘোরের মুখের ভাব লক্ষ্য করে। তাদের খবরের কাগজটি সম্পর্কে অঘোর যে বর্তমানে উদাসীন তাতে সন্দেহ নেই। কাগজ সম্পর্কে হাল ছেড়ে দিয়ে এখন সুনীলকে জামাই হিসাবে বাগাতে পারার আনন্দে নয়, মেয়ের বিয়ে হবে এই আনন্দেই সে মসগুল।

কিন্তু সম্পর্ককে পরে ক[illegible]

সুনীল বলে, আপনাকে আগেই [illegible] আমি

এই অংশও আমাকে দেওয়া হয়েছে এই সর্তে যে আমি [illegible]

করতে পারব না।

অঘোর বলে, থাক থাক, সেজন্য কি! তুমি আছ বলেই একটা [illegible] চালাবার সখ হয়েছিল। আমি হলাম কি জানো, ব্যবসায়ী মানুষ, আমরা সব সময় চেষ্টা করব বুঝে বুঝে কোপ বসাতে। কাগজটার উন্নতি তুমি করবেই জানতাম, তাই ভাগ করতে আগ্রহ হয়েছিল। তুমি এখন আমার নিজের লোক হয়ে যাচ্ছ, কাগজটার লাভ তোমার থাকা আমার থাকা সমান কথা।

খবরের কাগজে লাভ অবশ্য অনেকটা অনিশ্চিত থাকে। কখনো ওঠে, কখনো পড়ে যায়।

সে তো বটেই। ব্যবসা মাত্রেই, ওঠা পড়া আছে।

আরও কিছুক্ষণ অঘোরের সঙ্গে আলাপ করার পর সুনীল বিদায় নেয়। এ বিষয়ে তার সন্দেহ থাকে না যে কাগজ সম্পর্কে অঘোরের মনে এখন পর্য্যন্ত কোন সুনির্দ্দিষ্ট চিন্তা বা পরিকল্পনা নেই, ও চিন্তা সে ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখেছে। অনির্দ্দিষ্ট আশা হয়তো তার মনে আছে, কিন্তু কোন মতলব নেই।

এটা টের পেয়ে সুনীল নিশ্চিন্ত হতে পারে না। কারণ অঘোর কাগজটা স্পষ্ট কিছু যে ভেবে রাখে নি তার মানেই দাঁড়ায় এই যে তাকে জামাই করার পথে ভবিষ্যতে কাগজটা সম্পর্কেও সুবিধা করে নিতে পারবে, এ বিষয়ে অঘোর অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।

অঘোরের আপিস থেকে সুনীল বিভার কাছে যায়।

বলে, তোমায় স্পষ্টভাবে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম। তোমায় বিয়ে করা ছাড়া আর কোন সর্ত থাকবে না তো আমার টাকা পাওয়ার?

বিভা আশ্চর্য্য হয়ে বলে, আবার কিসের সর্ত?

তোমার বাবা যদি কোন গোলমাল করেন?

! বাবা ... টাকা দেবে না।

...খানি চেক লিখে দিচ্ছি।

...যাচ্ছ? চেক নিয়ে যদি তোমায় বিয়ে না করি?

...? এসব আবোল তাবোল কি বকছ? না করলে ... আমি কি মামলা করতে যাব তোমার নামে?

...চাপ বসে খানিকক্ষণ সিগারেট টানে।

তোমার জন্যই আমি একটা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি। তোমার জীবনে আমি না অশান্তি নিয়ে আসি।

কেন?

আমার পক্ষ নিয়ে বাবার সঙ্গে যদি তোমার লড়াই করতে হয়? ...পর্ক আর টাকার বিনিময়ে উনি যদি আমার কাছে কিছু বাগাবার চেষ্টা করেন, তাই নিয়ে ওঁর সঙ্গে যদি তোমার ঝগড়া হয়? তুমি দোটানায় পড়ে কষ্ট পাবে।

বিভা দ্বিধ মাত্র না করে বলে, না। কষ্ট পাব, দোটানায় পড়ব না। বাবা দি অন্যায় করে তোমার কাছে কিছু বাগাতে চায়, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমার দোটানার কষ্ট হবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি বলে বুকে জোর পাব। দা... হলে, বাপের দিক ছেড়ে মেয়েরা স্বামীর দিকেই ঝোঁকে—এটাই তো চিরকালের নিয়ম। তবে আমার মনে হয়, ওরকম কোন আশঙ্কা করার কারণ তোমার নেই। নিজের বাপের নিন্দে করতে নেই কিন্তু বাবার দোষের দিকগুলি আমি জানি না, ভেবো না। দোষ যতই থাক, মেয়ের জীবনে অশান্তি ঘটবে এমন কিছু বাবা করতে পারবে না।

বিভার জোরালো আত্মবিশ্বাস সত্যই বুকে বল এনে দেয় ...লের। অনেকটা হাল্কা মন নিয়ে সে কাগজের আপিসে যায়।

সমাপ্ত